বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ

ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ । বিশ্বভারতী

অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির
এ-১৮-এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯[illegible]৭

প্রকাশক :
নন্দদুলাল মণ্ডল
অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির
এ-১৮-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর :
সুবল চন্দ্র ঘোষ
কালিকা জব প্রেস
১০৯/বি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

স্বৰ্গত মুরারিমোহন রায়চৌধুরীর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

বঙ্গদর্শন—বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা উপন্যাস

বাংলা উপন্যাস জগতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অমোঘ প্রভাব সম্পর্কে আজ আর কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব আজ সূর্যের মত স্বয়ম্প্রকাশ। কিন্তু বাংলা উপন্যাস-প্রসঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে বঙ্গদর্শনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার তাৎপর্য ও সার্থকতা কতখানি সে সম্পর্কে সংশয় থাকতে পারে। কারণ বঙ্গদর্শনের নয় বৎসরের প্রকাশ-পর্বে যে কয়খানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রায় সবগুলিই বঙ্কিমচন্দ্রের, বাকি যে তিন চারখানি অন্যের লেখা, তার একটিও তেমন সার্থক সৃষ্টি নয়। সাহিত্যের ইতিহাসে তা'দের কোনটিই স্মরণীয় উপন্যাস হিসাবে বিশেষ স্বীকৃতি পায়নি। সুতরাং বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উপন্যাসগুলির মধ্যে যে কয়খানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেগুলি সবই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলা উপন্যাসে বঙ্গদর্শনের দান বা ভূমিকার পৃথক্ আলোচনার সার্থকতা কতখানি?

সার্থকতা কতখানি তা সঠিক বলা হয়ত কঠিন, তবে সার্থকতা যে আছে, এ বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় নেই। অবশ্য এই প্রসঙ্গে দু-একটি কথা আগে বলে নেওয়া প্রয়োজন। বাংলা সাময়িক পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস বা উপন্যাসকল্প রচনা প্রথম প্রকাশের কৃতিত্ব অবশ্য বঙ্গদর্শনের নয়। সে কৃতিত্ব দাবি করতে পারে প্যারীচাঁদ মিত্র পরিচালিত 'মাসিকপত্র'। এই পত্রিকায় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ থেকে 'আলালের ঘরে দুলালে'র প্রায় সমগ্র অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এরপর বঙ্গদর্শনের আগে আর কোথাও উপন্যাস-জাতীয় রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠকমাত্রেই জানেন বঙ্গদর্শনেই তাঁর উপন্যাস প্রকাশের সূত্রপাত নয়। বঙ্গদর্শনের আগে বঙ্কিমচন্দ্র তিনখানি বাংলা ও একখানি ইংরাজী উপন্যাস প্রকাশ করেন। অর্থাৎ উপন্যাস প্রকাশের জন্য তাঁকে পত্রিকার মুখাপেক্ষী হতে হয় নি, বরং বলতে পারি নিজের পত্রিকার চাহিদা মেটাতেই তাঁকে নিয়মিত উপন্যাসের যোগান দিতে হয়েছে। আমাদের বক্তব্য, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বঙ্গদর্শনের প্রয়োজন

অপরিহার্য ছিল না। 'দেশ'-কাল ও আপন নিহিত শিল্পিসত্তার যে অমোঘ প্রেরণায় তিনি প্রথম তিনটি উপন্যাস সৃষ্টি করেছিলেন, সেই প্রেরণাই নিশ্চয় তাঁকে পরবর্তী শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি রচনায় অনুপ্রাণিত করত। কোন পত্রিকার বহিরঙ্গ দাবির সঙ্গে সাহিত্যস্রষ্টার গূঢ় শিল্পপ্রেরণার অচ্ছেদ্য অনিবার্য যোগ থাকতে পারে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

এইসব কথা বলার উদ্দেশ্য কিন্তু বঙ্গদর্শনের গুরুত্ব হ্রাস করা নয়। বরং অনেকখানি তার বিপরীত। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতটি যথাযথভাবে বুঝে নেওয়ার জন্যই উপরের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করছি। সম্পূর্ণ নির্মোহ ও অপক্ষপাত দৃষ্টিতেই বাংলা উপন্যাসে বঙ্গদর্শনের ভূমিকার সম্যক্ উপলব্ধি আমাদের উদ্দেশ্য। আর সেই দৃষ্টিতে দেখতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বুঝি যে বঙ্কিমচন্দ্রের নিগূঢ় ঔপন্যাসিক সত্তার প্রেরণা যতই বঙ্গদর্শন-নিরপেক্ষ হোক না কেন, বাস্তব অর্থে লেখক-বঙ্কিমচন্দ্রের, যাঁর কাছে সাহিত্য-সাধনা অনেকাংশে দেশ-সেবা ও সমাজ-সেবারই নামান্তর, একটি যথার্থ সাময়িক সাহিত্যপত্রের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ তাঁর মনের গভীরে যে বিপুল পরিমাণ চিন্তা-মনন ও শিল্প-কল্পনা আত্মপ্রকাশের ভাষা খুঁজছিল সেই প্রকাশের যোগ্য মাধ্যমরূপী কোন সাহিত্য-পত্রিকা তখন দেশে ছিল না। এই দিক থেকে দেখলে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের অসংখ্য সৃষ্টির দ্বার উন্মোচনের পথে বঙ্গদর্শনের ভূমিকা নিতান্ত গৌণ নয়। বঙ্গদর্শন না থাকলে বঙ্কিমচন্দ্র এতগুলি উপন্যাস লিখতেন কি না এ জল্পনা আজ অর্থহীন। বরং একথাই বলা ঠিক যে, সাহিত্যসাধক বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে একটি সাহিত্য-পত্রিকা-প্রকাশ সেদিন অপরিহার্য ছিল। তাই এক অর্থে, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে উপন্যাস-সৃষ্টি ও বঙ্গদর্শনের প্রকাশ দুই-ই অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা এক অনিবার্য ঘটনা।

২

বঙ্গদর্শন প্রকাশের আগে বাংলা উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রেরই তিনখানি গ্রন্থ: দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) ও মৃণালিনী (১৮৬৯)। তিনটিই ইতিহাস-আশ্রিত রোম্যান্স। এই তিনটি গ্রন্থ ছাড়া এই শ্রেণীর উপন্যাস-জাতীয় রচনায় ক্ষেত্রে প্রাক্-বঙ্গদর্শন পর্বে উল্লেখযোগ্য আর বিশেষ কিছু নেই। আর সবই প্রায় (অঙ্গুরীয় বিনিময় ইত্যাদি দু-একটি রচনা ছাড়া) রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বিজয় বসন্ত...

গোলেবকাওলি...বালক-ভুলানো কথা'—সাহিত্যের পরিবেশে কেবল 'অন্ধকার' 'একাকার' ও 'স্বপ্ন'-র হতাশা ও নিষ্ফলতা। সেই হতাশা ও নিষ্ফলতার বন্ধ্যা জমিতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে রোম্যান্সের সোনার ফসল ফলালেন।) বাংলা সাহিত্যে এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। কিন্তু সেই রোম্যান্সের সৌন্দর্য যতই চিত্তগ্রাহী হোক না কেন, ওই তিনটি গ্রন্থের ভিত্তিমূলে কোথায় যেন মাটির বাস্তব স্পর্শের অভাব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পিব্যক্তিত্ব যতই রোম্যান্স-রসসিক্ত বা রোম্যান্টিক সৌন্দর্যপ্রবণ হোক না, উনিশ শতকের জাগ্রত স্বদেশপ্রেম ও সমাজবোধ তাঁর মনের গভীরে আরেক চেতনাকে ক্রমেই পরিস্ফুট করে তুলেছিল—সেটি বাস্তবচেতনা তথা সমাজ-চেতনা। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভারতকলঙ্ক' বা 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল' রচনা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের সেই মনোভাবের নিদর্শন পাই। (এরপর বঙ্গদর্শনের প্রতি সংখ্যায় সেই (সমাজসচেতন, বাস্তব-সমস্যাপিষ্ট চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর মিলবে।) শুধু তাই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক সত্তার উপরেও এই বাস্তবনিষ্ঠ সমাজমনস্কতার প্রত্যক্ষ প্রভাবের সূত্র-পাত বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা থেকেই। ইতিহাস ও রোম্যান্সের রহস্যময় দূরের জগৎ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র দৃষ্টি ফেরালেন তাঁর কালের বাঙালী সমাজ ও পরিবারের ঘরোয়া জীবনের নানা সমস্যার দিকে। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় শুরু হল বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সমস্যাকে আশ্রয় করে সমাজ ও পরিবার-কেন্দ্রিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'। বঙ্গদর্শনের প্রথম উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সৃষ্টির ধারায় নূতন তরঙ্গবেগ সঞ্চারিত হল। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসেও বলা যেতে পারে, নবযুগের সূচনা হল।

অবশ্য, একথা সর্বজনবিদিত যে 'বিষবৃক্ষে'র আগেও বাংলায় সামাজিক কথাসাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। আর তার অংশ-বিশেষ সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাতেও আত্মপ্রকাশ করেছে। 'সমাচার দর্পণে'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ক্ষুদ্রায়ত 'বাবুর উপাখ্যান' থেকে শুরু করে 'নববাবুবিলাস', 'ফুলমণি ও করুণা', ('মাসিকপত্রে' প্রকাশিত) 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'সুশীলার উপাখ্যান' পর্যন্ত অনেক রচনাই 'সমাজসমস্যা'মূলক। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, এদের কোনটিই উপন্যাস নয়। যথার্থ বাংলা সামাজিক উপন্যাস 'বঙ্গদর্শনে'ই প্রথম বেরোল—'বিষবৃক্ষ'। এদিক থেকে বঙ্গদর্শন বাংলা উপন্যাস-জগতে বিশেষ এক মর্যাদার আসন দাবী করতে পারে।

'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠায় উপন্যাস ও অন্যান্য রচনা যখন প্রথম প্রকাশিত হতে শুরু করল, তখনকার পাঠক-মনের ওপর তার প্রতিক্রিয়ার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই পাঠকগোষ্ঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ হলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এ প্রসঙ্গে বাংলা ১৩০১ সালের বৈশাখে লিখিত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেই প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু বহুজনবিদিত। সেখানে একজায়গায় রবীন্দ্রনাথ যে তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেছেন, বলা বাহুল্য তা বাংলা উপন্যাসের প্রসঙ্গেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ উক্তিটির পরেই কথা-সাহিত্যের প্রসঙ্গ উঠেছে। উক্তিটি এই: 'পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম।'

'বঙ্গদর্শন' যে বাংলা উপন্যাসে পালাবদলের সঙ্কেত বয়ে এনেছিল, এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমরা সকলেই একমত। এতো গেল 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য। এছাড়াও বিশেষভাবে 'বিষবৃক্ষ' সম্পর্কে সে সময়ে নানান মতামত প্রকাশিত হয়, সেগুলি যথেষ্ট আগ্রহোদ্দীপক। 'বিষবৃক্ষ' যখন 'বঙ্গদর্শনে' বেরোয় তখন শিক্ষিত বাঙালী পাঠকসমাজে রীতিমতো সাড়া পড়ে যায়। সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা বা মন্তব্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'বিষবৃক্ষে'র জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বিখ্যাত এক পত্রিকার সমালোচক লিখেছিলেন: 'This novel...was to be found in the baitakhana of every Bengali Babu throughout the whole of last year. It is quite of a different character from its predecessors' (The Calcutta Review, 1873)

সেকালের আরেকটি বিখ্যাত পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ' কিন্তু এর বিপরীত মনোভাব প্রকাশ করেছিল। বঙ্গদর্শনে যখন 'বিষবৃক্ষ' প্রথম বেরোয়, তার প্রথম কিস্তি পাঠ করে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা যে মন্তব্য করেছিল, তা আদৌ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাসূচক নয়। তবু সেই আগ্রহোদ্দীপক মন্তব্যটির ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনা করে তার অংশবিশেষ উদ্ধার করছি: 'বিষবৃক্ষের প্রারম্ভ দেখিয়া আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইল, বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার ন্যায় ইহাতে কৃতকার্য হইতে পারিবেন না।...উপাখ্যান যোজনার কৌশল বিকশিত না হইলে পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপনের

সম্ভাবনা নাই...বিষবৃক্ষের এইরূপ গল্পবন্ধপ্রণালী নিরতিশয় অসহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের এ দোষ মার্জনীয় নহে।' (সোমপ্রকাশ, ১১ বৈশাখ ১২৭৯)

বঙ্গদর্শনে ক্রমপ্রকাশ্য বিষবৃক্ষ সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছিল—'বঙ্কিমবাবু ...কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ হন নাই।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রই তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, 'মনে পড়ল যখন বঙ্গদর্শন প্রথম দেখা দিয়েছে, বিষবৃক্ষ মাসে মাসে খণ্ডশঃ বের হচ্ছে, ঘরে ঘরে দেশের মেয়ে পুরুষ সকলের মধ্যে কী ঔৎসুক্য, রসভোগের কী নিবিড় আনন্দ।' (পথে ও পথের প্রান্তে, ১৮ ভাদ্র, ১৩৩৬)

এইখানেই শেষ নয়। প্রাক্-বঙ্গদর্শন পর্বের বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সঙ্গে বিষবৃক্ষের তুলনা করে তার স্বাতন্ত্র্য ও সার্থকতা সম্পর্কে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'তে যে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ লেখেন: 'বঙ্গদর্শনে যে জিনিসটা সেদিন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজীতে যাকে বলে রোম্যান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ।...বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।' (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৮ পৃ. ৮০৬-৭)

৩

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের ছোটো-বড়োয় মিলিয়ে মোট দশটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই দশটির মধ্যে দুটি এক-এক সংখ্যাতেই শেষ হয়। সে দুটি হল 'ইন্দিরা' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়'। অন্যান্য উপন্যাসের কয়েকটি একটানা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু চারটি উপন্যাস যেমন 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রকাশে মাঝে মাঝে ছেদ পড়ে। নীচে উপন্যাসগুলির বঙ্গদর্শনে প্রকাশের ক্রম ও কাল নির্দেশ করা হল: (ক) বিষবৃক্ষ [বৈশাখ-ফাল্গুন, ১২৭৯] (খ) ইন্দিরা [চৈত্র, ১২৭৯] (গ) যুগলাঙ্গুরীয় [বৈশাখ, ১২৮০] (ঘ) চন্দ্রশেখর [শ্রাবণ, ১২৮০-ভাদ্র, ১২৮১] (ঙ)

রজনী [১২৮১-৮২] (চ) রাধারাণী [কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১২৮২] (ছ) কৃষ্ণকান্তের উইল [১২৮২ ও ১২৮৪] (জ) রাজসিংহ [চৈত্র, ১২৮৪-ভাদ্র, ১২৮৫] (ঝ) আনন্দমঠ [১২৮৭-৮৯] (ঞ) দেবীচৌধুরাণী [১২৮৯-৯০ অসম্পূর্ণ । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, 'সীতারাম' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় নি। তার আগেই 'বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে যায়। এরপর 'প্রচার' পত্রিকায় ১২৯১-৯৩ সালে 'সীতারাম' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস, Rajmohan's Wife-ও একটি পত্রিকায় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নাম Indian Field।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে : সামাজিক, রোম্যান্সধর্মী, ঐতিহাসিক, ক্ষুদ্রায়ত উপন্যাস বা 'নভেলেট' ধরনের রচনা ও তত্ত্বপ্রধান ইত্যাদি। উপরের রচনা-তালিকাটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সাধারণত একটি বড় আকারের উপন্যাসের পর এক বা একাধিক ক্ষুদ্রাযত আখ্যায়িকা প্রকাশিত হয়েছে। তারপর আবার একটি পূর্ণায়ত উপন্যাস। যেমন, 'বিষবৃক্ষ' শেষ হবার ঠিক পরের দু মাসে দুটি ক্ষুদ্রায়ত কাহিনী—'ইন্দিরা' (ছোট আকারে), ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' প্রকাশিত হয়। তারপর আবার দু'মাস বাদে 'চন্দ্রশেখর' ধারাবাহিকভাবে শুরু হয়। তেমনি আবার 'রজনী' শেষ হতে না হতেই 'রজনী'র শেষ দুই কিস্তির সঙ্গে একই সংখ্যায় 'রাধারাণী' আত্মপ্রকাশ করল। ওই দুটি (রজনী ও রাধারাণী) যে মাসে শেষ হল, তার পরের মাস থেকে বেরুতে লাগল 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' যে মাসে শেষ হল, তার এক মাস বাদেই শুরু হয় ক্ষুদ্রকায় 'রাজসিংহ'। অবশ্য 'রাজসিংহে'র পর দীর্ঘ সময় বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায় না। ভাদ্র, ১২৮৫-তে 'রাজসিংহ' শেষ হয়ে যায়। তারপর চৈত্র ১২৮৭-তে শুরু হয়েছে 'আনন্দমঠ'। অবশ্য ১২৮৬-তে বঙ্গদর্শন বন্ধ ছিল। এর মধ্যে একটি মাত্র কাহিনীধর্মী রচনা পাই আশ্বিন, ১২৮৭-তে : 'মুচিরাম-গুড়ের জীবনচরিত'। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-প্রকাশের ধারাবাহিকতায় কেবল এই একবারই এত দীর্ঘদিনের ছেদ।

কথাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের মনের গূঢ় প্রবণতা ছিল বর্ণাঢ্য রোমান্সের দিকে, দূর অতীতের রোম্যান্টিক পরিবেশের দিকে। সেই গূঢ় প্রবণতায় ফলে তাঁর প্রাক্-বঙ্গদর্শন পর্বের উপন্যাস রোম্যান্স-রসসিক্ত। এর আগে 'প্রবাসী' পত্রিকা থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখার যে অংশ উদ্ধার করেছি, তা থেকেই এই কথার যথার্থতা প্রমাণিত হবে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' সমাজ ও পরিবার-কেন্দ্রিক। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, 'বিষবৃক্ষে'র পর আর তিনি রোম্যান্স ও ইতিহাসকে আশ্রয় করে উপন্যাস লেখেননি। (তাঁর শিল্পিসত্তার নিহিত প্রবণতা তাঁকে "'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', ও 'দেবীচৌধুরাণী' রচনায় প্রেরণা দিয়েছে। এই সব কটিতেই ইতিহাস ও রোম্যান্সের উপকরণ আছে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, প্রাক্-বঙ্গদর্শন রোম্যান্স ও বঙ্গদর্শন-পর্বের রোম্যান্সধর্মী রচনার মধ্যে কোথায় যেন একটা মৌল প্রভেদ ঘটে গেছে। 'বিষবৃক্ষে'র স্রষ্টার বাস্তববোধ ও যুগচেতনা পরবর্তী প্রায় সমস্ত উপন্যাসে এমন কি রোম্যান্সধর্মী রচনাগুলিতেও বিশেষভাবে ছায়া ফেলেছে। তাই 'দুর্গেশনন্দিনী' যেখানে পাঠকমনে মুখ্যত দূর-জগতের রোম্যান্সের স্বপ্ন ঘনিয়ে তোলে, সেখানে 'চন্দ্রশেখরে' কিংবা 'দেবীচৌধুরাণী'-তে রোম্যান্টিক ইতিহাসের বিস্ময়কর ঘটনার পাশাপাশি বাঙালীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পরিচিত অভিজ্ঞতার মর্মস্পর্শী ছবিকে ফুটে উঠতে দেখি। বস্তুত, এই পর্বের উপন্যাসে অনেকক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা ও জীবনাদর্শই মুখ্য, তাকেই যথাযথ ও বিশ্বাসযোগ্য ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যই ইতিহাস ও রোম্যান্সের পটভূমি নির্মাণ করতে হয়েছে। যুগনায়ক কথাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে শিল্পসৃষ্টি যেমন, তেমনি জীবননীতি এবং সামাজিক ও জাতীয় আদর্শকে রক্ষা করাও পরম কর্তব্য। এই দুই প্রবণতার সমন্বয় প্রয়াসেই বঙ্গদর্শন-পর্বের রোম্যান্সের 'রূপান্তর' ঘটেছিল। রোম্যান্স তখন আর কেবল নান্দনিক আনন্দ দান করে না, সেই রোম্যান্সের জগতে আমরা আমাদের পরিচিত মানুষগুলিকে, আমাদের পারিবারিক জীবনের সমস্যাগুলিকে, তার নৈতিক মূল্যবোধকে কিংবা আমাদের নবজাগ্রত স্বদেশপ্রেমকেও প্রত্যক্ষ করি।)

প্রসঙ্গত আর একটা কথা বলি। গ্রন্থের নামকরণের মধ্য দিয়ে লেখকের মনের প্রবণতার বেশ কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। অন্তত বঙ্কিমচন্দ্রের

উপন্যাসের ক্ষেত্রে তো বটেই। বঙ্কিম-সাহিত্যের পাঠককে প্রাক্-বঙ্গদর্শন পর্বের তিনটি উপন্যাসের নাম লক্ষ্য করতে বলি। তিনটি প্রধান নারী-চরিত্রকে অবলম্বন করে উপন্যাস তিনটির শিরোনামঃ 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'। তিনটি নারীকে ঘিরেই রোম্যান্সের রহস্যময় স্বপ্নজাল। তরুণ রোম্যান্টিক বঙ্কিম-মানসের প্রতিফলন এখানে পরিস্ফুট। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন'-পর্বে ক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র যে অনেক পরিমাণে স্বদেশ, স্বীয় সমাজ ও সমকাল বিষয়ে সজাগ হয়েছেন, তার কিছুটা পরিচয় মেলে এই পর্বে রচিত রোম্যান্সধর্মী ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসগুলির শিরোনামের দিকে তাকালেঃ 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', দেবীচৌধুরাণী' ইত্যাদি। এর মধ্যে একমাত্র শেষোক্ত নামটি নারীচরিত্রদ্যোতক হলেও তার মধ্যে রোম্যান্টিক স্বপ্নালুতার চেয়ে ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠতারই আভাস বেশী ফুটেছে মনে হয়। 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও মানসপ্রবণতার দিক থেকে 'সীতারামকেও' আমরা এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এরকম নানান দিক থেকে দেখলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বঙ্গদর্শন-পর্বের যে এক সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে, এ কথা মানতেই হয়।

৫

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়মিত উপন্যাসের যোগান দিতে হয়েছে। একটির পর একটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এমনও হয়েছে, একই সংখ্যায় দুটি কাহিনী চলেছে। যেমন 'রজনী' শেষ হবার আগেই 'রাধারাণী' শুরু হল। তারপর সেটি ও 'রজনী' একসঙ্গে শেষ হয়েছে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত এই সব উপন্যাস গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হতে আদৌ দেরী হয় নি। বঙ্গদর্শনের প্রকাশকাল ও প্রথম গ্রন্থাকারে মুদ্রণের তারিখের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রকে একদিকে পত্রিকার দাবি মেটাতে যেমন অবিরাম উপন্যাস লিখে যেতে হয়েছে, তেমনি আবার পাঠকের চাহিদায় অনতিবিলম্বে সেগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতেও হয়েছে। সাধারণত বঙ্গদর্শনে উপন্যাসটি শেষ হবার বছরখানেক বাদেই তা বই হয়ে বেরিয়েছে। 'আনন্দমঠ' তো দুমাসের মধ্যেই বেরিয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে বঙ্কিম-চন্দ্রের সেই বিখ্যাত উক্তি, যেখানে তিনি 'নব্য' লেখকদের উদ্দেশে বলছেন, 'যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন

করিবেন।...কাব্য নাটক উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তারপর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে.' ('প্রচার', মাঘ, ১২৯১)। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। যদিও নিজে নব্য লেখক নন, তবু তাঁর মত প্রতিভাবান্ লেখকও এই নির্দেশ মেনে চলতে চাইতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পত্রিকার নিয়মিত লেখকের পক্ষে এই নিয়ম ঠিকমত মেনে চলা প্রায় অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষেও সম্ভব হয় নি। তিনি পূর্বোক্ত প্রসঙ্গেই নিজের অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন : 'যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাটি ঘটিযা উঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর।' অবশ্য একথা যখন লিখছেন, তখন একমাত্র 'সীতারাম' ছাড়া (সেটি তখন 'প্রচারে' বেরুচ্ছে) তাঁর আর সব উপন্যাসই বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হযে গেছে। সাময়িক পত্রের যতই নিন্দা করুন, তখন আর সেই 'ভুল' সংশোধনের উপায় নেই।

যাই হোক, কোন উপন্যাসের প্রথম মুদ্রণ বঙ্গদর্শনে সেটি প্রকাশের প্রায় অব্যবহিত পরেই হবার ফলে, সেখানে পরিবর্তন বা সংশোধনের সুযোগ তেমন ছিল না। তাই দেখতে পাই, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত অংশ থেকে প্রথম সংস্করণের গ্রন্থে বড়ো রকম পরিবর্তন তেমন বিশেষ কোথাও হয নি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পিমন ছিল সদা-অতৃপ্ত। তাই কোন উপন্যাসের 'বর্তমান' রূপ কখনই তাঁর মনোমত হত না। সব সময়েই তাকে কীভাবে আরও সুষ্ঠু শিল্পসম্মত রূপ দান করা যায়, সেকথাই চিন্তা করতেন। 'নব্যলেখকদের প্রতি নিবেদন' প্রসঙ্গে কথিত নিয়ম অবিকল রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব না হলেও প্রকারান্তরে যথাসম্ভব তা মেনে চলেছেন চিরকাল। অর্থাৎ বঙ্গদর্শনে প্রকাশেব আগে কিংবা প্রথম বা দ্বিতীয সংশোধন তেমন না হলেও, তৃতীয় চতুর্থ বা পঞ্চম সংস্করণে লেখক ধীরে সুস্থে সেই উপন্যাসের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে দুখানি উপন্যাসের প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশকালেই বড়োরকম পরিবর্তন হয। সে দুখানি হল 'চন্দ্রশেখর' ও 'রজনী'। 'চন্দ্রশেখরে'র বিজ্ঞাপনে লেখক লিখেছেন : 'চন্দ্রশেখর প্রথম বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইযাছিল। কিন্তু এক্ষণে ইহার অধিকাংশ পরিবর্তিত হইয়াছে। অনেকাংশে পরিত্যাগ করা গিয়াছে এবং কোন কোন স্থান পুনর্বার লিখিত হইয়াছে।' দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত অংশে কোন খণ্ড বিভাগ ছিল না। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থটি উপক্রমণিকা বাদে

ছয় খণ্ডে বিভক্ত হয়। 'বঙ্গদর্শনে' 'চন্দ্রশেখর'-এর পরিচ্ছেদ সংখ্যা ছিল পঁয়তাল্লিশ। প্রথম সংস্করণে সেটি কমে দাঁড়াল উনচল্লিশে। পরে অবশ্য 'চন্দ্রশেখরে'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে বঙ্গদর্শনের মূল অংশের আরও অনেক পরিবর্তন ঘটে।

'রজনী'র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লেখা আছে : 'রজনী' প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে, পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে এই গ্রন্থে এত পরিবর্তন করা গিয়াছে যে, ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে।'

আগেই বলেছি, বঙ্গদর্শনের প্রায় সমস্ত উপন্যাসই ক্রমশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত পাঠ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। আজ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের যে সব সংস্করণ পাঠক সমাজে প্রচলিত, সেগুলি থেকে পাঠক অনেক সময়ে ধারণাই করতে পারবেন না, এদের প্রাথমিক রূপ কত আলাদা ছিল। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রস উপভোগের জন্য সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাঁর প্রচলিত সংস্করণই যথেষ্ট কিন্তু কৌতূহলী পাঠক যদি বঙ্গদর্শনের পাঠের সঙ্গে পরবর্তীকালের ক্রম-পরিবর্তিত পাঠগুলি মিলিয়ে দেখেন, তবে তিনি বঙ্কিম-মানসের ও তাঁর শিল্পচেতনার বিবর্তনের ছবিটি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করবেন। বঙ্কিম-সাহিত্যের নিষ্ঠাবান্ আগ্রহী পাঠকের কাছে এর মূল্য ও আকর্ষণ কম নয়।

পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির যে পরিবর্তন এসেছে তা বিভিন্ন ধরণের। সে পরিবর্তন এসেছে কাহিনীর অংশ বিশেষে, চরিত্রচিত্রণে, বক্তব্যবিষয়ে কিংবা রচনারীতিতে ও ব্যাকরণগত খুঁটিনাটি ব্যাপারে। দুটি ক্ষেত্রে উপন্যাসের আয়তন এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে তার ফলে উপন্যাসের মূল কাঠামো বা গঠন আমূল বদলে গেছে। সে দুটি গ্রন্থ হল 'ইন্দিরা' ও 'রাজসিংহ'।

উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রয়োজনমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেছেন। ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিজ্ঞতা যত বেড়েছে, দেখা যায় তাঁর উপন্যাসের শিল্পরূপ ততই সংযত ও সংহত হয়েছে। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত অংশের অনেক অপ্রয়োজনীয় ভার ও বাক্-বাহুল্য কমিয়ে দিয়ে উপন্যাসের অবয়বে অনেক বেশী ঠাসবুনোনি ও দৃঢ়বদ্ধভাব আনার প্রয়াস চোখ পড়ে পরবর্তী সংস্করণগুলিতে। উপন্যাসের শিল্পরূপের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে অনেক পরিমাণে 'ক্ল্যাসিক্যালপন্থী', বিভিন্ন সংস্করণে সংহতি-সাধনের প্রবণতা থেকে তা ধরা পড়ে। শুধু একটি দৃষ্টান্ত দিই।

চন্দ্রশেখরের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত পাঠে আঠারো সংখ্যক পরিচ্ছেদে আছে, প্রতাপের গৃহে হঠাৎ শৈবলিনীকে দেখে চন্দ্রশেখর তাকে জগৎশেঠের গৃহে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করলেন। তারপর 'পথিপার্শে শীতল আম্র-বৃক্ষচ্ছায়ায়...ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া' শৈবলিনীর জন্য উচ্চকণ্ঠে শোকপ্রকাশ করতে লাগলেন। শেষে রামানন্দ স্বামীর কাছে গিয়ে বললেন, 'গুরো! আর সহ্য করিতে পারি না। আমাকে রক্ষা করুন, আমি শৈবলিনীকে গ্রহণ করি।' (বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১২৮০)

'চন্দ্রশেখরে'র প্রচলিত সংস্করণের পাঠকমাত্রেরই জানা আছে যে শৈবলিনী জগৎশেঠের গৃহে স্থানান্তরিত হয় নি। আর শৈবলিনীকে প্রতাপের গৃহে দেখে চন্দ্রশেখরের ওই রকম আচরণ তো একালের 'চন্দ্রশেখর' পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব্যাপার! বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী সংস্করণে এই অংশের কেবল ঘটনাগত পরিবর্তন-ই সাধন করেন নি, চন্দ্রশেখর চরিত্রকেও বহুলাংশে পরিবর্তিত করেছেন। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত পাঠের তুলনায় পরবর্তী সংস্করণে বঙ্কিমের শিল্পবোধ যে অনেক বেশী সংহত ও সূক্ষ্ম হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়।

বঙ্গদর্শনে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের স্বাভাবিক সমাপ্তির পরেও একটি পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে। উপন্যাসের চরিত্র সমূহের মধ্যে যাঁরা শেষ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তাঁদের কার ভাগ্যে কী ঘটল, সেই ইতিবৃত্ত সেখানে সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। উপন্যাসের মূল ঘটনার 'পরিসমাপ্তির পর এই পরিশিষ্ট' শিল্প দৃষ্টিতে নিতান্তই অবান্তর। এটি পরে বর্জিত হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-চেতনার ক্রমবর্ধমান সংযমবোধের পরিচয় মেলে।

'রজনী'র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণের পাঠ মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়, অন্যান্য অনেক ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে পরিবর্জনের অংশ যথেষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বলেছেন, 'কেবল প্রথমখণ্ড পূর্ববৎ আছে; অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে···'। এই অবশিষ্টাংশের মধ্যে দ্বিতীয় তৃতীয় ও পঞ্চম খণ্ডেই পরিবর্জন বেশী হয়েছে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'রজনী'তে ছয়টি খণ্ড ছিল। পরে সেটি পাঁচ খণ্ডে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্ত না বাড়িয়ে একটি ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে প্রসঙ্গটি শেষ করি। একটি মাত্র শব্দের বর্জন একটি সংলাপের তথা একটি চরিত্রের তাৎপর্য কতখানি রূপান্তরিত করতে পারে, তার একটি

সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে 'রজনী'তে। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত পাঠে আছে, লবঙ্গলতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকালে অমরনাথ প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমি কালি যাহা শচীন্দ্রকে বলিয়া গিয়াছি, তাহা শুনিয়াছ কি?' লবঙ্গ উত্তর দিলেন, 'শুনিয়াছি। তুমি অদ্বিতীয় পাষণ্ড।' (রজনী, ষষ্ঠ খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১২৮২) এই অংশের পরিবর্তিত পাঠে আছে, অমরনাথ ঠিক একই প্রশ্ন করলেন। কিন্তু সেখানে লবঙ্গের উত্তর, 'শুনিয়াছি। তুমি অদ্বিতীয়।'

পরবর্তী সংস্করণের পাঠে যে বিভিন্ন ধরনের সংশোধন চোখে পড়ে, তার একটি হল, কাহিনী বা পরিচ্ছেদ-বিন্যাসের পরিবর্তন। এর দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে স্বাভাবিকতা ও সামঞ্জস্য আনতে সক্ষম হয়েছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিই। প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়ের ইতিহাস ও চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীর বিবাহ-কথা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'চন্দ্রশেখরে'র মধ্যভাগে 'পূর্বকথা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে (ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ—বঙ্গদর্শন, মাঘ, ১২৮০) বিবৃত হযেছে। এর ফলে কাহিনীর স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়েছে। এর ফলে পঞ্চাশ পরিচ্ছেদে ফষ্টরের বজরায় শৈবলিনীর স্বপ্ন কিংবা ওই পরিচ্ছেদেই প্রতাপের গৃহে প্রতাপ ও শৈবলিনীর আকস্মিক সাক্ষাতের পর শৈবলিনীর উচ্ছ্বসিত উক্তি অবান্তর ও দুর্বোধ্য মনে হয়। কারণ তখনও পর্যন্ত প্রতাপ-শৈবলিনীর সম্পর্কের পূর্ব-ইতিহাস পাঠককে জানানো হয় নি। এই ত্রুটি পরে দূর করা হয়। গ্রন্থারম্ভে 'উপক্রমণিকা'য় তিনটি পরিচ্ছেদে প্রতাপ-শৈবলিনীর অতীত কাহিনী বিবৃত করায় উপন্যাসের গতি স্বাভাবিক ও শিল্প-সম্মত হ'ল।

কেবল ঘটনা বা পরিচ্ছেদের বিন্যাসের পরিবর্তন নয়, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত পাঠ থেকে পরবর্তী সংস্করণগুলিতে অন্য ধরণের আরও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন চোখে পড়ে। এদের মধ্যে উপন্যাসের কোন কোন প্রধান চরিত্রের পরিবর্তন, (কোথাও বা তাকে আমূল বলা চলে) লক্ষ্য করা যায়। এইসব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেখি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের রুচি আরও পরিশীলিত ও সংযত হয়েছে, শিল্পিসত্তা স্থূলতা বর্জন করে আরও সূক্ষ্ম রসাশ্রিত হয়েছে এবং চরিত্রগুলিকে জীবনের স্বভাবধর্ম ও নৈতিক চেতনার সঙ্গে সমন্বিত করে অধিকতর বাস্তবনিষ্ঠভাবে গড়ে তোলার প্রবণতা এসেছে। এই ধরণের চরিত্রের মধ্যে রোহিণী, অমরনাথ, শান্তি ও রাধারাণীর নাম উল্লেখ করা

যেতে পারে। এখানে রোহিণী ও অমরনাথ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' রোহিণী পরবর্তী সংস্করণগুলিতে পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন সংস্করণে এই পরিবর্তনের ক্রমোন্নতি চোখে পড়ে। বঙ্গদর্শনের রোহিণী দুশ্চরিত্রা, লোভী। হরলালের সঙ্গে কথোপকথনের সময়েই তার চরিত্রের এই নির্লজ্জ ইতরতা ধরা পড়েছে। কিন্তু ভ্রমরের প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী ও গোবিন্দলালের প্রণয়িনীকে বঙ্কিমচন্দ্র ওই ইতরতার পঙ্কস্তরে নিমজ্জিত রাখতে পারেন নি। তাই প্রতি সংস্করণেই কিছু কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রোহিণী শেষ পর্যন্ত অনেক 'মার্জিত' ও 'পরিশীলিত' হয়।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'রজনীর' অমরনাথ চরিত্রের প্রায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে পরবর্তীকালে। বঙ্গদর্শনে দেখি, অমরনাথ লবঙ্গলতা-হরণের প্রতিশোধ নেবার জন্যই রজনীকে উদ্ধার করতে দৃঢ়সংকল্প, কিন্তু গ্রন্থের অমরনাথ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে শান্ত করেছে। সে কেবল অসহায় দরিদ্র বালিকার প্রতি সুবিচার করার জন্য ব্যগ্র। 'বঙ্গদর্শনে' দেখি অমরনাথ রজনীর সম্পত্তি গ্রহণ করেছে এবং রজনীর প্রতি কোন জোর না করলেও তাকে পত্নী বলে পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু পরে গ্রন্থে দেখি, অমরনাথ আকৃষ্ট হয়েছে রজনীর চরিত্র-মাধুর্যে, বিষয়কে সে অবহেলা করেছে। এই পরিবর্তন কত গভীর, তা এক কথায় বোঝাতে গেলে প্রসঙ্গান্তরে ব্যবহৃত 'রজনী' উপন্যাসের একটি উদ্ধৃতির পুনরুক্তি করে বলতে হয় বঙ্গদর্শনে অমরনাথ ছিল 'অদ্বিতীয় পাষণ্ড'। পরবর্তীকালের সংস্করণে সে আপন চরিত্র গৌরবে হয়ে উঠল মানবসমাজে 'অদ্বিতীয়'।

আলোচনা-প্রসঙ্গে আয়তন ও গঠন-গত মৌলিক রূপান্তরের দিক থেকে আমরা 'ইন্দিরা' ও 'রাজসিংহে'র উল্লেখ করেছিলাম। এদের সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা বলা দরকার। 'ইন্দিরা' প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় ১২৭৯ সালের চৈত্র সংখ্যায়, এটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮০ সালে। প্রথম সংস্করণ ও বঙ্গদর্শনের পাঠের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। প্রথম সংস্করণে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪৫। পরে পঞ্চম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র একে আমূল পরিবর্তিত করেন। ৪৫ পৃষ্ঠা তখন ১৭৭ পৃষ্ঠায় রূপান্তরিত হয়। 'ইন্দিরা'র বঙ্গদর্শন অংশে ছিল আটটি পরিচ্ছেদ। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত।

সেখানে কোন নাম ব্যবহৃত হয়নি। পঞ্চম সংস্করণের প্রতিটি পরিচ্ছেদের পৃথক্ নাম দেওয়া হয়েছে ও তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বাইশ। এছাড়া বঙ্গদর্শনে বস্তুত কোন উপকাহিনী ছিল না। পঞ্চম সংস্করণে গৃহিণী-সুভাষিণী -রমনবাবু ইত্যাদিকে নিয়েও একটি দীর্ঘ উপকাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বঙ্গদর্শনে যা ছিল ক্ষুদ্র 'উপকথা' তা হয়ে দাঁড়াল রীতিমত একটি উপন্যাস। এই গঠনগত পরিবর্তনের কোন স্পষ্ট কারণ বঙ্কিমচন্দ্র জানান নি। তিনি শুধু বলেছেন, 'যিনি যোদ্ধা, তিনি ছোট ইন্দিরাখানি মনঃসংযোগ দিয়া পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, তাহাতে কি কি দোষ ছিল এবং এক্ষণে তাহা কি প্রকারে সংশোধিত হইয়াছে।' (পঞ্চম বারের বিজ্ঞাপন, ইন্দিরা)।

'ইন্দিরা'র আয়তন-বৃদ্ধির কোন নির্দিষ্ট কারণ বঙ্কিমচন্দ্র দেখান নি বটে, কিন্তু 'রাজসিংহে'র চতুর্থ সংস্করণে তিনি এর কলেবর বৃদ্ধির কারণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনার সারকথা হল, যথার্থ 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এর রূপ দেবার জন্যই 'রাজসিংহে'র আকারে ও প্রকারে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে।

১২৮৪ সালের চৈত্রসংখ্যা থেকে ১২৮৫ সালের ভাদ্র পর্যন্ত বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে ছয় সংখ্যায় 'রাজসিংহ' প্রকাশিত হয়। কিন্তু উপন্যাসটি সেখানে সম্পূর্ণ হয় নি। উনিশটি পরিচ্ছেদ বঙ্গদর্শনে বেরিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এর কিছু পরিবর্তন করে 'ক্ষুদ্রকথা' নামে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে একে প্রকাশ করেন। তখনও এতে পরিচ্ছেদ-সংখ্যা উনিশই ছিল। বঙ্গদর্শনে 'রাজসিংহে'র প্রকাশ কোন অসম্পূর্ণ অবস্থায় বন্ধ হয়ে যায় এ সম্পর্কে ১৩০১ সালের 'সাধনা' পত্রিকায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কিছু আলোকপাত করেছেন। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে একবার বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন। এর উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কোন বন্ধুর নাম করে বলেছিলেন, 'এঁরা বলেন, আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এখনকার ছেলেপুলে মাটি হইতেছে। তাই আর ডাকাত মাণিকলালকে আঁকিতে ইচ্ছা করে না।'

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'রাজসিংহ' ও প্রথম তিনটি সংস্করণে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত 'রাজসিংহ'—সবই বস্তুত 'ক্ষুদ্রকথা'—মূল পরিকল্পনার ভগ্নাংশ। সেই পরিকল্পনা পূর্ণতা পায় বৃহদায়তন চতুর্থ সংস্করণে। চতুর্থ সংস্করণে সংযোজিত অনেক চরিত্র, ঘটনা-সংস্থান ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বঙ্গদর্শনে ছিল না।

জেবউন্নিসা, উদিপুরী ও দরিয়াবিবি সেখানে ছিল না। উদীপুরীর নিকট চঞ্চলকুমারীর নিমন্ত্রণ পত্র, ঔরঙ্গজেব-ইমলি বেগম-কাহিনী, চঞ্চলকুমারীর পণরক্ষা, জেবউন্নিসা-মবারক-দরিয়া-কাহিনী, মাণিকলাল ও নির্মলকুমারীর কোর্টশিপ ও বিবাহ-কাহিনী—এসব উপাখ্যান পরবর্তীকালের সংস্করণে যুক্ত হয়ে মূল 'ক্ষুদ্রকথা'কে যথার্থ উপন্যাসের গৌরব দান করেছে।

বঙ্গদর্শন-অংশে ক্ষুদ্রায়ত 'রাজসিংহে'র আর একটি বড় অভাব ছিল—ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিশালতার। ইতিহাসের পটভূমি সেখানে আদৌ ছিল না, এমন বলছি না, তবে সেখানে কাহিনীর উপরেই যেন জোর ছিল বেশী, ইতিহাসের পটভূমির উপর নয়। অবশ্য ওই ক্ষুদ্রায়ত গ্রন্থে তা প্রত্যাশিতও নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ'কে পূর্ণায়ত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' রূপে রচনার পরিকল্পনা-ই মনে মনে করেছিলেন। আর তা বাস্তবায়িত করতে হলে তাঁর নিজের কথায়, 'রাজসিংহের সঙ্গে মোগল বাদশাহের যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সমস্তই উপন্যাসভুক্ত করিতে হয়। তাহা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি বলিয়া গ্রন্থের কলেবর এত বাড়িয়াছে।' (চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন)।

৬

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বিভিন্ন উপন্যাসের পাঠের সঙ্গে পরবর্তী সংস্করণগুলির পাঠ মেলাতে গেলে আরেকটি জিনিস বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি শব্দ বা ভাষাগত পরিবর্তন। বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে যেমন উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র, এমনকি মূল পরিকল্পনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেছেন, অন্যদিকে তেমনি উপন্যাসে ব্যবহৃত 'আপাত তুচ্ছ' বিভিন্ন শব্দের রূপান্তর ঘটিয়ে কিংবা বাক্যগঠনরীতির বা শব্দবিন্যাসের সংস্কার করেও উপন্যাসের শিল্পসৌকর্য বিধান করতে সচেষ্ট হয়েছেন। আগেই বলেছি, স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের মন ছিল সদা-অতৃপ্ত। সেই অতৃপ্তির পরিচয় ফুটে উঠেছে মূল রচনায় ব্যবহৃত শব্দ বা ভাষারীতির ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি পরিবর্তন সাধনের প্রয়াসে। এই পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত বাহুল্যবোধে এখানে দিলাম না। কৌতূহলী পাঠক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত শতবার্ষিক সংস্করণের 'পাঠভেদ' অংশ দেখলেই এর আভাস পাবেন। সেখানে অবশ্য বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত পাঠের বদলে প্রথম সংস্করণের পাঠ গৃহীত হয়েছে। তবু অনেকস্থানেই ওই দুই পাঠের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই।

ভাষারীতি প্রসঙ্গে আর একটি কথা। প্রাক্-বঙ্গদর্শন-পর্বের উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষারীতির সঙ্গে বঙ্গদর্শন-পর্বের ভাষারীতি মিলিয়ে দেখলে এই দুয়ের মধ্যেকার প্রভেদ অনেকস্থলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বোঝা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ক্রমেই বিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। ভাষা ক্রমেই দুরূহ তৎসম-কণ্টকিত সমাসবদ্ধ ও অলঙ্কারবহুল প্রয়োগ যথা-সম্ভব বর্জন করে সহজ প্রত্যক্ষ ও ঋজু হয়ে উঠতে চাইছে। ভাষা ক্রমশ ভারমুক্ত হয়ে অপেক্ষাকৃত লঘু পায়ে গতিশীল ও সজীব হয়ে উঠছে। এই পর্বের ভাষায় আগেকার অতিরিক্ত শব্দাড়ম্বর ও তার দরুন একটা যে একঘেয়েমি ভাব, সে সব কমে এসেছে। কেবল বঙ্গদর্শন-পর্বের সামাজিক উপন্যাস সম্পর্কে নয়, ঐতিহাসিক রোম্যান্স সম্পর্কেও একথা সত্য। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যথাক্রমে 'মৃণালিনী' ও 'দেবী চৌধুরাণী'—এই দুটি উপন্যাসের অংশ-বিশেষ পাশাপাশি রাখলেই দুই পর্বের ভাষা ও রচনারীতির পার্থক্য পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে :

"একদিন প্রয়াগতীর্থে, গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে, অপূর্ব প্রাবৃট দিনান্ত শোভা প্রকটিত হইতেছিল। প্রাবৃট কাল, কিন্তু মেঘ নাই অথবা যে মেঘ আছে তাহা স্বর্ণময় তরঙ্গমালাবৎ পশ্চিম গগনে বিরাজ করিতেছিল। সূর্যদেব অস্তে গমন করিতেছিলেন, বর্ষার জল-সঞ্চারে গঙ্গা-যমুনা উভয়েই সম্পূর্ণ শরীরা, যৌবনের পরিপূর্ণতায় উন্মাদিনী, যেন দুই ভগিনী ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরে আলিঙ্গন করিতেছিল। চঞ্চল বসনাগ্রভাগবৎ তরঙ্গমালা পবনতাড়িত হইয়া কূলে প্রতিঘাত করিতেছিল।"

(মৃণালিনী, প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)

"বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর ; অন্ধকার মাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণা। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি ; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার ; অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে, তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর তর কল কল পত পত শব্দ

করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে।" (দেবী চৌধুরাণী, দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদ)।

বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম সম্পাদক ও প্রধানতম লেখক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। বঙ্গদর্শনের অন্যান্য রচনার মত উপন্যাসেরও মুখ্য যোগানদার ছিলেন তিনিই। তাই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উপন্যাসের আলোচনার অর্থ প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেরই সমীক্ষা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই বঙ্গদর্শনের একমাত্র উপন্যাস-লেখক ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপন্যাসও এই পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়।

এঁদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের উপন্যাসই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের নাম 'শৈশব সহচরী'। আষাঢ় ১২৮২-তে শুরু হয়ে ফাল্গুন ১২৮৪—তে এটি শেষ হয়। অবশ্য এর প্রকাশ নিয়মিত ছিল না। মাঝে মাঝে ছেদ আছে। চোদ্দটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই উপন্যাসের আয়তন বেশ বড়। কিন্তু উপন্যাস হিসাবে এর সাফল্য প্রায় অকিঞ্চিৎকর। চাঞ্চল্যকর অতি-নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ এই গ্রন্থটিতে লেখক কাহিনী-ও ঘটনা-সংস্থান-গত আকর্ষণই যেন বেশীমাত্রায় সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। নরনারীর চরিত্র বা মনস্তত্ত্ব ফুটে ওঠার তেমন কোন সুযোগ গ্রন্থের মধ্যে নেই। উপন্যাসের কাহিনীস্রোত বাস্তব ও স্বাভাবিক পথে অব্যাহত গতিতে চলতে পারে নি আদৌ। পক্ষান্তরে লেখক যেন নিজের সুবিধামত ঘটনায় মোচড় দিয়ে নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টিতেই বেশী আগ্রহী। 'শৈশব সহচরী' ঘটনা ও পরিবেশের পরিকল্পনার দিক থেকে সামাজিক মানুষের সমকালীন জীবনের ছবি। কিন্তু সব মিলিয়ে সমকালীনতার আবেদন সৃষ্টিতে লেখক ব্যর্থ হয়েছেন বলা চলে। সবটাই যেন কোন অর্ধপরিচিত রোম্যান্সের জগতের অতিরঞ্জিত ছবি। অধিকাংশ ঘটনাই রঙের চড়া প্রলেপের ফলে স্বাভাবিকতা হারিয়েছে। প্রধান চরিত্রগুলি—কুমুদিনী, রজনীকান্ত, শরৎ, বিনোদিনী সবাই অল্প-বিস্তর আবেগ-উচ্ছ্বাসধর্মী অগভীর রোম্যান্স-জগতের চরিত্র।

পূর্ণচন্দ্র অগ্রজ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কাহিনীর জটিলতা বা নাটকীয়তা

সৃষ্টির রীতিকে মাত্রাতিরিক্তভাবে অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অগ্রজের কল্পনার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য, জীবনদৃষ্টির গভীরতা ও চরিত্রসৃষ্টির অসামান্য নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি তাঁর সংযম ও সংহতিবোধ—এদের কোনটিই পূর্চন্দ্র আয়ত্ত করতে পারেন নি। পূর্ণচন্দ্রের ঔপন্যাসিক ক্ষমতার এই স্বল্পতা আরও করুণ ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে, যখন দেখি একই সংখ্যায় 'শৈশব সহচরী'র পাশাপাশি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, পূর্ণচন্দ্র-লিখিত আরেকটি কাহিনী—'মধুমতী', 'উপন্যাস' নামে বঙ্গদর্শনের ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেটি আদৌ উপন্যাস নয়, বরং বিশেষজ্ঞগণ সেটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম 'ছোট গল্প' বলে অভিহিত করেছেন।

পূর্ণচন্দ্রের পর সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাস 'মাধবীলতা' কার্তিক ১২৮৫ থেকে আরম্ভ হয়ে বৈশাখ ১২৮৮তে শেষ হয়। এটিরও প্রকাশে মাঝে মাঝে ছেদ পড়েছিল। প্রসঙ্গত জানাই, এর কিছুদিন পরে ১২৮৯ সালের শ্রাবণ থেকে কার্তিক সংখ্যায 'জাল প্রতাপচাঁদ' নামে সঞ্জীবচন্দ্রের আরেক আখ্যায়িকামূলক গ্রন্থ বেরোয়। কিন্তু সেটি আসলে উপন্যাস নয়। এটি বর্ধমানের রাজবাড়ীর জাল প্রতাপচাঁদকে কেন্দ্র করে নানা পুরনো পুঁথি ও নথিপত্র থেকে আহৃত বিচিত্র তথ্য-প্রমাণ-সহযোগে রচিত এক রোমাঞ্চকর গ্রন্থ। একে সঞ্জীবচন্দ্র উপন্যাসরূপে উপস্থাপিত করতে চান নি। সুতরাং বর্তমান প্রসঙ্গে এর আলোচনার প্রয়োজন নেই।

'মাধবীলতা' উপন্যাস। রচনার প্রসাদগুণ, স্নিগ্ধ সরল মাধুর্য, গল্প-বলার অনায়াস ভঙ্গি ও সংবেদনশীলতা ইত্যাদি শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় থাকা সত্ত্বেও 'মাধবীলতা' সার্থক উপন্যাস হয় নি। লেখক হিসাবে সঞ্জীবচন্দ্রের যে সব দুর্বলতার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সে সবই এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। ফলে 'জাল প্রতাপচাঁদ'কে উপন্যাস হিসাবে রচনার চেষ্টা না করা সত্ত্বেও সেটি যেমন আংশিকভাবে উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত, তেমনি আবার 'মাধবীলতা' পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হিসাবে রচিত হয়েও শেষ পর্যন্ত আংশিকতা দোষে দুষ্ট। সঞ্জীবচন্দ্রের ঔপন্যাসিক কল্পনা এই সামগ্রিক দৃষ্টির অভাবে অনেক সময়েই প্রায় নিষ্ফল হয়ে গেছে। 'মাধবীলতা'র ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক পরিবেশ আদৌ স্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট নয়। ফলে এটি না ঐতিহাসিক পটযুক্ত কাহিনী, না যথার্থ রোম্যান্স, না খাঁটি বাস্তবধর্মী উপন্যাস। সব কিছুর আংশিক মিশ্রণে

'মাধবীলতা' শিথিলবন্ধ, প্রায়-অবাস্তব ও প্রায়-অবিশ্বাস্য পরিণামযুক্ত এক দুর্বল অকিঞ্চিৎকর কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে।

'মাধবীলতা'-রচয়িতার যদি কোন কৃতিত্ব থাকে তবে সেটা এই যে, আলোচ্য উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব তেমন চোখে পড়ে না। বস্তুত কেবল 'মাধবীলতা'-তেই নয়, সঞ্জীবচন্দ্রের সব রচনাতেই এই স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উপন্যাসের পক্ষে এই বঙ্কিম-প্রভাব-মুক্ত স্বাতন্ত্র্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীব 'কাঞ্চনমালা' বঙ্গদর্শনে আষাঢ় ১২৮৯ থেকে আরম্ভ হযে মাঘ ১২৮৯এ শেষ হয। এটি নিযমিত প্রতি মাসেই প্রকাশিত হয। মাঝে কোন ছেদ ছিল না। গ্রন্থটিব বিষয-নির্বাচনে শাস্ত্রী মহাশয যথেষ্ট কৃতিত্বেব পবিচয দিযেছেন। ব্রাহ্মণ্যশক্তিব সঙ্গে বৌদ্ধশক্তির সংঘর্ষ এবং শেষোক্ত শক্তির জয এই উপন্যাসের মূল ভিত্তি। বিষযের এই গৌবব 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসেব গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিশ্চয কিছুটা বৃদ্ধি কবেছে। নচেৎ ভাষা ও বচনাবীতির দিক থেকে 'কাঞ্চনমালা'র তুলনায 'মাধবীলতা' অনেক বেশী প্রাঞ্জল ও হৃদযগ্রাহী সন্দেহ নেই। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, সব মিলিযে 'কাঞ্চনমালা'য যে একটি নির্দিষ্ট কালগত পটভূমি ও কাহিনী-পরিণাম ফুটে উঠেছে, 'মাধবীলতা'য তার কিছুই নেই। সেখানে সবই যেন অস্পষ্ট, অবিন্যস্ত ও উদ্দেশ্যহীন।

প্রসঙ্গত স্মবণ করিযে দিই যে, বঙ্গদর্শনে একই সঙ্গে কিছুদিন হরপ্রসাদেব 'কাঞ্চনামালা' ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবীচৌধুরাণী' প্রকাশিত হযেছিল। 'কাঞ্চন-মালা'র কাহিনী-বিন্যাস ও ভাষারীতি-তে বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রভাব পরিস্ফুট। হরপ্রসাদের স্বকীযতা বা মৌলিকতা তেমন কোথাও চোখে পডে না। 'বঙ্গদর্শনে' হরপ্রসাদের আবেকটি আখ্যাযিকা প্রকাশিত হয। সেটি 'বাল্মীকির জয'। দুটি রচনার ভাষাবীতি-ই বঙ্কিম-প্রভাবিত। কিন্তু তবু সমকালীন দুটি উপন্যাস—'কাঞ্চনমালা' ও 'দেবীচৌধুরাণী'র ভাষাশৈলীতে কতখানি প্রভেদ। 'কাঞ্চনমালা'য যখন বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত পুরনো ভাষারীতি অনুসরণের চেষ্টা চলেছে, তখন 'দেবীচৌধুরাণী'তে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই সেই ভাষাকে ভেঙে চুরে আরও সহজ ও স্বচ্ছন্দ করে গডে তুলেছেন।

পরিশেষে আরও দুয়েকটি প্রসঙ্গ সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বাংলা উপন্যাসের একটি সমীক্ষা বর্তমান প্রবন্ধে উপস্থাপিত করেছি। বলা বাহুল্য, সমগ্র বাংলা উপন্যাসের সঙ্গে বঙ্গদর্শনের যোগ কিংবা বাংলা উপন্যাসের উপর বঙ্গদর্শনের প্রভাব নির্ধারণ বর্তমান প্রবন্ধের অন্বিষ্ট নয়। বোধ করি তার প্রয়োজনও তেমন নেই। কারণ বাংলা উপন্যাসের সঙ্গে বা তার উপর বঙ্গদর্শনের যে যোগ কিংবা প্রভাব, সে তো আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের-ই। তিনি বঙ্গদর্শনের অন্যান্য বিভাগের মতই তার উপন্যাস-অংশেরও প্রাণপুরুষ। তবু ওরই মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সৃষ্টির ক্ষেত্রে আপন ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে বঙ্গদর্শন বাংলা উপন্যাসে যে বিশিষ্ট ভূমিকা নিজে থেকেই অর্জন করেছে, সে কথা আশা করি বর্তমান প্রবন্ধে অনুক্ত থাকে নি।

ভূমিকা বা প্রভাবের কথা থাক। কারণ বাংলা উপন্যাসে বঙ্গদর্শনের যেটুকু নিশ্চিত প্রভাব, তা' থেকে আমরা কোনদিনই বঞ্চিত হব না। তা' আমাদের আলোচনার অপেক্ষা না রেখেই চিরদিন আমাদের অগোচরেও বর্তমান থাকবে। কিন্তু একটি পরম আকর্ষণীয় রসসম্ভোগ থেকে চিরকালের মত, আমরা যারা একালের মানুষ, একালের উপন্যাস-পাঠক, বঞ্চিত হয়েছি। সেটি হল বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাসের খণ্ড খণ্ড অংশ অল্প অল্প করে আস্বাদ করার এক আশ্চর্য আনন্দময় অভিজ্ঞতা। সেদিনের পাঠকেরা কীভাবে সেই আনন্দ উপভোগ করতেন, 'জীবনস্মৃতি' থেকে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণের সেই প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করে আলোচনা শেষ করছি :

'একে তো তাহার [বঙ্গদর্শনের] জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরও বেশী দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, এখন যে খুশি সেই অনায়াসে একেবারে একগ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া—তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর কেহ পাইবে না।'

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ও গদ্যরচনায় ডায়েরির প্রকরণ ও প্রবণতা

রবীন্দ্রনাথের শিল্পিসত্তা আত্মপ্রকাশের প্রেরণায় সন্ধান করেছে সৃষ্টির বহুবিচিত্র পথ: কবিতা গান কথাসাহিত্য নাটক চিত্রকলা ও পত্রসাহিত্যের নানা আঙ্গিক-প্রকরণ। কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি। রবীন্দ্রমানসকে যে-সব উপায়-উপকরণের মধ্য দিয়ে আমরা ধরতে বা বুঝতে পারি, পূর্বোক্ত মাধ্যমগুলি তাদের মধ্যে বিশিষ্ট। স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের নিভৃত মর্মলোকে প্রবেশের এই পথগুলি সর্বজনবিদিত সন্দেহ নেই। কিন্তু শিল্পস্রষ্টাকে অন্তরঙ্গ-রূপে জানার পথ কেবল ওই ক'টিতেই সীমিত নয়। বলা বাহুল্য, আরো আছে। ডায়েরি বা দিনলিপি তাদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথও ডায়েরি লিখেছেন। কিন্তু তাঁর বিপুলায়ত সৃষ্টির মধ্যে এদের সংখ্যা আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। কারণ 'সরকারী'ভাবে ঘোষিত তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরির সংখ্যা মাত্র দুই—'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' ও 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'। শিল্পমূল্যের দিক থেকে কিংবা তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যের প্রেরণা বা উপকরণ হিসাবে এই দুটি ডায়েরির গুরুত্ব বা মূল্য স্বতন্ত্রভাবে কতখানি স্বীকৃত হয়, বলা কঠিন। যে কারণেই হোক, রবীন্দ্রনাথের রচনার বিভিন্ন শাখার যেমন আলোচনা বা মূল্যায়ন হয়েছে, তাঁর ডায়েরি-রচনা সম্পর্কে আগ্রহ বা কৌতূহল তেমন চোখে পড়ে নি। অন্তত 'দিনলিপি' হিসাবে তাঁর ওই 'ডায়ারি'-দুটির স্বতন্ত্র সমীক্ষার প্রয়াস তেমন হয়েছে বলে মনে হয় না। অবশ্য আমাদের এ প্রবন্ধও ঠিক সেই 'অপূর্ণতা' দূর করার জন্য রচিত নয়। তাঁর বিশেষ কোনো ডায়েরির স্বতন্ত্র মূল্য বা গুরুত্ব প্রসঙ্গে কোনো বিতর্কের মধ্যে আমরা প্রবেশ করতে চাই নে। আমাদের দৃষ্টিকোণ একটু স্বতন্ত্র। সাধারণভাবে, প্রকাশমাধ্যম হিসাবে ডায়েরি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের বিচার এবং সেই মনোভাব তাঁর লেখক (ঔপন্যাসিক তথা রচনাকারের)-জীবনকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করেছে, তার নির্ধারণ ও তাৎপর্য-সন্ধানেই আমাদের বিশেষ আগ্রহ।

২

আত্মনিষ্ঠ ভাব ও ভাবনাকে ধরে রাখার একটি বিশিষ্ট আধার দিনলিপি।

রবীন্দ্রনাথের মতো গভীর অন্তর্মুখী ও আত্মনিষ্ঠ এক শিল্পীর জীবনে দিনলিপি বা ডায়েরির একটি বিশেষ ভূমিকা তাই একান্ত প্রত্যাশিত। আত্মনিষ্ঠ মনকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তি দিয়েছেন নানা ভাবে। তাঁর অজস্র গীতিকবিতায় গানে এবং বিচিত্র গদ্য রচনায়। কিন্তু তবু ডায়েরির বিকল্প হিসাবে এদের গ্রহণ করা চলে না। কারণ যথার্থ ডায়েরিতে লেখক যতটা সহজ ও অন্তরঙ্গ হতে পারেন, যেমন করে নিতান্ত ব্যক্তিমনের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত অনুভবকে প্রকাশ করতে পারেন, এমন বোধ করি আর কোথাও নয়। এখানে লেখকের সামনে আর কেউ থাকে না। তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ একা। জগৎ ও জীবনের পট-ভূমিতে নিজের মুখোমুখি এসে বসেন লেখক। আর সমস্ত রচনারই পাঠক বা শ্রোতা থাকে, কিন্তু কোনো পাঠকের জন্যই 'ডায়ারি' লেখা হয় না। যথার্থ দিনলিপি কোনো উপলক্ষে কারো ফরমাশে লেখা হতে পারে না, লেখার সময় দিনলিপি-লেখকের চোখের সামনে কখনও সম্পাদক বা প্রকাশকের ছবি ভাসে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ডায়েরি বা দিনলিপি একান্তভাবে 'আলাপের অদ্বৈতরূপ'।

হঠাৎ শুনলে হয়তো কিছুটা অবাক লাগে, কিন্তু কথাটা সত্য—ডায়েরি রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কোনোদিনই অনুকূল ছিল না। ডায়েরি রচনার উদ্দেশ্য বা প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যেখানে যা বলেছেন, তার কোথাও আত্মপ্রকাশের এই বিশেষ আধারটি সম্বন্ধে তাঁর এতটুকু আস্থার নিদর্শন মেলে না। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ প্রথম স্পষ্টভাষায় ডায়েরি সম্পর্কে তাঁর 'প্রতিকূল' মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। ১২৯৯ সালের মাঘ মাসের 'সাধনা'য় যখন প্রথম 'ডায়ারি' বা 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' ধারাবাহিক বেরোতে শুরু করে, তখন তার 'ভূমিকা'র একেবারে আরম্ভেই লেখক লিখছেন, "পাঠকেরা যদি 'ডায়ারি' শুনিয়া মনে করেন ইহার মধ্যে লেখকের অনেক আত্মকথা আছে, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিবেন।" অর্থাৎ ডায়েরির যে প্রচলিত সংজ্ঞা ও লক্ষণ তার সঙ্গে পঞ্চভূতের কোনো মিল নেই, এ কথাই লেখক ঘোষণা করতে চান। তারপর গ্রন্থের মধ্যে আরো কিছুটা এগোলে লেখকের এই মনোভাবের একটা ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায়। কেন তিনি প্রচলিত ধরণের 'ডায়ারি' লিখতে চান না, তার কারণ লেখক প্রধানত এই গ্রন্থের সূত্রধার 'আমি' চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। এই মত রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব মত, কারণ 'আমি' চরিত্র যে-সব কথা বলেছে বস্তুত 'পঞ্চভূতে'র

কেউই তার কোনো জোরালো প্রতিবাদ করে নি বা ওই বক্তব্যকে খণ্ডন করে ডায়েরি লেখার সপক্ষে কোনো মত প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয় নি। পক্ষান্তরে, কয়েকটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদে বক্তা [আমি] ও স্রোতস্বিনী কেবল আপন বক্তব্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ পেয়েছেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য : 'ডায়ারি একটা কৃত্রিম জীবন প্রতিদিন আমরা যাহা অনুভব করি তাহা প্রতিদিন লিপিবদ্ধ করিতে গেলে তাহার যথাযথ পরিমাণ থাকে না।... ডায়ারি রাখিতে গেলে একটা কৃত্রিম উপায়ে আমরা জীবনের প্রত্যেক তুচ্ছ-তাকে বৃহৎ করিয়া তুলি এবং অনেক কচি কথাকে জোর করিয়া ফুটাইতে গিযা ছিঁড়িয়া অথবা বিকৃত করিয়া ফেলি।' অন্যত্র বলছেন, 'জীবন হইতে প্রতিদিন অনেক ভুলিয়া, অনেক ফেলিয়া অনেক বিলাইয়া তবে আমরা অগ্রসর হইতে পারি। কী হইবে ··জীবনের প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত পশ্চাতে টানিয়া লইযা। প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক ঘটনার উপর যে ব্যক্তি বুক দিয়া চাপিযা পড়ে সে অতি হতভাগ্য।'

১২৯৯ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন এ–সব কথা লিখেছেন তখন তাঁর বয়স একত্রিশ। কবির অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সের এই মনোভাব পরিণত বয়সেও পাল্টায় নি। এ থেকে যেন মনে হয়, এই মনোভাব কোনো বিশেষ কালপর্বের সাময়িক ব্যাপার নয়, বরং কবিচিত্তের একটি স্থাযী প্রবণতা। তেষট্টি বছর বয়সে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'তে কবি বলছেন : 'ডায়ারি লেখাটা কৃপণের কাজ। প্রতি দিন থেকে ছোটো বড়ো কিছুই নষ্ট না হোক, সমস্তই কুড়িযে-কুড়িযে রাখি, এই ইচ্ছে ওতে প্রকাশ পায়। কৃপণ এগোতে চায না, আগলাতে চায়। .

'ডাযারি লেখাটা আমার স্বভাবসংগত নয়। আমি ভোলানাথের চেলা। ঝুলি বোঝাই করে আমি তথ্য সংগ্রহ করি নে। আমার জলাশয়ের যে জলটাকে অন্যমনস্ক হয়ে উবে যেতে দিই সেইটেই অদৃশ্য শূন্যপথে মেঘ হয়ে আকাশে জমে, নইলে আমার বর্ষণ বন্ধ।···

'আমি যদি বোকামি করে প্রতিদিনের ডায়ারি লিখে যেতুম তা হলে তাতে করে হত আমার নিজের স্বাক্ষরে আমার নিজের জীবনের প্রতিবাদ। তা হলে আমার দৈনিক জীবনের সাক্ষ্য আমার সমগ্র জীবনের সত্যকে মাটি করে দিত।'

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'ডায়ারি লেখাটা আমার স্বভাবসংগত

নয়।' কিন্তু 'স্বভাবসংগত নয়' বলতে কী বোঝাচ্ছেন কবি? নিশ্চয়ই তাঁর কবিস্বভাব বা শিল্পিস্বভাবের অনুকূল নয়, এই অর্থে? উপরের উদ্ধৃতির শেষ অংশে সেটাই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে মনে হয়। কিন্তু প্রশ্ন এই, কেন বলেছেন এ কথা? ডায়েরি রচনা তাঁর সমগ্র কবিসত্তার আত্মপ্রকাশের পথে অন্তরায় হবে, সম্ভবত এই তাঁর আশঙ্কা। কারণ 'দৈনিক জীবনের' 'ঝুলি বোঝাই করা' অজস্র খণ্ড খণ্ড তথ্যের সাক্ষ্য কবির 'সমগ্র জীবনের সত্য'কে পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিতে পারে না কিছুতেই। খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা বা ঘটনার উপকরণের ভিড়ে ব্যক্তির সামগ্রিক ছবিটি ঝাপসা হয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথের এ ধারণা নিশ্চয় মিথ্যা নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ডায়েরিকে যে অর্থে গ্রহণ করে এই ধারণার বশবর্তী হয়েছেন, তা থেকে একটু ভিন্ন অর্থেও ডায়েরিকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়াতে ডায়েরির সংজ্ঞা-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: 'Diary means simply a daily record of events or observations made by an individual. In it the man of letters inscribes the daily results of his reading or his meditations.' অর্থাৎ ডায়েরিতে নিছক দৈনন্দিন জীবনের স্থূল ঘটনা বা ক্রিয়াকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ হবে তা নয়, তার মধ্যে লেখকের প্রতিদিনের অধ্যয়ন ও সুগভীর চিন্তাভাবনা–উপলব্ধিরও অকৃত্রিম প্রকাশ ঘটবে। ডায়েরি শুধু ঘটনাবহুল বহিরঙ্গ জীবনের খণ্ডচিত্রের সমষ্টিমাত্র নয়. তা লেখকের মানস–জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয়বাহীও বটে।১ এ প্রসঙ্গে অন্যদের মধ্যে ঊনিশ শতকের বিখ্যাত ফরাসী জার্নাল-রচয়িতা অ্যামিয়েল (Amiel)–এর দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। 'ছিন্নপত্রে'র পাঠকমাত্রই জানেন অ্যামিয়েল ছিলেন কবির 'নির্জনের প্রিয়বন্ধু' এবং তাঁর জার্নাল কবির 'মনের মতো বই।' অ্যামিয়েল সাহেবের এই *Journal Intime* সম্পর্কে প্রথম জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, এই ডায়েরি নিয়মিত লেখা নয়। দীর্ঘ দিনের ব্যবধান আছে অনেক জায়গায়। এও দেখেছি যে, ছ-সাত মাস কিংবা তারও বেশি সময়ের ব্যবধান যেমন আছে, তেমনি কোনোদিন-বা বেলা দশটায় জার্নাল লেখা শেষ করে আবার বেলা এগারোটাতেই শুরু করেছেন জার্নাল। এ থেকে এটুকু স্পষ্ট যে, অ্যামিয়েল-এর কাছে তাঁর জার্নাল কখনোই বহিরঙ্গ জীবনের প্রতিদিনের স্থূল ঘটনা বা 'তথ্য ভরে রাখার ঝুলি' নয়, এর মধ্যে অ্যামিয়েল-এর অন্তরঙ্গ গূঢ় ব্যক্তিসত্তার উন্মোচন হয়েছে ধীরে ধীরে, তাঁর

মানসলোকের ছবি একটু একটু করে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। এই জার্নাল এমন একজনের রচনা, যাঁর কাছে কোনো ঘটনা বস্তু বা দৃশ্যের নিজস্ব মূল্য তেমন কিছু নেই, আসলে তাঁর কাছে 'every landscape is, as it were, a state of the soul... At bottom there is but one subject of study, the forms and metamorphosis of mind.'২ মনে রাখতে হবে এই অ্যামিয়েল, এই ধরণের মানসদৃষ্টিসম্পন্ন ডায়েরি-লেখক রবীন্দ্রনাথের একান্ত প্রিয়জন। তাঁর ডায়েরির নিন্দা বা বিরোধিতা করা দূরে থাক, বরং স্পষ্ট ভাষায় কবি বলছেন, এ তাঁর 'মনের মতো বই।' ইন্দিরা দেবীকে অ্যামিয়েল-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এ কথা লিখেছেন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ। এর আগে 'পঞ্চভূতে'—১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সম্ভবত, ডায়েরি রচনার স্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন কবি। আবার ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের দীর্ঘদিন পরেও 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' ইত্যাদিতে ডায়েরি রচনা সম্পর্কে প্রতিকূল মন্তব্য করেছেন। এসব কথা আগেই বলেছি, কিন্তু তা হলে সমগ্রভাবে ডায়েরি সম্পর্কে কবির মনোভাব কী? তার উত্তর এক কথায় এখনই দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা চলে কি যে, অ্যামিয়েল-এর জার্নালের মতো দিনলিপি, যেখানে বস্তু-জগৎকে অতিক্রম করে 'state of the soul'-ই মুখ্য হয়ে ফুটে ওঠে—সেরকম দিনলিপিই হয়তো কবির স্বভাবসংগত? জানি নে আলোচনার এই স্তরে সে কথা একেবারে নিশ্চিত করে বলা চলে কি না।

যাই হোক, ডায়েরি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কী ধরণের বা কতখানি প্রতিকূল ছিল, কেবল সে প্রসঙ্গই আমাদের কাছে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে যা কৌতূহলোদ্দীপক তা হল, রবীন্দ্রনাথ ডায়েরি রচনাকে নিজের 'স্বভাবসংগত নয়' বলে যেমন সে সম্পর্কে যথেষ্ট 'অনীহা' প্রকাশ করেছেন, তেমনি পক্ষান্তরে আবার 'ডায়ারি' রচনাও করে গেছেন। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' এবং 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' এ দুটি রচনাকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'ডায়ারি' শিরোনাম দিয়ে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে অর্থেই হোক-না, এদের 'ডায়ারি' বলে স্বীকার করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করিয়ে দিই, 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'তেই এক দিকে ডায়েরি রচনার বিরুদ্ধে মন্তব্য করছেন, অন্য দিকে আবার 'ডায়ারি' লিখছেনও। উল্লিখিত দুটি রচনার মধ্যে ডায়েরির যথার্থ লক্ষণ কতখানি কী আছে, সে প্রসঙ্গ আপাতত স্থগিত রাখছি। তবে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 'য়ুরোপ-যাত্রীর

ডায়ারি' লেখা হয় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে। আর 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' রচিত হয় ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে। দুটি ডায়েরির মধ্যে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের ব্যবধান। মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, এই সময়ের মধ্যে বা অন্য সময়ে আর কোনো ডায়েরি কবি লিখলেন না কেন? এ প্রশ্ন আদৌ উঠত না, যদি মনে করতে পারতাম, রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবেই 'ডায়ারি-বিরোধী'—জীবনে কখনো কোনো ডায়েরি লেখেন নি। কিন্তু দুখানা গ্রন্থ স্পষ্টই সে ধারণার অন্তত আংশিক বিরোধিতা করছে। এই দুখানা গ্রন্থ অন্তত প্রমাণ করছে যে তিনি ডায়েরি সম্পর্কে একেবারে নিস্পৃহ বা একান্ত বিরোধী নন। অনেক বিরোধিতা বা প্রতিকূলতা সত্বেও ডায়েরি-রচনায় তাঁর কোনোদিন কোনো আকর্ষণ ছিল না, এ কথা বলা নিশ্চয় সঙ্গত হবে না। পূর্বে উল্লিখিত অ্যামিয়েল সাহেবের জার্নাল সম্পর্কে কবির মনোভাবও এই ধারণারই পোষকতা করছে মনে হয়।

তা হলে প্রশ্ন এই, এই পরম অন্তর্মুখী গভীর চিন্তাশীল ও নিগূঢ় আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তি মাত্র দুখানি ছাডা আর কোনো 'ডাযারি' রচনায় প্রবৃত্ত হলেন না কেন? অন্তত অ্যামিযেল-এর মতো, অন্তরঙ্গ জীবনের গূঢ় চিন্তা-ভাবনা-অনুভূতির সহজ প্রকাশের জন্য, যে 'ডায়ারি'-ধরণের প্রকরণের প্রতি কবির শিল্পি-সত্তার প্রবণতা থাকা স্বাভাবিক মনে হয়, তার প্রকাশ তাঁর রচনায় কোথায় কতটুকু? সে কি কেবল ওই দুখানি মাত্র 'ডায়ারি'–চিহ্নিত গ্রন্থের মধ্যেই 'আংশিক' ভাবে প্রকাশিত?

আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হবে হযতো। কিন্তু বস্তুত তা নয়। আমাদের বিশ্বাস স্থূল তথ্যের আরো গভীরে প্রবেশ করলে দেখতে পাওয়া যাবে, আপাতবিরোধের অন্তরালে ডায়েরির 'প্রকরণে'র প্রতি এক গূঢ় আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের। প্রথম যৌবন থেকে শুরু করে জীবনের পর্বে পর্বে তাঁর নানা রচনায় ডায়েরির প্রকরণগত বা আন্তর লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। সে-সব রচনা বহিরঙ্গে কোনোটি বা ক্ষুদ্রকায় নিবন্ধ, কোনোটি বা চিঠি, আবার কয়েকটি হয়তো ভ্রমণকাহিনী। আর শুধু তাই নয়, উপন্যাসে প্রকরণগত স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিতেও ডায়েরির আঙ্গিক রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন একাধিক ক্ষেত্রে। এ থেকেও কবির মনের উপর ডায়েরির প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া যে বিরূপ ছিল না, তারও প্রমাণ হয়তো মিলবে।

৩

১৩০০ সালের ৩০শে আষাঢ় সাজাদপুর থেকে কবি ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : 'এক এক সময় মনে হয়—আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয়, যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়, সেগুলো ডায়ারি প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ করে রেখে দেওয়া ভালো, বোধহয় তাতে ফলও আছে, আনন্দও আছে।'৩

এ-সব কথা যে নিতান্ত কবিমনের অলস চিন্তা নয়, মনের নানা ভাবকে যে কবি ইতোমধ্যে গদ্যে নানা আকারে প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছেন—তার সাক্ষ্য-প্রমাণ দাখিল করা কিছু কঠিন নয়। যে সময় এই উক্তি করছেন, প্রায় ঠিক তখনই কবি 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' (১২৯৯-১৩০০) লিখছেন, সেখানে নানা ভাব ও ভাবনাকে কবিতার বদলে গদ্যে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু 'পঞ্চ-ভূতে'র আলোচনাগুলি একটু দীর্ঘ। ঠিক ডায়েরির প্রচলিত ধারণার অনুরূপ নয়। তা ছাড়া সেখানে নানা চরিত্রের মুখে সংলাপ রচনা করার ফলে ডায়েরির একান্ত ব্যক্তিগত রূপটি একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

কিন্তু 'পঞ্চভূত' লেখার অনেক আগে ১২৮৮ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ নানা ভাব ও ভাবনাকে অনেক সংক্ষিপ্ত আকারে ও অনেক বেশি ব্যক্তিগত ডায়েরির ভঙ্গিতে লিখতে শুরু করেন। এই ধরণের বেশ কিছু ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ ১২৮৮ ও ১২৮৯ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে এগুলি একসঙ্গে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে গ্রন্থাকারে বেরোয় ১২৯০ সালে। এরই কাছাকাছি সময়ে (১২৯২, জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র) এই ধরণের আরও কিছু ক্ষুদ্র 'প্রসঙ্গ' লেখেন। সেগুলি পরে 'নানা কথা' শিরোনামায় 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১২৯২ সালে আরও একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় : 'আলোচনা'।

এই-সব সঙ্কলনে যে-সব রচনা প্রকাশিত হয়েছে তাদের বেশির ভাগেরই একটি করে শিরোনাম আছে। কেবল 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্তর্গত 'নানা কথা' নামক চিন্তাসমষ্টির কোনোটির পৃথক্ কোনো নাম নেই। নাম থাক আর নাই থাক, এই-সব রচনার মধ্যে ডায়েরির 'মানসিকতা' বেশ অনুভব করা যায়। রচনাগুলি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ তো নয়ই, ঠিক 'রম্য'রচনাও নয়—একমাত্র সন-তারিখহীন ডায়েরির সঙ্গে এদের আকৃতি ও প্রকৃতি-গত সাদৃশ্য চোখে পড়ে। অ্যামিয়েল-এর জার্নালেও এই ধরণের চিন্তামূলক ক্ষুদ্র প্রসঙ্গের অজস্র নিদর্শন মেলে। সেখানে ব্যক্তিগত কথা বিশেষ নেই, সেগুলি কয়েকটি

তত্ত্বধর্মী ছোট ছোট অনুচ্ছেদের সমষ্টি। যেমন, ঈর্ষা; নারীর প্রেম ও দুঃখ-বরণ; জীবন ও আত্মা; মৃত্যু ইত্যাদি। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বা 'আলোচনা'র মধ্যেও অনুরূপ সব প্রসঙ্গের নাম পাওয়া যায়—আদর্শ প্রেম; জগতের জন্ম মৃত্যু; প্রকৃতিপুরুষ; পাপপুণ্য; বিস্মৃতি; মৃত্যু ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ-লিখিত এই ধরণের প্রসঙ্গের কোনো-কোনোটির আয়তন ডায়েরির প্রসঙ্গের মতই অতি ক্ষুদ্র—পাঁচ-ছয় বা আট-দশ লাইনের মত। অবশ্য অনেকগুলি এর চেয়ে কিছু দীর্ঘ। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র চিন্তাসমষ্টি যে কিছুটা ডায়েরি-ধর্মী, তার আভাস এই সঙ্কলনের শেষ রচনা 'সমাপন'-এ লেখক নিজেই দিয়েছেন: 'ইহা [বিবিধ প্রসঙ্গ] একটি মনের কিছুদিনকার ইতিহাস মাত্র। ...এই গ্রন্থে...অবিশ্রান্ত কার্য্যশীল পরিবর্ত্তমান মনের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে।' বস্তুত উৎকৃষ্ট ডায়েরিও তো 'একটি মনের কিছুদিনকার ইতিহাস'।

'আলোচনা' ও 'বিবিধ প্রসঙ্গ'কে আর-এক দিক থেকেও যথার্থভাবে 'কবি-মানসের কড়চা' বা ডায়েরি বলে অভিহিত করা চলে। কবি নিজেই বলেছেন: "যখন সন্ধ্যাসংগীত লিখিতেছিলাম তখন খণ্ড খণ্ড গদ্য 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে বাহির হইতেছিল। আর, প্রভাতসংগীত যখন লিখিতেছিলাম কিংবা তাহার কিছু পর হইতে ওইরূপ গদ্য লেখাগুলি 'আলোচনা' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া ছাপা হইয়াছিল। এই দুই গদ্যগ্রন্থে যে-প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই লেখকের চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয় না।"৪—এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বা 'আলোচনা' নিছক চিন্তাসমষ্টি বা ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সঙ্কলন নয়, কবিজীবনের এক বিশেষ পর্বের অন্তর্গূঢ় উপলব্ধিরই পরিচয়বাহী। ডায়েরি বা দিনলিপিতে যে-অর্থে কবি বা কথাশিল্পীর সৃষ্টির নেপথ্যলোকের নিভৃত পরিচয় থাকে, সেই অর্থে ওই দুটি গ্রন্থ ডায়েরির মর্মগত পরিচয় অবশ্যই অনেকাংশে বহন করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র একটি রচনার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করছি: 'অনেকের গরীব-মানুষি করিবার সামর্থ্য নাই। এত তাহাদের টাকা নাই যে, গরীব-মানুষি করিয়া উঠিতে পারে। আমার মনের এক সাধ আছে যে, এত বড় মানুষ হইতে পারি যে, অসঙ্কোচে গরীব-মানুষি করিয়া লইতে পারি! এখনো এত গরীব-মানুষ আছি যে গিল্টি-করা বোতাম পরিতে সাহস হইবে!...এখনো আমার রূপার এত অভাব যে অন্যের সম্মুখে রূপার থালায় ভাত না খাইলে লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয়। এখনো আমার

স্ত্রী কোথাও নিমন্ত্রণ খাইতে গেলে তাহার গায়ে আমার জমিদারীর অর্দ্ধেক আয় বাঁধিয়া দিতে হয়।'৫ বস্তুত এই-সব রচনাই সঠিক স্থান-সন-তারিখের দ্বারা চিহ্নিত ও আর একটু সজীব হলেই বোধহয় পূর্ণাঙ্গ ডায়েরির আকার গ্রহণ করত।

সন-তারিখের দ্বারা চিহ্নিত ও ডায়েরির মত প্রায় প্রতিদিন কিছু কিছু লেখা চিন্তাসমষ্টির নিদর্শন 'বিবিধ প্রসঙ্গ' প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের পরিবারের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের অনেকে 'পারিবারিক স্মৃতি' নামে একটি খাতায় নিজ নিজ মত ও মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতেন। প্রায় প্রতিদিনই এরকম লেখালেখি চলত। রবীন্দ্রনাথের হাতে তখন কোনো সাময়িকপত্র নেই, তাই আপন মনের অনেক ভাব ও ভাবনা এই খাতাকে আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছিল। এমনও দেখা গেছে যে প্রায় প্রতিদিনই, এমন-কি, দিনে দুবারও কবি কিছু কিছু মন্তব্য সেই খাতায় লিখে রাখছেন। 'পারিবারিক স্মৃতি'-তে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনার নাম ও সন-তারিখের উল্লেখ করছি :

ক. স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমের বিশেষত্ব। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৯৫
খ. আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিক অসামঞ্জস্য। ৬ অগ্রহায়ণ
গ. কবিতার উপাদান-রহস্য (mystery)। ৬ অগ্রহায়ণ
ঘ. সৌন্দর্য ও বল। ৭ অগ্রহায়ণ
ঙ. আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব। ৭ অগ্রহায়ণ
চ. ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি। ৮ অগ্রহায়ণ

ইত্যাদি।

প্রতিদিনের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনাকে এইভাবে সন-তারিখ-সহ লিপিবদ্ধ করে রাখার মধ্যে কবির ডায়েরি লেখার মনোভাব আংশিকভাবেও কি ফুটে ওঠে নি ?

রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতিহাসে 'সাধনা'র পর্ব (১২৯৮-১৩০২) সৃষ্টিবৈচিত্র্যে বিশেষ সমৃদ্ধ। কবিতা-গল্প-নাটক, বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ, সমালোচনা, ব্যঙ্গকৌতুক ইত্যাদি বিচিত্র রচনাসম্ভারে এই পর্ব পরিপূর্ণ। এই বিভিন্ন সাহিত্যশাখা যেন কবির শিল্পিসত্তার অসংখ্য দর্পণ। নিজের নিগূঢ় সত্তাকে ওই দর্পণের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অজস্রবার নিরীক্ষণ করেছেন কবি। সেই আত্মনিরীক্ষার

অবলম্বন হিসাবে, আত্মপ্রকাশের মাধ্যম রূপে এই পর্বে ডায়েরিকেও কবি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আশ্রয় করেছেন। এই পর্বে স্পষ্টরূপে 'ডায়ারি' নামে চিহ্নিত দুটি গ্রন্থ পাই—'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' ও 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' (পঞ্চভূত)। 'পঞ্চভূতে' ডায়েরি-লক্ষণ কতটুকু আছে বা নেই, সে সম্পর্কে আগেই কিছু বলেছি। এবারে আলোচ্য 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আড়াই-মাস-ব্যাপী রবীন্দ্রনাথের যে দ্বিতীয়বার য়ুরোপযাত্রা ও য়ুরোপপ্রবাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তা-ই ডায়েরি বা দিনলিপির আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এই ডায়েরি ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাস থেকে 'সাধনা'য় প্রকাশিত হতে শুরু করে। প্রত্যেক সংখ্যায় এই ডায়েরির খণ্ডাংশ এক-একটি পৃথক্ শিরোনামে অর্থাৎ একটি গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। 'সাধনা'য় প্রকাশিত রচনাটিকে তাই ঠিক যথার্থ ডায়েরির লক্ষণাক্রান্ত বলা চলে না। বরং সচেতনভাবে প্রকাশের জন্য রচিত একটি গ্রন্থ বলে মনে হয়। কিন্তু বস্তুত তা নয়। বিশ্বভারতী পত্রিকায় (১৩৫৬-৫৮) এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' অংশরূপে যে 'খসড়া'টি প্রথম মুদ্রিত হয় (পরে জন্ম-শতবার্ষিক-সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীতে মুদ্রিত) সেইটিই মূল ডায়েরি। রবীন্দ্র-নাথ সেটিকে অবিকল সেইরূপে 'সাধনা'য় কিংবা স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশ করেন নি। তার আগে 'প্রকাশযোগ্য যথেষ্ট রূপান্তর সমাধা' করেছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তার একান্ত সহজ স্বচ্ছন্দ ঘরোয়া রূপটি যে অবিন্যস্ত 'খসড়া'তেই সর্বাধিক পরিস্ফুট হয়েছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। 'খসড়া'টি দেখে মনে হয়, এটি রচনাকালে লেখকের মনে এর প্রকাশ সম্পর্কে কোনো বিশেষ আগ্রহ বা সচেতনতা ছিল না, তাই দেড় বছর পরে প্রকাশকালে এর যথেষ্ট 'সংশোধন' করতে হয়েছিল। এই অর্থে, অর্থাৎ রচনাকালে প্রকাশ-ভাবনার অভাবের দিক থেকে, এটি যে যথার্থ ডায়েরির লক্ষণাক্রান্ত তা বলা বাহুল্য। এই 'খসড়া' দিনলিপির সঙ্গে দশ বছর আগেকার বিবরণধর্মী 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র তুলনা করলে 'য়ুরোপ-যাত্রী'র 'ডায়ারি'–রূপের বিশিষ্টতা পাঠকের চোখে সহজেই প্রতীয়মান হবে। শেষোক্ত রচনার অকৃত্রিম সহজ ঘরোয়া রূপের মধ্যে দিনলিপি-রচয়িতার 'আত্মমগ্ন' 'ভাব'টি অনেকখানি ফুটে উঠেছে: 'আজ সকাল থেকে shopping। সজি আর ছোট বউয়ের জন্যে দুটো আয়না কিনেছি। সুরির জন্যে একটা ইলেকট্রিক-আলো-জ্বালা ঘড়ি কেনা গেল। কাল বাবির জন্যে একটা কিনলেই আমার

মন নিশ্চিন্ত হয়। সমস্ত দিন জিনিসপত্র কিনে একান্ত শ্রান্তভাবে সন্ধের সময় 'bus-এর মাথার উপরে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ি আসা গেল। ·· মনটা এমন শূন্য উদাস হযে আছে! ইচ্ছে করছে এই ঘুমোতে গিযে আর যদি ঘুম না ভাঙে তো বেশ হয—ঠিক বেশ হয় না, সকলকে একবার দেখতে এবং সকলের কাছে একবার মাপ চাইতে ইচ্ছে করে। ··এখানে রাত দুপুর, কলকাতায ছটা · '।৬ এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের মহত্তম কবিসত্তার গভীর পরিচয হয়তো ফুটে ওঠে নি, কিন্তু সংবেদনশীল এক শিল্পপ্রাণ মানুষের সহজ ব্যক্তিগত পরিচয অবশ্যই আছে। গৃহী রবীন্দ্রনাথের গৃহকাতর মনের চাঞ্চল্য ও বেদনা-প্রকাশের মধ্যে—যা এই দিনলিপির নানা স্থানে ছড়িযে আছে, এই সহজ ব্যক্তিগত রূপটি স্পষ্ট করে ধরা পড়ে। অন্তত এই অর্থে এই 'খসড়া' গ্রন্থটির ডাযেরি হিসাবে মূল্য উপেক্ষণীয নয।

'সাধনা'-পর্বের একটি লক্ষণীয বৈশিষ্ট্য এই যে, এই পর্বে কবি প্রায একই সঙ্গে খুব কাছাকাছি সমযের মধ্যে ডাযেরি-রচনা সম্পর্কে 'পঞ্চভূতে' প্রতিকূল মন্তব্য করছেন, আবার 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডাযারি' লিখছেন, অ্যামিযেল-এর জার্নাল সম্পর্কেও গভীর আগ্রহ প্রকাশ করছেন। আর শুধু তাই নয, এই পর্বেই রচিত হযেছে 'ছিন্নপত্র', যা বহিরঙ্গে পত্র হলেও যার সম্পর্কে 'রবীন্দ্র-জীবনী'-কার যথার্থ ই বলেছেন, 'দৈনিক কড়চা বা রোজনামচা বা ডাযেরি—পত্রাকারে লিখিত'। ডাযেরি হিসাবে 'ছিন্নপত্রে'র দাবি কতখানি, সে বিষযের আলোচনা আপাতত স্থগিত রাখলাম। এখন 'সাধনা' পর্ব ছাড়িযে আরো একটু সামনের দিকে এগোতে চাই।

রবীন্দ্রনাথের বিপুলাযত রচনাসম্ভারের এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে তাঁর ভ্রমণ-সাহিত্য। এদের মধ্যে অনেকগুলিই পত্রের আকারে লেখা। কিন্তু সবগুলি নয। এদের মধ্যে আছে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডাযারি', 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'। আর আছে 'জাপানযাত্রী' (১৯১৬) 'পারস্যে' (১৯৩২)। 'জাপানযাত্রী' সবুজপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয। এর মধ্যে ডাযেরির লক্ষণ যে দুর্লক্ষ্য নয, তা সবুজপত্র-সম্পাদককে লেখা কবির একটি চিঠিতে আভাসিত হয়েছে: 'আমার এ লেখা ধারাবাহিক চিঠিও না, প্রবন্ধও না। যা যখন মনে আসছে লিখে যাচ্ছি, একবার revise করবারও চেষ্টা করিনি। এর মধ্যে আমাদের যাত্রার ছবি কখন কতখানি পড়বে বলতে পারি নে—কতগুলি খাপছাড়া প্যারাগ্রাফের মত হবে। তাতে কি ক্ষতি আছে?'৭

আপন মনে ইচ্ছামত লিখে যাওয়ার এই যে অসতর্ক অসচেতন মানসিকতা —এটি বস্তুত একমাত্র ডায়েরি-লেখকেরই," আর কারো নয়। তা ছাড়া যা 'চিঠিও না, প্রবন্ধও না'' কেবল 'কতকগুলি খাপছাড়া প্যারাগ্রাফ'—তার সঙ্গে সহজেই ডায়েরির প্রকরণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, 'জাপানযাত্রী' ভ্রমণ-নিবন্ধ হলেও এর মধ্যে মাঝে মাঝে তারিখ দিয়ে সেই বিশেষ দিনের ঘটনার বিবরণ ও মনের অবস্থার কথা লেখার প্রয়াস আছে। 'জাপানযাত্রী'তে এরকম চারদিনের 'দিনলিপি' আছে। 'পারস্যে' নামক ভ্রমণ বৃত্তান্তে ডায়েরির পূর্বোক্ত বহিরঙ্গ লক্ষণটি আরো অনেক ব্যাপকভাবে চোখে পড়ে। অনেক তারিখ-চিহ্নিত ও তারিখ-না-দেওয়া 'দিনলিপি'র রচনাভঙ্গি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায সেখানে। বলা যেতে পারে, প্রায় সমগ্র 'পারস্যে' গ্রন্থটিই এই ডাযেরির ভঙ্গিতে লেখা।

রবীন্দ্রনাথের 'ডায়ারি' নামাঙ্কিত যে দু'টিমাত্র গ্রন্থ ('পঞ্চভূতে'র 'ডায়ারি' অভিধা কবি শেষ পর্যন্ত বর্জন করেছিলেন, এ কথা আগেই বলেছি), তার একটি 'য়ুরোপ-যাত্রী ডায়ারি', অন্যটি 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'। লক্ষ্য করার বিষয় দুটোই ভ্রমণবিষয়ক। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের আগে ইংরেজীতে যে-সব ডাযেরি লেখা হযেছে তার এক অংশ ভ্রমণবিষযক। যেমন, জেম্‌স বস্‌ওয়েলের 'জার্নাল অব্ এ ট্যুর টু দ্য হেব্রাইড্‌স' (১৭৫৯)। চার্লস ডারইনের বিখ্যাত বিশ্বপরিক্রমার অভিজ্ঞতাও ডায়েরি আকারে বিধৃত। বাংলা ভাষায় ভ্রমণ-ও প্রবাস-অভিজ্ঞতা-বিষয়ক ডায়েরি রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী হলেন 'ইংলণ্ডের ডায়েরী'-রচয়িতা শিবনাথ শাস্ত্রী। এবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসি। রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত দুটি ডায়েরিই ভ্রমণমূলক হলেও এদের রচনার মধ্যে, পূর্বেই উল্লেখ করেছি, প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের ব্যবধান। কালের এই বিপুল ব্যবধান দুই ডায়েরি-রচয়িতার সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন মানসিকতার পরিচয় বহন করে এনেছে। প্রথমটির মধ্যে লেখকের মনোভাব অপেক্ষাকৃত অনেক লঘু সহজ ও অবিন্যস্ত। তাঁর সেই পর্বের শিল্পসৃষ্টির অন্তর্নিহিত গূঢ় উৎসলোকের সন্ধান তেমন পাই নে। কিন্তু কবির তেষট্টি বছর বয়সে লেখা 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'র চেহারা এর থেকে প্রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'-রচয়িতা ছিলেন বিদেশে সম্পূর্ণ অখ্যাত, স্বদেশেও অনতি-পরিচিত। সে রচনার আশু মুদ্রণ-সম্ভাবনাও ছিল না। তাই সেখানে নিজের সম্পর্কে অনেকখানি অসচেতন এক সহজ স্বচ্ছন্দ মনের দেখা পাই। কিন্তু

'পশ্চিম-যাত্রী'র লেখক স্বদেশে বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববন্দিত মহাকবি। তাঁর 'ডায়ারি' যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হবে, সে সম্পর্কেও কবি নিশ্চয় অবহিত। তাই এখানে ডায়েরি-লেখকের কাছে প্রত্যাশিত নিভৃত আত্ম-উন্মোচন যথার্থভাবে পাই নে, এখানে লেখক যেন যথেষ্ট সচেতন। সেই সচেতনতা তাঁর শব্দ-প্রয়োগে, ভাষা-বিন্যাসের কারুকর্মে, ভাবের সুসংবদ্ধতায় ও মননধর্মী তত্ত্বনিষ্ঠায়।

কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও ডায়েরি হিসাবে 'পশ্চিম-যাত্রী'র নিঃসন্দেহে বিশিষ্টতা আছে। ভাষায় বা ভঙ্গীতে যে বুদ্ধিদীপ্ত সচেতনতার প্রকাশ দেখি, সে তো কেবল এই গ্রন্থেই নয়, এই পর্বের অর্থাৎ সবুজপত্র-উত্তর পর্বের প্রায় সমস্ত গদ্যরচনায় তা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই ভঙ্গী কৃত্রিম কিছু নয়, এটা কবির এই পর্বের স্বভাবসিদ্ধ রচনারীতি। আলোচ্য 'ডায়ারি'টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটি বিদেশ-ভ্রমণকালে রচিত হলেও কবির অন্যান্য ভ্রমণকথার মত এখানে পথের বা প্রবাসের বিবরণ তেমন মেলে না। কবি এখানে বাইরের জগৎ থেকে সরে এসে ডুব দিয়েছেন আপন হৃদয়ের গভীরে। ফলে এই গ্রন্থ বহির্বিশ্বের স্থূল ভ্রমণবৃত্তান্ত হয় নি, কবিচিত্তের এক অমূল্য দলিল হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, আঁদ্রে জিদের 'Voyage au Congo' পড়তে পড়তে জনৈক বিশিষ্ট পাঠকের৮ আবেগতপ্ত সোচ্ছ্বাস কণ্ঠস্বর—'And ...I am seized, not by Africa, but by this Gide''। 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'-পাঠকেরও প্রায় সেই একই অভিজ্ঞতা—পশ্চিম-যাত্রার বিবরণ নয়, পাঠকের সমগ্র চিত্ত অধিকার করে নেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। কবি এখানে যেন অনেকটা আত্মস্থ। তিনি নিজের মনের সঙ্গে আলাপে তন্ময়। পরিণত প্রজ্ঞা নিয়ে কবি এক দিকে যেমন রাজনীতি সমাজনীতি আর্ট সাহিত্য নর-নারীর প্রেমতত্ত্ব ইত্যাদি তত্ত্ব-ভাবনা করছেন, তেমনি অন্য দিকে জীবন-সায়াহ্নের ছায়ায় দাঁড়িয়ে প্রৌঢ় মনের নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বের গূঢ় অনুভবের মধ্যে আত্মনিমগ্ন হয়েছেন। আর আলোচ্য পর্বের এই গাঢ় গভীর অনুভব থেকেই জন্ম নিয়েছে এই সময়কার অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা। 'পূরবী'র 'পথিক'-অংশের অনেক কবিতার উৎস এই ডায়েরির অনেক ভাব ও ভাবনা। সাবিত্রী, লিপি, ক্ষণিকা, পূর্ণতা, আহ্বান ইত্যাদি অনেক কবিতার নাম করা চলে এ প্রসঙ্গে। দৃষ্টান্ত বিশদ না করে (বলা বাহুল্য, বর্তমান প্রবন্ধ সে উদ্দেশ্যে রচিতও নয়) পূরবী কাব্যের 'গ্রন্থপরিচয়ে' যা বলা হয়েছে তার অংশবিশেষ শুধু স্মরণীয়ঃ

"পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ও পূরবীর মুখ্য কবিতাগুলি (কালক্রম অনুসারে 'পথিক' অংশে সন্নিবিষ্ট) একই সময়ে লেখা এবং এরূপ বলিলে ভুল হইবে না যে, উভয় রচনাতে একই প্রকার মানসিক অবস্থার প্রতিফলন হইয়াছে।" আলোচ্য ডায়েরিতে কেবল কয়েকটি কবিতার উৎস ও 'উপকরণ' খুঁজে পাওয়া যায়, এটুকু বললেই যথেষ্ট হয় না। কবির মনে আপন গূঢ়তম সত্তার যথার্থ অন্তরঙ্গতম পরিচয় লাভের জন্য যে সমগ্র জীবনব্যাপী আত্মজিজ্ঞাসা ছিল, ডায়েরি-রচনার নিভৃত অবকাশে স্মৃতির পথ বেয়ে সেই জিজ্ঞাসা ও ভাবনা এক বিস্ময়কর বাণীরূপ লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবরের দিনলিপি বিশেষভাবে স্মরণীয়: "এমন সময় ষাটে পড়লুম। একদিন বিকেল বেলায় সামনের বাড়ির ছাতে দেখি, দশ-বারো বছরের একটি ছেলে খালি-গায়ে যা খুশি করে বেড়াচ্ছে।...হঠাৎ...একটা...কথা মনে উঠল যে, ওই ছেলেটা এই অপরাহ্ণের আকাশের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ মিশ খেয়ে গেছে।... আজ মনে হচ্ছে, ওই ছেলেটার কথা আমারই খুব ভিতরের কথা,...এখন ভাবনা ধরিয়ে দিলে, আমার আসল পরিচয় কোন্ দিকটায়। সেই আরম্ভ-বেলাকার সাতাশের দিকে, না, শেষ-বেলাকার?"‥ এই আত্মমগ্ন অন্তর্গূঢ়তার মধ্যেই ডায়েরির যথার্থ স্বরূপের প্রকাশ। আর অন্তত সেই অর্থে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' নিশ্চয় দিনলিপি হিসাবে ব্যর্থ সৃষ্টি নয়।

চিঠিপত্র রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশের অন্যতম মুখ্য বাহন। পত্রের মধ্যে সাধারণত আমরা খুঁজি সহজ ব্যক্তিমানুষটিকে। পরোক্ষভাবে আরো খুঁজি, যাঁকে উদ্দেশ্য করে পত্র লেখা, তাঁকেও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পত্রে এই শেষোক্ত ব্যক্তি অনেক সময়েই গৌণ, হয়তো বা প্রায় দুর্লক্ষ্য। এরকম যে ঘটে এর কারণ, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বভাব, তাঁর স্বধর্ম। আসলে আত্ম-সমীক্ষা ও আত্ম-উন্মোচনই ওই-সব পত্রে কবির অন্বিষ্ট। ব্যক্তিগতভাবে পত্রপ্রাপক সেখানে অনেকখানি অপ্রধান। কবিচিত্তের এরকম প্রবণতা চোখে পড়ে জীবনের শেষ পর্ব অবধি। হয়তো 'ভারহীন সহজের রস', কবি যাকে চিঠির যথার্থ রস বলেছেন, তখন ততটা নেই, তবু আত্মমগ্ন মনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির কথাই শেষ পর্বের পত্রগুচ্ছেও পাই। এর একটি দৃষ্টান্ত—'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৯২৬-১৯৩৮)। এই পত্রগুচ্ছে কবির মন যথেষ্ট সচেতন, ভঙ্গী অনেক ঘষামাজা, তবু তারই মধ্যে কোনো কোনো চিঠিতে দিনলিপির

অন্তরঙ্গ আত্মমগ্ন সুরটি স্পষ্ট। ৮ই এপ্রিল ১৯৩৫-এর চিঠিটি প্রসঙ্গত স্মরণীয়: 'মনে পড়ছে সেই শিলাইদহের কুঠির তেতলায় নিভৃত ঘরটি—আমের বোলের গন্ধ আসছে বাতাসে—পশ্চিমের মাঠ পেরিয়ে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে বালুচরের রেখা, আর গুণটানা মাস্তল।'—ইত্যাদি। সব মিলিয়ে এর ভিতরকার যে nostalgic অনুভূতির নিভৃতি, তা বিশেষভাবে দিনলিপির রস-সংবেদনকেই জাগিয়ে তোলে।

তা ছাড়া এই পর্বে তাঁর চিঠিগুলি যে যথার্থ চিঠি হচ্ছে না, তা তো কবি নিজেই বলেছেন, 'অল্প বয়সে আমি চিঠি লিখতে পারতুম, যা-তা নিয়ে। মনের সেই হালকা চাল অনেক দিন থেকে চলে গেছে—এখন মনের ভিতর দিকে তাকিয়ে বক্তব্য সংগ্রহ করে চলি। চিন্তা করতে করতে কথা কয়ে যাই—দাঁড় বেয়ে চলি নে, জাল ফেলে ধরি। উপরকার ঢেউয়ের সঙ্গে আমার কলমের গতির সামঞ্জস্য থাকে না। যাই হোক একে চিঠি বলে না।' [৪ শ্রাবণ, ১৩৩৬]

'একে' যদি যথার্থ 'চিঠি' না বলি, তবে কী বলব? এই পর্বের চিঠি 'ভারহীন' নয় বটে, তবে এদের অসহজ বা কৃত্রিম রচনা বলা চলে না নিশ্চয়। কবির মনের নিগূঢ় চিন্তার যেগুলি 'উপরকার ঢেউ' মাত্র নয়, তাদের অনিবার্য আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এই-সব পত্রাকার রচনায়। বস্তুত কবির শেষপর্বের এই ধরণের রচনায় চিঠির চেয়ে ডায়েরির অন্তর্নিহিত স্বভাবই বেশি প্রকাশ পেয়েছে।৯

অবশ্য 'ভারহীন সহজের রসে' সিক্ত চিঠি যে কত সার্থক ডায়েরি-ধর্মী রচনা হতে পারে তার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন 'ছিন্নপত্রাবলী'। পত্রগুলি ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৯৫-এর ডিসেম্বরের মধ্যে অর্থাৎ কবির ছাব্বিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সে লেখা। পত্রগুলি রচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় নি। দীর্ঘকাল পরে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আংশিক বর্জিত আকারে এগুলি গ্রন্থাকারে ('ছিন্নপত্র' নামে) মুদ্রিত হয়। অর্থাৎ এগুলির প্রকাশ-সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন না হয়েই তরুণ কবি আত্ম-উন্মোচনের গূঢ় প্রেরণায় এগুলি লিখেছিলেন। শুধু তাই নয়, যখন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তখন পত্রগুলি কাকে লেখা তা কোথাও জানানো হয় নি। অর্থাৎ সে ব্যাপারটি যেন অনেকখানি গৌণ। মুখ্যত এটি কবির অন্তরতম কবিসত্তার সহজ স্বতঃস্ফূর্ত উন্মোচন। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি জীবনের প্রথম পঁচিশ বছরের

স্মৃতিকথা বলেছেন, 'ছিন্নপত্রাবলী'তে তাঁর ঠিক পরবর্তী অধ্যায়ের শিল্পিসত্তার নিভৃত রহস্যরূপটি উদ্‌বোধিত করেছেন। আর এই দিক থেকে আমরা মনে করি 'ছিন্নপত্রাবলী'র খণ্ড খণ্ড পত্র মূলত 'ডায়ারি'-ধর্মী রচনা, পত্র-ধর্মী নয়। পত্রের যথার্থ লক্ষণ যে 'আলাপের দ্বৈতরূপ' তা এখানে সর্বত্র তেমন পরিস্ফুট নয়। বরং 'দ্বৈততা'র বহিরঙ্গ আবরণের নীচে দেখি, কবির নিঃসঙ্গ গূঢ় প্রত্যয় ও চেতনাগুলিই যেন আপনাকে নিঃশেষে প্রকাশের আনন্দে তন্ময়। 'ছিন্নপত্রাবলী'র অনেক চিঠি একাদিক্রমে পর পর কয়েকদিনের (যেমন, ১৭ থেকে ২০ অক্টোবর, ১৮৯৪ প্রত্যহ কিংবা ২৩ থেকে ২৮ অক্টোবর, ১৮৯৪ প্রত্যহ, ইত্যাদি)। অর্থাৎ যাঁকে লেখা হচ্ছে তাঁর কাছ থেকে উত্তরের প্রত্যাশা না রেখেই কবি চিঠি লিখে চলেছেন। এর অর্থ সহজেই অনুমেয়। আসলে চিঠি-লেখা এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কবি যেন 'দিনলিপি' লিখছেন। সৌন্দর্য-সম্ভোগ ও জীবন-উপলব্ধির রসে কানায় কানায় ভরে-ওঠা কবি-চিত্তের আত্ম-উন্মোচনের ব্যাকুলতাই এই সব 'ডায়ারি-ধর্মী চিঠি' লিখতে কবিকে প্রেরণা দিয়েছে। আর সেই একই প্রেরণাবেগে সৃষ্ট হয়েছে এই পর্বের অনেক রসোত্তীর্ণ কবিতা ও গল্প। তাদের উৎসমূলে কবির যে গূঢ় অভিজ্ঞতা ও অনুভব তাদের নিশ্চিত সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে এইসব পত্রের নানা অংশে। সেই অর্থে 'ছিন্নপত্রাবলী'কে নিছক ব্যক্তিগত পত্র হিসাবে গণ্য না ক'রে বলা উচিত, 'A writer's notebook' বা ভাষান্তরে 'লেখকের দিনলিপি'—যেখানে লেখকের ভাবীরচনার শস্যবীজ সঞ্চিত হয়ে থাকে।

কবি একটি পত্রে লিখেছেন: 'আমার অনেক সময় ইচ্ছা করে তোকে যে-সমস্ত চিঠি লিখেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আমার চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে আমার পুরাতন পরিচিত দৃশ্যগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাই। কত দিন কত মুহূর্তকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করছি, সেগুলো বোধ হয় তোর চিঠির বাক্সর মধ্যে ধরা আছে—আমার চোখে পড়লেই আবার সেই-সমস্ত দিন আমাকে ঘিরে দাঁড়াবে। ওর মধ্যে যা-কিছু আমার ব্যক্তিগত জীবন-সংক্রান্ত সেটা তেমন বহুমূল্য নয়—কিন্তু যেটাকে আমি বাইরের থেকে সঞ্চয় করে এনেছি, যেটা এক-একটা দুর্লভ সৌন্দর্য, দুর্মূল্য সম্ভোগের সামগ্রী, যেগুলো আমার জীবনের অসামান্য উপার্জন—যা হয়তো আমি ছাড়া আর কেউ দেখে নি, যা কেবল আমার সেই চিঠির পাতার মধ্যে রয়েছে, জগতের আর

কোথাও নেই—তার মর্যাদা আমি যেমন বুঝব এমন বোধ হয় আর কেউ বুঝবে না। আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো দিস···আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্যসম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুকে নেব।·· আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিনরাত্রিগুলি এ রকম করে গাঁথা নেই।'১০

এই প্রাসঙ্গিক অংশ থেকেই 'ছিন্নপত্রাবলী'র ডায়েরি-ধর্ম সম্পর্কে কবির পরোক্ষ স্বীকৃতি যেন পাওয়া যায়। এখানে যে সুরটি ফুটে উঠেছে সেটি ব্যাকুল কবিহৃদয়ের একান্ত 'অন্তরঙ্গ' ও ব্যক্তিগত সুর। আর ডায়েরির যথার্থ সার্থকতা তো এই সুরের উপলব্ধি ও আস্বাদের মধ্যেই, এই নিভৃত আত্মনিমগ্ন সত্তার উন্মোচনে, সচেতন মননের প্রহরামুক্ত হৃদয়ের চিত্রাঙ্কনে।

৪

সারা জীবনে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখায় ডায়েরি-রচনার অন্তর্নিহিত মানসিকতা ও ডায়েরির আঙ্গিক-প্রকরণের নানা লক্ষণ—যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রূপে ফুটে উঠেছে—সে সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করলাম। কিন্তু এ-সমস্ত রচনাই সরাসরি ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের লেখা। লেখক ও পাঠকের মধ্যে এখানে কোন আড়াল নেই। শুধু তাই নয়, এগুলিকে প্রচলিত অর্থে খাঁটি কল্পনাসৃষ্ট 'ক্রিয়েটিভ' রসসাহিত্যের পর্যায়ে বোধ হয় ঠিক ফেলা চলে না। অর্থাৎ এগুলি কবিতা নাটক বা কথাসাহিত্য নয়। এগুলি হয় চিঠিপত্র নয় ভ্রমণকথা, নয়তো বা ক্ষুদ্র নিবন্ধ ইত্যাদি। কিন্তু এই বিশেষ আঙ্গিকটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে আপাত-বিরোধিতার নেপথ্যে এমন আকর্ষণ ছিল যে 'ক্রিয়েটিভ' রচনার ক্ষেত্রেও তিনি এই প্রকরণ প্রয়োগের ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছিলেন। আধুনিক মনন-ধর্মী ব্যক্তিত্ব-সচেতন নরনারীর জটিল হৃদয়রহস্যের উন্মোচনে একালের ঔপন্যাসিকেরা যে-সব বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন, ডায়েরির মাধ্যম তাঁদের অন্যতম। সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের এমন বাস্তবনিষ্ঠ বিশ্বাসযোগ্য পন্থা বা উপকরণ কথাসাহিত্যে খুব সুলভ নয়। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসে এই প্রকরণের ব্যবহারের দিক থেকে হাক্‌সলির *Point Counter Point* কিংবা জিদ-এর *La Porte e'troite (Strait is the Gate)* ও *Les faux monnayeurs (The Counterfeiters)* ইত্যাদির নাম স্মরণীয়। ইংরেজ লেখকদের মধ্যে উনিশ

শতকের ঔপন্যাসিক উইলকি কলিন্সের উপন্যাস *The Woman in White*-এ আত্মকথার আঙ্গিক প্রথম প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সেই আঙ্গিক সেখানে আত্মচরিত্র-উন্মোচনের চেয়ে আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ ঘটনা-বিন্যাসের কাজে বেশি প্রযুক্ত। এই গ্রন্থের অনুসরণে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসে যে 'আত্মকথা'র আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়েছে, তা ঠিক 'ডায়ারি' ধরণের নয়। অবিশ্বাস্য অপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ ও একটানা আখ্যান-বিবৃতির ফলে এই প্রকরণ সেখানে কখনোই আধুনিক নরনারীর মনস্তত্ত্ব-উদ্ঘাটনের উপযোগী হয়ে ওঠে নি।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ এই বিশিষ্ট আঙ্গিকটিকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রযোগ করেন। লক্ষ্য করার বিষয়, সবুজপত্র-পর্বে যখন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিতে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা নবপর্যায়ের সূচনা হয়েছে, সেই পর্বের একেবারে গোড়ায় পরপর রচিত দুটি উপন্যাসেই এই আঙ্গিক প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ একালে উপন্যাসের মাধ্যমে মানবমনের স্বরূপ উদ্ঘাটনে এই বিশেষ আঙ্গিকটির গুরুত্ব ও সম্ভাবনা সম্পর্কে কবি যে যথেষ্ট সচেতন তা সহজেই অনুমান করা চলে।

'চতুরঙ্গে' ডায়েরির প্রয়োগ নিতান্ত আংশিক হলেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। উপন্যাসটি শ্রীবিলাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত। শ্রীবিলাসই সব ঘটনা ও চরিত্রকে উপস্থাপিত করেছে, সব কিছুকে সাধ্যমত ও সুযোগমত বিশ্লেষণও করেছে সে। কিন্তু এরই মধ্যে শ্রীবিলাস শচীশের ডায়েরির উল্লেখ করেছে দু'জায়গায় —'শচীশ' অংশের ষষ্ঠ ও দশম পরিচ্ছেদে। বস্তুত এই দুটি অংশে শচীশের অন্তর্লোকের অতল গভীরের সংবাদ শ্রীবিলাসের পক্ষে জানা বা জানানো সম্ভব নয়; আর তাই সঙ্গত বা স্বাভাবিকও নয়। আর সেই কারণেই এখানে শচীশের ডায়েরির সাহায্যে সেই অন্তর্লোকের খবর দিতে চেয়েছে শ্রীবিলাস। প্রথম (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে) ডায়েরিতে দামিনীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর দামিনী সম্পর্কে শচীশের মনোভাবের ছবিটি ফুটে উঠেছে। শচীশের জীবনে যে দুটি নারী গভীর ছাপ রেখে গেছে, তাদের একজন ননীবালা। অন্যজন দামিনী। শচীশ এখানে সেই ননীবালার মৃত্যুর পটে দামিনীর তীব্র জীবন-পিপাসার রূপটি উপলব্ধি করেছে।—'দামিনীর মধ্যে নারীর আর-এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক।' মনে রাখতে হ'বে, দামিনীর এই প্রগাঢ় জীবনতৃষ্ণার বহ্নিময় স্পর্শে শচীশের

জীবনও জলে উঠেছিল তীব্র পিপাসা নিয়ে। শচীশের জীবনের সেই পর্বের বাস্তব ভিত্তি রচনায় এই ডায়েরির গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

'শচীশ' অংশের দশম পরিচ্ছেদের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ গুহাদৃশ্যটিও কথক (narrator) শ্রীবিলাসের দৃষ্টিকোণ থেকে সরাসরি উপস্থাপিত না হয়ে শচীশের ডায়েরি-আকারে বিবৃত হয়েছে। শচীশের মত নিঃসঙ্গ অন্তর্মুখী মানুষের এক বিচিত্র গোপন অভিজ্ঞতা-বর্ণনায় ওই দৃশ্যে ডায়েরির মাধ্যম একেবারে অপরিহার্য মনে হয়।

—'মনে হইল, সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোনো দিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা, এ আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে এবং ক্ষয় করিয়া ফেলিবে।'

একদিকে জৈব ক্ষুধায় অধীর দামিনীর প্রচণ্ড কামনা, অন্যদিকে শচীশের অবচেতনায় নিগূঢ় দেহতৃষ্ণা—এই দুয়ের গভীর অর্থবহ প্রতীকী চিত্র হিসাবে এই ডায়েরির ভূমিকা আলোচ্য উপন্যাসে একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ, সন্দেহ নেই। ওই অংশে এই বিশেষ আঙ্গিকের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের অভ্রান্ত শিল্পদৃষ্টির নিশ্চিত সাক্ষ্য বহন করে।

সম্ভবত 'চতুরঙ্গে' ডায়েরির আংশিক প্রয়োগ সাফল্যলাভ করাতেই রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী উপন্যাসটি ('ঘরে-বাইরে') পুরোপুরি ডায়েরির আঙ্গিকে লেখার পরিকল্পনা করেন। এই উপন্যাসের বিমলা নিখিলেশ ও সন্দীপের 'কথার' (সংখ্যায় মোট আঠারোটি) অনেকগুলিই বেশ একটু দীর্ঘ হলেও, আসলে এগুলি এদের 'দিনলিপি'রই নামান্তর। এই কথা যে বস্তুত তাদের ডায়েরিই, ডায়েরির মতই এগুলি তারা লিখে রেখেছিল, তার আভাস গ্রন্থের মধ্যে একাধিক স্থানে ছড়িয়ে আছে। দু'একটি দৃষ্টান্ত দিই :

১। বিমলার কথা : 'আজকের কথাবার্তাগুলো ঘরে ফিরে এসেই আমি নোট করে নিয়েছি' (পঃ বঙ্গ সরকার রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৫)।

২। সন্দীপের কথা : (ক) 'এই পর্যন্ত লিখেছি, এগুলো আমার খাসের কথা। এ-সব কথা আমার অবকাশের সময় আরও ফুটিয়ে তোলা যাবে।' (তদেব, পৃঃ ৪৮৯)।

(খ) 'খুব কড়া কথা এই ডায়ারিতে লিখতে বসেছিলুম।' (তদেব, পৃঃ ৪৯০)।

এছাড়া মাঝে মাঝে ডায়েরি লেখায় ছেদ পড়েছে কোনো আকস্মিক ঘটনার উদ্ভবের ফলে। তারপর সেই ঘটনা শেষ হলে, তার বিবরণ দিয়ে আবার ডায়েরি শুরু হয়েছে। এই ধরণের তাৎক্ষণিক ও খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার নিদর্শন—যা ডায়েরির অন্যতম লক্ষণ, 'ঘরে-বাইরে'র নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে। একটি দৃষ্টান্ত : সন্দীপ একজায়গায় লিখছে, 'এখন অবকাশ নেই। এখানকার নায়েব খবর পাঠিয়েছে, এখনই একবার তার কাছে যাওয়া চাই ; শুনছি একটা গোলমাল বেধেছে (তদেব, পৃঃ ৪৮৯)।

এরপর কিছুটা অলিখিত অংশ, তারপর আবার কথা শুরু। যে গোলমালের কথা সে শুনে এল, সে সম্পর্কে এবার লিখছে—অর্থাৎ ডায়েরির আঙ্গিক এখানে প্রযুক্ত, ঘটনার তাৎক্ষণিক বিবৃতি-দান !

অবশ্য বলা বাহুল্য যে, এইসব তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা ও অনুভব সাধারণ ব্যক্তিগত ডায়েরির উপাদানের মতো অবিন্যস্ত ও উদ্দেশ্যহীন নয়। সমস্তই সুনির্বাচিত এবং একটি সমগ্রতার সূত্রে বিধৃত ও বিন্যস্ত। এর ফলে কাহিনীর আদি-মধ্য-অন্ত্য ভাগ পরিস্ফুট। শুধু তাই নয়, উপন্যাসটির প্রথম ও শেষ ডায়েরি বিমলার, এটিও লক্ষণীয়। এর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটির আপাত বিশৃঙ্খলার মধ্যে এক ধরণের গঠনগত ঐক্য বা Structural Unity সৃষ্টি করতে চেয়েছেন বলেও মনে হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও কাহিনী সম্পর্কে উপন্যাসটিতে এ ধরণের সচেতন বিন্যাস-প্রবণতা কৃত্রিম মনে হয় না। কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির ডায়েরির মধ্য দিয়ে কাহিনীর চেয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রেক্ষণ বিন্দু বা Point of view-এর প্রভেদটুকুই বেশি প্রাধান্য পাওয়ায় ডায়েরির উদ্দেশ্য অনেকটাই সিদ্ধ হয়েছে।

তবু যেন মনে হয়, 'ঘরে-বাইরে'র 'ফর্ম' খাঁটি ডায়েরির লক্ষণাক্রান্ত নয়। ডায়েরির লেখাগুলি আরো খণ্ডিত, আরো টুক্‌রো-টুক্‌রো হয়। অন্তত সেটাই প্রত্যাশিত। (প্রসঙ্গত স্মরণীয় আঁদ্রে জিদ-এর পূর্বোক্ত 'Strait is the Gate' উপন্যাসের ডায়েরি-অংশগুলি।) কিন্তু 'ঘরে-বাইরে'তে তার বদলে দেখি সুদীর্ঘ স্মৃতিচারণ, যার কোনো কোনোটির দৈর্ঘ্য কুড়ি পৃষ্ঠা কিংবা তার কাছাকাছি।

কিন্তু তবু একটু আগেকার আলোচনা থেকে নিশ্চয় এটুকু বলা চলে যে, 'ঘরে-বাইরে' ডায়েরির আঙ্গিক-প্রকরণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর আগ্রহের একটি সুনিশ্চিত প্রমাণ।

এতক্ষণ ধরে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের বিভিন্ন রচনা সম্পর্কে পর্যালোচনা করেও আমাদের বক্তব্যকে হয়তো কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্তে বা সুনির্দিষ্ট মূল্যায়নে পৌঁছে দিতে পারি নি। বস্তুত কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য বর্তমান নিবন্ধ রচিতও নয়। শিল্পি-ব্যক্তিত্বের নানা গুহাহিত গোপন তথ্য-নির্দেশের কাজে ডায়েরি অনেক সময় একটি মূল্যবান ভূমিকা নেয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর দিনলিপির সে ধরণের গুরুত্ব হয়তো খুব বেশি নেই। (সে রকম 'গুরুত্ব' আরোপের চেষ্টাও আমরা করি নি।) দিনলিপিকে আশ্রয় করে আমরা শুধু একটি বিশেষ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র পথবাহী শিল্পিব্যক্তিত্বের ওপর আলোকসম্পাত করতে চেয়েছি। সেই আলোকসম্পাতের দ্বারা শিল্পি-স্বভাবের কোনো নতুন পরিচয় হয়তো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে না, তবে সেই স্বভাবের 'আপাত-বিরোধী জটিলতা' সম্পর্কে কিছু আভাস—সব মিলিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল হয়তো উদ্রিক্ত হতে পারে।

রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে সেই 'জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল' নিশ্চয় একেবারে অর্থহীন নয়।

উল্লেখপঞ্জী

১। ডায়েরির এই বিশিষ্ট রূপ সম্পর্কে আঁদ্রে মরোয়ে-ও (Andre Maurois) বলেছেন :

"The intimate diary, in which the writer is concerned to set down his thoughts and moods is a species apart" (Cassell's Encyclopaedia of Literature. Vol. I). এই ধরণের ডায়েরি রচয়িতা-দের মধ্যে অ্যামিয়েল, হেডন, ক্যাথারিন ম্যান্সফিল্ড, জিদ্, বদলেয়ার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মরোয়ে-র মতে ওঁদের ডায়েরিতে, "the reader can trace the development of a consciousness."

২। হামফ্রি ওয়াড´-কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত Journal Intime থেকে উদ্‌ধৃত।

৩। ছিন্নপত্রাবলী, ১০৭ সংখ্যক পত্র।

৪। জীবনস্মৃতি, 'প্রভাতসংগীত' অংশ।

৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫।

৬। য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি, রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, পৃঃ ১৭৭-৭৮

৭। চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২১৩-১৪।

৮। প্রখ্যাত ফরাসী লেখক ফ্রাঁসোয়া ম্যরিয়াক।

৯। চিঠিপত্রের মধ্যে অনেক সময়ে যে ডায়েরি-ধর্ম নিহিত থাকে সে সম্পর্কে আঁদ্রে মরোয়ে'র স্বীকৃতিসূচক আর একটি উক্তি :

"Sometimes the writing of letters has the character of an intimate diary, as with Balzac's series 'a´ I´ E´ trange´re'."—Cassell's Encyclopaedia of Literature, Vol. I.

১০। ছিন্নপত্রাবলী, ১১ই মার্চ, ১৮৯৫ তারিখের চিঠি।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস : প্রকরণের আলোকে

বিশেষ দেশ-কালের দ্বারা সীমিত সামাজিক সমস্যা বা জীবন-ভাবনাকেই বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করেন যে ঔপন্যাসিক, তাঁর উপন্যাসের বিষয়গত আবেদন যদি দিনে দিনে তীব্রতা হারায়, তবে সেটা অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয় ; সময়ের নির্মম হাত উপন্যাসে বিন্যস্ত বিগত্ দিনের এমন অনেক তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল ও জটিল সমস্যাকে একটু একটু করে ধূসর ও জীর্ণ করে ফেলে।

শরৎচন্দ্রের কাল আমাদের চেয়ে খুব একটা দূরের নয়। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের জগতে প্রবেশ করলে আজ যেন দেখতে পাই ওই সব কাহিনীর দেশ-কালের প্রচ্ছদের উপর সময়ের দীর্ঘ ছায়া। ওই সব উপন্যাসের অনেক জটিল জীবন-ভাবনা, অনেক সামাজিক সমস্যা কিংবা পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য, যা একদিন একান্ত বাস্তব ছিল, তা' একালের পাঠকের চোখে যেন আর তেমন জ্বলন্ত প্রত্যক্ষ সত্য নয়। ইদানীংকালে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসকে নিছক সমস্যা বা বিষয়ের দর্পণে দেখলে হয়তো কিছুটা অস্বচ্ছ ও ধূসর মনে হতে পারে, মনে হতে পারে কতকটা বিগত দিনের অনুজ্জ্বল শিল্পসামগ্রী ব'লে।

কিন্তু কেবল 'কণ্টেণ্টে'র দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে যদি 'ফর্মে'র দিক্ থেকে দেখি, তাহলে স্পষ্টতই মনে হবে যে, উপন্যাসের যে 'ফর্ম' বা অবয়ব গত ঔজ্জ্বল্য ও স্বাতন্ত্র্য তা' এত সহজে এত দ্রুত মলিন বা জীর্ণ হবার নয়। উপন্যাসের কাহিনী যে বিশেষ-ভঙ্গীতে শিল্পে সমর্পিত হয়েছে, সেই প্রযুক্তিগত রীতি বা কৌশলের মধ্যে যদি কোন বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে তা' পরিবর্তমান সামাজিক সমস্যার মতো সময়ের খরস্রোতে সহজে ভেসে যায় না। এর ফলে কোন উপন্যাসের 'কণ্টেণ্টের' আবেদন উত্তরকালের পাঠকের কাছে অনেকটা শিথিল হয়ে এলেও, তার প্রকরণ বা শিল্পরীতির মধ্যে যে দেশকালাতিশায়ী নিত্যতার সম্ভাবনা থাকে, তা' অবশ্যই ওই শিল্পসৃষ্টিকে সুদীর্ঘজীবী করবে।

কিন্তু প্রসঙ্গত এই প্রশ্নও তো মনে জাগে যে, কোন উপন্যাসের বিষয় থেকে প্রকরণকে কি এভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে, না, দেখা সঙ্গত ?

লাবক (Lubbock) উপন্যাসকে যে 'Comprehensive art' বলে অভিহিত করেছেন, তাঁর সেই অভিধার মধ্যে এই শিল্পের বিষয় ও প্রকরণ-সংযোগে নির্মিত সামগ্রিক রূপের পরিচয়টি নিহিত আছে। এ কথার যাথার্থ্য মেনে নিয়েও সবিনয়ে বলবো যে, 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য' যে-ভাব ও যে-রূপের মিলিত সৌন্দর্য, তাকে বুঝতে গেলে শিল্পরূপকে কিছুটা স্বতন্ত্রভাবে দেখারও প্রয়োজন আছে। সেই সমীক্ষা প্রসঙ্গে বিষয় বা 'কণ্টেণ্টে'র কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, বরং বলা চলে, বিষয়কেই যথার্থ তাৎপর্যে ও পরিপেক্ষিতে, এক কথায় তার সমগ্রতায় বুঝতে গেলে তার রূপায়ণের রীতি-পদ্ধতিকে সুস্পষ্টভাবে জানতেই হবে। হেনরী জেম্‌স একথা মনে রেখেই খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন, **'Form alone takes and holds and preserves substance.'**

এবার ফিরে আসি আমাদের মূল প্রসঙ্গে: শরৎচন্দ্র ও তাঁর উপন্যাসের প্রকরণ-চিন্তায়। আমাদের বক্তব্য—শরৎচন্দ্রের উপন্যাসকে কেবল বিষয়বস্তুর দর্পণে না দেখে, প্রকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখারও এক বিশেষ প্রয়োজন আছে। এর ফলে তাঁর উপন্যাসগুলি হয়তো এমন এক নূতন মাত্রা বা **Dimension** লাভ করবে, যার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের এক তাৎপর্য-পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটিত হতে পারে। একথা মনে রেখে বর্তমান নিবন্ধের সীমিত পরিসরে আমরা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রকরণ-সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ দিক্ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করার আগে একটি বিষয়ে প্রথমেই অবহিত হওয়া প্রয়োজন। শরৎচন্দ্র সারা জীবনে আখ্যায়িকা-ধর্মী অনেক কিছু লিখেছেন, কিন্তু তার সব কটিই উপন্যাস নয়। তাঁর কিছু রচনা আছে, যাদের গল্প কিংবা বড় গল্প বলা চলে। বস্তুত শরৎচন্দ্রের প্রতিভা খাঁটি ছোটগল্প লেখার প্রতিভা নয়। তিনি নিজেই একবার বলেছিলেন:

"আমার ছোটগল্পগুলো কেমন যেন বড় হইয়া পড়ে, এটা ভারী অসুবিধার কথা। আরো এই যে, আমি একটা উদ্দেশ্য লইয়াই গল্প লিখি, সেটা পরিস্ফুট না হওয়া পর্যন্ত ছাড়িতে পারি না।" [ফণীন্দ্রনাথ পালকে লেখা পত্র: ১৪. ৯. ১৯১৩]—অর্থাৎ শরৎচন্দ্র যখনই ছোটগল্প লিখতে গেছেন,—(যেমন বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, পথনির্দেশ ইত্যাদি) তখন প্রায়শই সে গল্পে উপন্যাসের বিস্তারের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আবার অন্যদিকে তাঁর

অনেক তথাকথিত উপন্যাস আসলে বড় আয়তনের গল্প ছাড়া আর কি? দৃষ্টান্ত হিসাবে মনে পড়ছে বড়দিদি, স্বামী, নিষ্কৃতি, অরক্ষণীয়া, নববিধান ইত্যাদির কথা। এগুলিতে ঠিক উপন্যাসের উপযুক্ত বিস্তার নেই, কাহিনী চরিত্র বা পরিবেশ, সবকিছুর বিকাশের সম্ভাবনাই সেখানে সঙ্কুচিত। তাই বর্তমান নিবন্ধের সীমিত সমীক্ষায় আমাদের দৃষ্টি মুখ্যত নিবদ্ধ থাকবে অপেক্ষাকৃত বড় আয়তনের উপন্যাসগুলির প্রতি, যেখানে উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব গড়ে তোলার পরিপূর্ণ অবকাশ পেয়েছেন লেখক। প্রধানত সেগুলির প্রাসঙ্গিক আলোচনার মধ্য দিয়েই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রকরণ-বৈশিষ্ট্য বিষয়ে একটা ধারণা হতে পারবে বলে মনে করি।

২

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রকরণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করার আগেই মনে রাখা দরকার যে, নানান্ সময়ে নানা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র নিজেই উপন্যাসের প্রকরণ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করে গেছেন। অবশ্য তার বেশির ভাগই নিজের লেখা উপন্যাসের অনুষঙ্গে। কিন্তু তাহলেও এগুলিকে নিছক বিক্ষিপ্ত অসংলগ্ন কয়েকটি মন্তব্যমাত্র মনে করা ঠিক হবে না। বস্তুত এগুলি শরৎচন্দ্রের সামগ্রিক শিল্প-প্রত্যয়ের অচ্ছেদ্য অংশ—যে প্রত্যয় এসেছে দীর্ঘ দিনের উপন্যাস রচনার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, কোন পুথিগত বিদ্যার ফল হিসাবে নয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-প্রকরণের আলোচনার ভিত্তি হিসাবে এইসব মন্তব্যের মূল্য অবশ্য-স্বীকার্য।

বাংলা ১৩৩৩ সনের ৬ই ফাল্গুন শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লেখা এক পত্রে উপন্যাস-রচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন: "রচনার যে শিল্প বল, কৌশল বল, টেকনিক বল…এই বস্তুটা যা আছে তা আর একটুখানি যত্ন নিয়ে তোমাকে আয়ত্ত করতে হবে। কেবল লেখাই ত নয় ভাই, না-লেখা বিদ্যেটাও যে শিখতে হয়। তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয় যে কথা শতমুখে বলতে চায়, তা-ই শান্ত সংযত হয়ে একটুখানি গভীর ইঙ্গিতে সম্পূর্ণ হয়ে আসে।"

এর অন্তত দশ বছর আগে অপর একজনকে চিঠিতে লিখছেন: "যাহারা লিখিতে জানে না…মনে করে সব কথাই বুঝি বলা চাই-ই।…কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে-ই শেষে টের পায়, না তা' নয়।…বলা বা আঁকার চেয়ে

না-বলা না-আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম, অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।" [হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা পত্র]

এ ধরণের উক্তি কেবল দু-একটি ক্ষেত্রেই নয়, নানা সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে শরৎচন্দ্র এ রকম মন্তব্য করেছেন। এ থেকে, প্রথমত, শিল্প-প্রকরণ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বিশেষ সচেতনতার নিশ্চিত প্রমাণ মেলে। দ্বিতীয়ত, উপন্যাসের অবয়ব-নির্মাণে সংহতি ও সংযমবোধের আত্যন্তিক প্রয়োজন সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের যে গভীর প্রত্যয় ছিল, সে বিষয়ে আমরা অবহিত হই। এখানে শরৎচন্দ্র একটি কথা বলেছেন, যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঔপন্যাসিক তাঁর শিল্পি-জীবনের গোড়াতেই শিল্প-রচনার সংযমবোধ সম্পর্কে অবহিত থাকেন না। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সেই 'বোধ' জন্মায়। বস্তুত শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনেও কতকটা তাই ঘটেছে। আর এর জন্য উত্তরকালে তাঁর লজ্জা ও সঙ্কোচের অন্ত ছিল না। অল্প বয়সে লেখা দেবদাস, চন্দ্রনাথ, এমনকি চরিত্রহীনের অংশ-বিশেষের আতিশয্য, অতিকথন, অসংযম ইত্যাদি ত্রুটির জন্য পরিণত বয়সে তাঁর যে লজ্জা [দ্রষ্টব্য :—শরৎচন্দ্র (৩য় খণ্ড—পত্রাবলী) গোপালচন্দ্র রায়, পৃঃ ৫০, ৬২, ৩১২।] তা অনেকাংশেই উক্ত উপন্যাসগুলির দুর্বল ত্রুটিপূর্ণ 'ফর্মে'র জন্যই লজ্জা। যতই দিন গেছে, যতই পরিণতি এসেছে, ততই শরৎচন্দ্র উপন্যাসের প্রকরণ সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। আগের উপন্যাসগুলির দুর্বল প্রকরণকে সাধ্যমত সবল করে তুলতে একদিকে সচেষ্ট হয়েছেন, অন্য-দিকে ক্রমেই অপেক্ষাকৃত সুগঠিত নিটোল এক উপন্যাস-শরীর গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। শরৎ-সাহিত্যের জিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রেই জানেন যে, তাঁর জীবনের প্রথম পর্বে তাঁর শিল্পিচরিত্রের ওপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ছিল অপরিমেয়। বস্তুত শরচন্দ্রের কৈশোর ও প্রথম যৌবন বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়াতলে আচ্ছন্ন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পরিণত বয়সে শরৎচন্দ্র বলেছেন : "পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়। লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।"

বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের যে অমোঘ প্রভাবের কথা শরৎচন্দ্র এখানে বলেছেন, তা কেবল বিষয়বস্তু বা জীবনদৃষ্টির মধ্যেই সীমিত থাকে নি, তা

অবশ্যই উপন্যাসের প্রকরণের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছিল। কারণ এছাড়া বোধ হয় কোন দ্বিতীয় পথও ছিল না। শরৎচন্দ্র ভাগলপুর অবস্থানকালে উনিশ শতকের একেবারে শেষে (১৯০১ খৃষ্টাব্দের আগেই) যখন বড়দিদি, দেবদাস, চন্দ্রনাথ ইত্যাদি লিখছেন, তখন, সেই বঙ্কিম-প্রভাবিত যুগে, বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা আচ্ছন্ন এক তরুণ লেখকের পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের আঙ্গিক প্রকরণকে সম্পূর্ণ বর্জন করে উপন্যাস লেখা বোধ হয় একরকম অসম্ভব ছিল। অবশ্য সেই অনুকরণ বা অনুসরণ প্রথম জীবনে সার্থক হয় নি। আগেই বলেছি, আদিপর্বের সেইসব রচনার প্রকরণগত দুর্বলতা স্বীকার করে পরবর্তীকালে সেজন্য লজ্জা বোধ করেছেন শরৎচন্দ্র।

চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের তুলনায় ঘটনার আকস্মিক ও নাটকীয় যোগাযোগের ওপর অধিক নির্ভর কিংবা কোনো কোনো চরিত্র পরিকল্পনায় বা ঘটনা-সংস্থানে, যেমন, চন্দ্রনাথ–সরযূর চরিত্র-বিন্যাসে, তাদের প্রথম সাক্ষাৎ ও প্রণয়–সঞ্চারে বঙ্কিমী ঢঙের রোমান্স-দৃষ্টির আলো এসে পড়েছে। পার্বতী-দেবদাসের অভিশপ্ত বাল্যপ্রণয়-কাহিনীটি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত নিশ্চয় নয়।

প্রথম দিকের ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে উত্তরকালে শরৎচন্দ্র ক্রমপরিণত হযে উঠেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তখনও বাংলা উপন্যাসের প্রকরণ-শিল্পে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রতিমা নির্মাণ করে গেছেন—সেই আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত কাহিনী সম্বলিত এক ধরণের 'Well-made novel'-এর প্রথাসিদ্ধ শিল্পরীতি অনুসরণেই তিনি কমবেশি নিযুক্ত থেকেছেন, বলা চলে। উপন্যাসের প্যাটার্ণ-নির্মাণে উত্তরপর্বে শরৎচন্দ্র যে well-made novel-এর পূর্ব-পরিকল্পিত বিন্যাসের রীতি বিশেষভাবে অনুসরণ করতে চাইতেন, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে শরৎচন্দ্রের একটি স্মরণীয় উক্তি উপস্থাপিত করছি। ডঃ অমলেন্দু বসু সম্প্রতি তাঁর একটি নিবন্ধে (দ্রঃ সাপ্তাহিক দেশ, ১৫ মে, ১৯৭৬) স্বকর্ণশ্রুত শরৎচন্দ্রের ওই উক্তিটি প্রকাশ করেছেন। সম্ভবত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে (ডঃ বসুর মতে) শরৎচন্দ্রকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন: আপনার উপন্যাস-রচনায় কোনো পদ্ধতি আছে কি? আপনি কি কাহিনীর সবটা ভেবেচিন্তে গোছগাছ করে তারপরে লেখায় আত্মনিয়োগ করেন, নাকি লেখার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীটি স্বাধীন প্রাণ-বত্তায় অভাবিতপূর্ব মোড় নিতে থাকে? —এর উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলন: আমি যখন লিখতে বসি, কাহিনীর গোটা ছক আমার কল্পনায় উজ্জ্বল এবং সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। আমি চাইলে, ধরুন, কাহিনীর চ্যাপটার

সত্তেরো প্রথমে লিখে তারপরে প্রথম চ্যাপ্টারে চলে যেতে পারি।

এরকম কথা শুনলে প্রথমটা রীতিমতো চমক লাগে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হতে পারে, এ ধরণের উক্তি শরৎচন্দ্রের পূর্বসূরিদের মধ্যে স্বদেশে-বিদেশে আরো কেউ কেউ, বোধ হয় আরও সঙ্গতভাবে করতে পারতেন। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র হার্ডি কিংবা ফ্লবেয়র। আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত এবং কাহিনী ও চরিত্রের সুসমঞ্জস মিশ্রণে রচিত সুগঠিত উপন্যাসের প্যাটার্ণ শরৎচন্দ্রের চোখের সামনে সম্ভবত ভাসতো বলেই তিনি গভীর প্রত্যয়ে পূর্বোক্ত মন্তব্যটি করেছিলেন। যাই হোক, শরৎচন্দ্র উপন্যাস লেখার সময় বাস্তবিক রচনার পারম্পর্য এলোমেলো করে দিতেন কিনা অর্থাৎ সে প্রয়োজন কখনও তাঁর হয়েছিল কিনা, তা আমরা জানিনে। কিংবা উপন্যাসের গোটা ছক নিখুঁতভাবে যাঁর পূর্ব-পরিকল্পিত, তিনি সার্থক উপন্যাস-শরীর গঠনে সত্যই কতটা সফল হয়েছিলেন, তা যদিও বিচার-সাপেক্ষ, তবু আলোচনার এই পর্যায়ে এ কথা বোধ হয় বলা চ'লে যে, এ ধরণের প্রথাসম্মত উপন্যাস-অবয়ব রচনায় তাঁর অব্যবহিত আদর্শ পূর্বসূরি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। অবশ্য বলা বাহুল্য, শিল্পরীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ পূর্বসূরির অনুসারী হন নি, সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার নিজস্ব প্রয়োজনে অনেক কিছুই তাঁকে নিজে উদ্ভাবন করতে হয়েছে। এই অনুসরণ ও উদ্ভাবনের মিশ্রণের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-প্রকরণের ভালো-মন্দ দুই-ই যে প্রকাশ পেয়েছে—সে মূল্যায়ন সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে।

উপন্যাস-দেহের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হল কার্য-কারণসূত্রে আবদ্ধ একটি 'প্লট' বা কাহিনী-বৃত্ত। সেই প্লটকে আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত ক্রম-পরিণামী একটি পরিচ্ছন্ন রূপ দিতে গেলে তাকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করাই প্রচলিত প্রথা। শরৎচন্দ্র তাঁর সমস্ত উপন্যাসেই অধ্যায়-ভাগের নীতি অনুসরণ করেছেন। উপন্যাস বড় হ'ক আর ছোটই হ'ক, সব উপন্যাসেই অধ্যায়-ভাগের এক প্রান্তে থাকে কাহিনীর আরম্ভ-অংশ, অন্য প্রান্তে থাকে তার শেষ-অংশ। শরৎচন্দ্র লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে উপন্যাসের প্রকরণ সম্পর্কে দুটি বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন। এক, 'রচনায় অধ্যায় ভাগ করিতে হয়।' এবং দুই, 'আরম্ভটাই সকলের চেয়ে শক্ত, এইটার উপরেই প্রায় সমস্ত বইটা নির্ভর করে।' [৫ই আগষ্ট, ১৯১৯ এবং ৭ই ভাদ্র, ১৩২৬-এর চিঠি দ্রষ্টব্য]

উপন্যাসে অধ্যায় ভাগের তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্য : এক, কাহিনীর অগ্রগতির

তর বোঝানো ; দুই, ঘটনার অভিঘাতে চরিত্রের বিবর্তনের পর্যায়গুলি অঙ্কন করা ; ও তিন, প্রেক্ষণবিন্দু (point of view) বা সহজ কথায়, দৃষ্টিকোণ-এর পরিবর্তন সূচিত করা।

কাহিনী ও চরিত্রের বিবর্তনের ক্ষেত্রে অধ্যায়-বিন্যাসে শরৎচন্দ্র প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন মোটামুটিভাবে। সেখানে কালগত ও ঘটনাগত পারম্পর্য রক্ষা করেই অগ্রসর হয়েছেন ঔপন্যাসিক। তবে প্রেক্ষণবিন্দু রচনায় শরৎচন্দ্র সর্বত্র অবিকল এক রীতি অনুসরণ করেছেন এ কথা বলা চলে না। সমালোচকপ্রবর লাবক উপন্যাসে প্রেক্ষণবিন্দু বা point of view-এর সমস্যার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর তাৎপর্য উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'The question of the point of view (is) the question of relation in which the narrator stands to the story.' [The Craft of Fiction, pp 251] এই মন্তব্যের আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্র তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই (ব্যতিক্রম কেবল 'স্বামী' ও 'শ্রীকান্ত') প্রথম পুরুষের বা third person-এর প্রেক্ষণবিন্দুই ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ সর্বজ্ঞ বা omniscient লেখকের যে দৃষ্টিকোণ, যার দ্বারা কাহিনীর অন্ধিসন্ধি কিংবা চরিত্রের নিহিত প্রত্যন্ত দেশ, সবই লেখকের করতলগত, সেই দৃষ্টিকোণের সাহায্যে কাহিনী ও চরিত্র উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু এহ বাহ্য। সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং প্রথম পুরুষের মাধ্যমে কাহিনী ও চরিত্র বিন্যস্ত করলেও শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলিতে কোথাও কোথাও এই সর্বজ্ঞতা বা omniscience কে কিছুটা সীমিত করেছেন। কারণ পরিপূর্ণ ও নিশ্ছিদ্র সর্বজ্ঞতা উপন্যাসের ক্ষতিসাধন করে, উপন্যাসের বাস্তবতার illusion বিঘ্নিত করে, জীবনের সজীব রূপচিত্র অঙ্কনে ব্যাঘাত ঘটায়। তাই দেখি, 'দত্তা' উপন্যাসের কাহিনী যদিও প্রথম পুরুষে বিবৃত হয়েছে, তবু লেখক নায়িকা অর্থাৎ বিজয়ার দৃষ্টিকোণ থেকেই যথাসম্ভব গল্পটিকে ও চরিত্রগুলিকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। মাঝে মাঝে এক-আধটু ব্যতিক্রম থাকলেও, মোটের ওপর এই রীতিই সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এর ফলে কাহিনী ও চরিত্রের বিকাশ ও পরিণাম নায়িকার মধ্য দিয়েই একটু একটু করে পাঠকের গোচরে এসেছে। পাঠকের মনে কৌতূহল উৎকণ্ঠা ও বিস্ময়বোধ অব্যাহত ও ক্রমবর্ধমান রাখতে এই রীতি যথেষ্ট সাহায্য করেছে। কারণ এর ফলে একই সঙ্গে নরেনের ব্যক্তিগত জীবন ও রাসবিহারীর কূটচরিত্র পাঠকের মনে আলোছায়া মেশানো

রহস্যময়তা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে। শিল্পগত সার্থকতার প্রশ্ন না তুলে বলা চলে, ফ্লবেয়ারের 'মাদাম ব্যোভারী'তে অনেকটা এ ধরণের 'Limited omniscience' বা সীমিত সর্বজ্ঞতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্ত হয়েছে। জেন অষ্টেনের 'এমা'-র এই প্রকরণ-বৈশিষ্ট্যের আরও সুষ্ঠু নিদর্শন মিলবে।

প্রথম পুরুষে বিবৃত 'গৃহদাহ' উপন্যাসেও এই প্রেক্ষণবিন্দু মুখ্যত অচলার। দু-একটি স্থলে মহিম বা সুরেশের দিক থেকে কাহিনীর কোন বিশেষ পর্যায়ের আরম্ভ সূচিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের তেমন কোন স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিই উপন্যাসের মধ্যে প্রযুক্ত হয়নি। এর ফলে তাদের অন্তর্লোকে পাঠকের যথাযথ অনুপ্রবেশ ঘটে না। ঔপন্যাসিক তাঁর সর্বজ্ঞতা সত্ত্বেও এদের চরিত্রের নিভৃতলোকের ওপর তেমন আলোকসম্পাত করেন নি ; আবার অন্য দিকে, উপন্যাসে অচলার দৃষ্টিবিন্দুর আপেক্ষিক প্রাধান্যের ফলেও ওই দুটি পুরুষ-চরিত্রের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ফুটে ওঠার বিশেষ সুযোগ মেলেনি।

প্রথম পুরুষে বিবৃত সর্বজ্ঞ লেখকের কাহিনীকে যখন মুখ্যত একটি চরিত্রের আংশিক প্রেক্ষণবিন্দু থেকেও বলা হয় বা দেখা হয়—তখন সেই কাহিনীতে, বলা বাহুল্য, এক ধরণের subjective বা আত্মনিষ্ঠ ভঙ্গির পরোক্ষ আভাস সূচিত হয়। পূর্বোক্ত দুটি উপন্যাসে যতো অল্পমাত্রাতেই হ'ক, এরকম কিছুর আস্বাদ আমরা পাই। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সব উপন্যাস অবশ্যই এ ধরণের নয়। একটি দৃষ্টান্ত দিই—'চরিত্রহীন'। এই উপন্যাসের সমগ্র কাহিনীটি যথারীতি সর্বজ্ঞ লেখক ও প্রথম পুরুষের কথনভঙ্গিতে লেখা। কিন্তু এখানে আগের উপন্যাস দুটির (দত্তা ও গৃহদাহ) মতো কোন একটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণের প্রাধান্য নেই। এখানে সতীশ, সাবিত্রী, উপেন্দ্র, কিরণময়ী, দিবাকর ইত্যাদি বিভিন্ন চরিত্রের দৃষ্টিকোণ দেখা দিয়েছে বারবার ঘুরে ঘুরে। এরই মধ্য দিয়ে কাহিনী এগিয়েছে, কাহিনীতে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে, চরিত্রে চরিত্রে সংঘর্ষ শুধু নয়, এক চরিত্রের ওপর অন্য চরিত্রের অভিঘাতের ছবিও এইভাবে ফুটে উঠেছে। ফরস্টার যাকে বলেছেন 'shifting of point of view', সেই 'পরিবর্তমান প্রেক্ষণবিন্দু'র অনুষঙ্গেই দেখা দেয় অধ্যায় ভাগের প্রকরণগত প্রয়োজন। 'চরিত্র-হীন' উপন্যাসের অধ্যায়গুলি নানা চরিত্রের বিভিন্ন দৃষ্টিবিন্দু প্রকাশের প্রধান অবলম্বন। এক অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায়ে পাঠক যখনই প্রবেশ করছেন, তখনই উপন্যাসটির ঘটনা ও চরিত্র ভিন্নতর দৃষ্টিকোণের আলোয় বিচিত্রবর্ণ রূপ গ্রহণ করেছে।

এর ফলে শিল্পসৃষ্টি হিসাবে উপন্যাসটির মূল্য হয়ত হ্রাস পেয়েছে, হয়ত উপন্যাসটিতে গঠনগত শিথিলতার ত্রুটি দেখা দিয়েছে, কিন্তু সে কথা স্বতন্ত্র। আমরা এই বিশেষ প্রকরণের তাৎপর্যটি শুধু এখানে অনুধাবন করতে চাই। এই 'shifting of view-point' যা 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে প্রযুক্ত হয়েছে, যা একই সঙ্গে লেখকের সর্বজ্ঞতা ও বিভিন্ন চরিত্রের সীমিত প্রেক্ষণবিন্দুর মধ্যে একটি মিশ্রণ ঘটিয়েছে, ফরস্টার শেষ পর্যন্ত তাকেই বলতে চেয়েছেন, 'Bouncing'—যা আসলে কোন প্রকরণ নয়, যার প্রয়োগের পিছনে থাকে ঔপন্যাসিকের বলিষ্ঠ এক আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিত্ব। শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীনে' অবশ্য ঔপন্যাসিকের সেই ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে পারেন নি, যার বলিষ্ঠ অথচ মায়াবী প্রভাবে কিছুটা আপাত-বিচ্ছিন্ন উপকরণ বা অধ্যায়গুলি অটুট সংহতি লাভ করতে পারে।

প্রসঙ্গত বলা চলে যে, শরৎচন্দ্র কেবল দুটি গ্রন্থেই উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন: স্বামী ও শ্রীকান্ত। 'স্বামী'কে ঠিক উপন্যাস বলা চলে না। এটি এক পথভ্রান্ত অনুতপ্ত নারীর স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে লেখা বড় গল্প বিশেষ। গল্পে কোন অধ্যায়-ভাগও নেই। কেবল কাহিনী-বিবৃতির মাঝে মাঝে ফাঁক রেখে সময় বা ঘটনা-পরিস্থিতির পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। স্বামী উপন্যাস নয়, রচনা হিসেবে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়ত ও একমুখী-কাহিনী-ভিত্তিক বলেই বোধহয় উত্তম পুরুষের প্রেক্ষণবিন্দুর প্রয়োগ অনেকাংশে যথাযথ হতে পেরেছে।

কিন্তু 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে এই উত্তম পুরুষের প্রয়োগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম দুই পর্বে শ্রীকান্তের দৃষ্টিকোণ মুখ্যত ভ্রমণকাহিনী-কথকের। এই দুই পর্বের 'আমি' উপন্যাসের 'আমি' নয়, ভ্রমণকাহিনীর লেখক 'আমি'। বস্তুত সকলেই জানেন মাঘ, ১৩২২-এ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় যখন শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত বেরুতে শুরু করল, তখন তার নাম ছিল—'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'। 'শ্রীকান্ত' প্রথম দুই পর্বেই এক ভ্রমণকারীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্ত হয়েছে, যিনি জীবনের নানা চলমান ঘটনাকে কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করছেন, নানা চরিত্রের সংস্পর্শে আসছেন, কিন্তু যাঁর নিজের চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব ওইসব ঘটনা বা চরিত্রের অভিঘাতে তেমন বিবর্তিত বা রূপান্তরিত হচ্ছে না—অন্তত তার রূপায়ণ তেমন চোখে পড়ে না। শ্রীকান্তের দৃষ্টিকোণ যথার্থ উপন্যাসের নায়কের দৃষ্টিকোণ হয়ে উঠেছে তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে। শিল্প-

সৃষ্টি হিসেবে শেষ দুই পর্ব তেমন উন্নতমানের না হলেও এখানে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর অন্তর্জীবনের সঙ্গে জটিল রহস্যময় সম্পর্কে জড়িত হওয়ার ফলে তার উত্তম পুরুষে বর্ণিত উপন্যাসের নায়কোচিত ভূমিকাটি অধিকতর স্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। প্রথম দুই পর্বে যদিও কাহিনী-বর্ণনায় শ্রীকান্ত উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করেছে, এবং বলা বাহুল্য যদিও শ্রীকান্ত প্রত্যেক ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী, তবু এই দুই পর্বের প্রায়-সংযোগ-সূত্রহীন বিভিন্ন আখ্যায়িকা যেন কতকটা বিচ্ছিন্ন objective নাটকীয় দৃশ্য-সংস্থানের মতো পাঠকের চোখের সামনে জেগে উঠেছে। এখানে কথক বা লেখক—যথার্থভাবে উপন্যাসের একান্ত প্রাসঙ্গিক চরিত্র, যাকে বলা যেতে পারে dramatised author—হয়ে উঠতে পারে নি।

৩

আগেই বলেছি, শরৎচন্দ্রের মতে উপন্যাসে 'আরম্ভটাই সকলের চেয়ে শক্ত, এইটার উপরেই প্রায় সমস্ত বইটা নির্ভর করে।' বস্তুত আদি-মধ্য-অন্ত-যুক্ত প্রথাসিদ্ধ উপন্যাসের যে-স্বীকৃত কাঠামো, সেখানে বিস্তৃত বাস্তব পটভূমিতে কাহিনী ও চরিত্র মিলিয়ে মানবিক সম্পর্কের জটিল গ্রন্থিরচনার যে-প্রয়াস, তারই উদ্যোগপর্ব হল উপন্যাসের আরম্ভ-অংশ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আরম্ভ-দৃশ্যের প্রযুক্তিগত তাৎপর্য ও সৌন্দর্য শরৎচন্দ্রকে হয়তো বহুলাংশে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করেছিল। আর সেইজন্যই উপন্যাসের আরম্ভ-দৃশ্য সম্পর্কে তাঁর এই বিশেষ সচেতনতা। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের মতো এতো প্রগাঢ়ভাবে না হলেও শরৎচন্দ্রের মধ্যে যে-নাট্যপ্রবণতা ছিল (এই প্রবণতা সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করবো), যে-এক-ধরণের well-made novel-এর দিকে ঝোঁক ছিল, তারই ইঙ্গিতবহ এই আরম্ভ-অংশের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। উপন্যাসের ভিত্তিটি মজবুত হলে তবেই সমগ্র ইমারতটি সুষ্ঠু স্বাভাবিকতায় গড়ে উঠতে পারবে—সম্ভবত এই মনোভাব থেকেই শরৎচন্দ্র আরম্ভ-অংশের কথা বিশেষভাবে ভেবেছেন। আর স্বভাবত এইজন্যই উপন্যাসের আরম্ভ বর্ণনায় সবক্ষেত্রে তিনি এক রীতি অনুসরণ করেন নি। শুধু তাই নয়, উপন্যাসের আরম্ভকে শরৎচন্দ্র খুব বেশি নাটকীয় কিংবা অতিমাত্রায় বিবৃতি-ধর্মী বা বিশ্লেষণাত্মক করতেও চান নি। কারণ কোন অতিশয়িত রীতিই ঔপন্যাসিকের পক্ষে

আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড এ সম্পর্কে বলেছিলেন, "Openings are…of necessity always affairs of compromise." [Joseph Conrad : A Personal Remembrance]

শরৎচন্দ্র তাঁর সহজ শিল্পবুদ্ধিতে যেন মোটামুটিভাবে সেই মধ্যপন্থাই গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো নাট্যরসাশ্রিত বর্ণাঢ্য আরম্ভ-দৃশ্য শরৎচন্দ্রের কাছে নিশ্চয়ই প্রত্যাশিত নয়। তবু শরৎচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় কোনো কোনো উপন্যাসে আরম্ভ সজীব সংলাপ ও 'অ্যাক্শনে'র সাহায্যে কিছুটা dramatic present বা নাটকীয় বর্তমানের সংবেদন সৃষ্টি করে। যেমন, দেবদাস কিংবা পল্লীসমাজ। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ উপন্যাসগুলির আরম্ভ তেমন নাটকীয় চেতনায় উদ্ভাসিত নয়, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই তা সংলাপের মাধ্যমে বিবৃত। সাধারণত সেগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য হল, প্রধান চরিত্রসমূহের উপস্থাপনা মাত্র। সেজন্য প্রয়োজনবোধে কিছুটা পিছু হটে গিয়ে লেখক অতীত দিনের পট রচনা করেছেন সূচনা অংশে, যেমন, 'চরিত্রহীনে' তা' তিন মাস আগের, 'গৃহদাহে' পাঁচ বছর, 'দত্তা'য় পঁচিশ বছর। একমাত্র 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের আরম্ভ-অংশে শরৎচন্দ্র পূর্বোক্ত 'compromise'-এর পথ ত্যাগ করে এক চূড়ান্ত পরীক্ষায় নেমেছিলেন। উপন্যাসের আরম্ভে শুধু প্রবল নাটকীয় পরিস্থিতি নয়, একেবারে চূড়ান্ত 'ক্লাইম্যাক্স'। অবশ্য বলা বাহুল্য এর ফল উপন্যাসের প্রকরণের দিক থেকে খুব স্বস্তিকর হয় নি। আরম্ভের ওই আগ্নেয় দীপ্তির পরে উপন্যাসটির বাকী অংশ যেন অনেকটাই স্তিমিত ও অকারণে দীর্ঘায়িত।

৪

আরম্ভ-অংশ নিয়ে উপন্যাস শুরু হয়—তারপর তা' ক্রমেই অগ্রসর হতে থাকে। ক্রমশ দেখা দেয় তার মধ্য-অংশ—যেখানে উপন্যাসের জটিল গ্রন্থিগুলি একটি একটি করে রচিত ও পরস্পরের সঙ্গে নানা সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ হয়ে নানা সঙ্কট ও সংঘাতের বিক্ষুব্ধ বিস্ময়বহ মুহূর্ত বা পরিস্থিতি সৃজন করে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, প্রথাসিদ্ধ আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত কাহিনী, যার বহিরঙ্গ অবয়ব হয়তো সংহত ও সুগঠিত, তা অনেক সময়েই কৃত্রিম এক শিল্পসৃষ্টিতে পর্যবসিত হতে পারে। বলা বাহুল্য, এর কারণ—উপন্যাস নিছক

প্রকরণ-নির্ভর বস্তু নয়; কিংবা ঘুরিয়ে বলতে পারি, উপন্যাসের প্রকরণ কোন বাইরের কৃত্রিম জিনিস নয়, তা জন্ম নেয়, ক্যাণ্ডিনস্কি যাকে বলেছেন, 'inner necessity'—বিষয়বস্তুর আত্মপ্রকাশের সেই আন্তর প্রয়োজনের অনিবার্যতা থেকে। অনেক সময়েই দেখা যায়, নিছক ঘটনা-ধর্মী বা ঘটনাপ্রধান কাহিনীতে এই 'inner necessity' থাকে না, কারণ এই আখ্যায়িকাই তো সব সময় ঔপন্যাসিকের জীবন বিষয়ক বক্তব্য, যাকে উপন্যাসের প্রকৃত বিষয়বস্তু বা subject-matter বলা চলে, তার বাহন হয় না। বস্তুত লেখকের জীবন বিষয়ক বক্তব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন চরিত্র। তাই ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের চেয়ে চরিত্রপ্রধান উপন্যাসের প্রতি অতি আধুনিক কালের ঔপন্যাসিকদের মনের বিশেষ ঝোঁক চোখে পড়ে। এই অর্থে শরৎচন্দ্রের মধ্যে নিঃসন্দেহে আধুনিক কালের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। তিনি অ্যারিষ্টটেলীয় কাহিনী-প্রাধান্য ত্যাগ করে চরিত্রের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন :

"আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র—তাকে ফোটাবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়, সে সব আপনি আসিয়া পড়ে।" [শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী, পৃ. ২০৭]

কিংবা অন্যত্র বলেছেন,

"আমি ঘটনার সৃষ্টি উপন্যাসের আসল জিনিস বলে মনে করিনে। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে চরিত্রসৃষ্টি। তার সঙ্গে ঘটনা আপনি এসে পড়ে, চেষ্টা করতে হয় না।" [দ্রঃ শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১ম খণ্ড) পৃ, ৪১৪]

নিঃসন্দেহে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের এটি একটি একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ দাবী। আর আগেই বলেছি, এই দাবীতেই শরৎচন্দ্রের আধুনিকতা। আর এই আধুনিকতার দীক্ষা সম্ভবত তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। বাইরের ঘটনার চেয়ে নরনারীর অন্তর্লোকের গূঢ় রহস্যের ছবিকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে এ কালের বাংলা সাহিত্যে যে উপন্যাসটি প্রথম লেখা হয়েছিল, সেই 'চোখের বালি'র স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। আর এই 'চোখের বালি' সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের একান্ত সশ্রদ্ধ মনোভাবের কথা কারো অজানা নেই। নূতন কালের এই আধুনিক রীতির ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের অনেক রচনায় এই প্রবণতা অবশ্যই চোখে পড়ে—এই প্রসঙ্গে পল্লীসমাজ, গৃহদাহ, দেনাপাওনা, চরিত্রহীন ইত্যাদির নাম মনে পড়ছে। এই সব উপন্যাসের অন্যতম প্রধান

বৈশিষ্ট্য হ'ল, চরিত্রসমূহকে পরিস্ফুট করার জন্য যে কাহিনী অবলম্বিত হয়, তা অনেক স্থলেই বিকাশ লাভ করে বিভিন্ন নাটকীয় পরিস্থিতির মাধ্যমে। বলা বাহুল্য কয়েকটি সুনির্বাচিত নাট্য পরিস্থিতি শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র ও চরিত্র-বাহিত বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত ও সংহত আকারে প্রকাশের সুযোগ এনে দিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। চরিত্রের নিহিত সম্ভাবনা ও স্বরূপকে যথাযথভাবে রূপায়িত করার সুষ্ঠু উপায় হিসাবেই শরৎচন্দ্র 'গৃহদাহ' উপন্যাসে মোগলসরাই স্টেশনে গাড়ি বদলের আশ্চর্য জোরালো নাটকীয় দৃশ্যটির অবতারণা করেছেন, তারি মধ্য দিয়ে অচলার দ্বিধা-বিভক্ত সত্তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নৈতিক সঙ্কটের জটিল রহস্য-রূপের উন্মোচন ঘটিয়েছেন, কিংবা 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের গোড়ায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে ষোড়শীর দুঃসাহসিক স্বীকারোক্তির নাটকীয় চিত্রের মাধ্যমে ভৈরবীর মধ্যে অলকা-সত্তার উদ্ভাসনের সঙ্কেত জানিয়েছেন। এরকম আরো দু'একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র-উন্মোচনী নাটকীয় পরিস্থিতি হ'ল, উপেন্দ্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কিরণময়ীর দিবাকরকে নিয়ে পলায়ন কিংবা 'পল্লী-সমাজে'র তারকেশ্বরে রমা-রমেশের সাক্ষাৎকার।

কিন্তু এখানে একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি হই আমরা। চরিত্রের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে যখন কাহিনী কিংবা নাট্য-পরিস্থিতি স্বতঃ-উৎসারিত হয়, তখন তা' একান্ত স্বাভাবিক সঙ্গত ও প্রত্যাশিত। কিন্তু প্রশ্ন এই, সত্যই কি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে চরিত্রের সেই প্রাধান্য বর্তমান? কাহিনী বা নাট্য-পরিস্থিতিকে ছাপিয়ে তার গূঢ় অন্তর্লোকের ছবিই কি তাঁর উপন্যাসের মুখ্য আকর্ষণ?—আমাদের ধারণা, তা নয়।' আর এ ধরণের উপন্যাস সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণ স্বীকার করলেও রবীন্দ্রনাথ থেকে এখানেই শরৎচন্দ্রের প্রভেদ, আর রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই। 'চোখের বালি' থেকে ('নৌকাডুবি' ব্যতীত) রবীন্দ্রনাথ যে চরিত্র-প্রধান ও অপেক্ষাকৃত ঘটনা-বিরল উপন্যাসের সূচনা করলেন বাংলা সাহিত্যে—তার মুখ্য ভিত্তিই হ'ল ব্যক্তিত্বের সমগ্রতার, ব্যক্তিসত্তার নানামুখী প্রবণতার মধ্যে সামঞ্জস্য-সন্ধানের ও তজ্জনিত যন্ত্রণার পূর্ণাঙ্গ রূপ। ব্যক্তিত্বের এই সমগ্রতার অন্বেষণে উপন্যাসের মধ্যে নানামুখী ঘটনার ছক ও নানা পরিস্থিতি-জনিত আবর্তের উদ্ভব হয়েছে, যাদের মূলে আছে চরিত্রের বিবর্তনের অনিবার্য টান। চোখের বালি, গোরা, ঘরে-বাইরে, যোগাযোগ ইত্যাদি উপন্যাস থেকে এর অনেক দৃষ্টান্ত মিলবে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ব্যক্তিত্বের এই সমগ্রতা সন্ধানের ঐকান্তিক আগ্রহের পরিচয় প্রায় অনুপস্থিত। চরিত্রগুলি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি খণ্ডিত, সেগুলি অনেক সময়েই কতকগুলি বৃত্তি বা প্রবণতার সমাহারমাত্র, কিন্তু সব মিলিয়ে তাদের সমবায়ী রূপ একটি অখণ্ড চরিত্রের বিবর্তন বা Becoming-এর ছবি ফোটায় না। এর অনিবার্য ফল হ'ল, চরিত্র থেকে কাহিনী বা ঘটনা-পরিস্থিতিগুলি সর্বত্র স্বতঃই সমুত্থিত হয় না, বরং কিছু আকস্মিক চমকপ্রদ—যাকে 'নাটকীয়' বলতে পারি, সেরকম 'সিচুয়েশন' বাইরে থেকে আরোপিত বা যুক্ত হয়। অনেকস্থলেই এইসব নাট্য-মুহূর্তের তেমন কোন প্রস্তুতি নেই, সেগুলি শরৎচন্দ্রের সুবিধাজনক হাতিয়ার-বিশেষ ; এদের সাহায্যে ইচ্ছামত মোচড় দিয়ে কাহিনীতে চমক সৃষ্টি করতে পারেন সহজেই, কিন্তু সত্যকার জীবন-বাস্তবতার ছবি এর দ্বারা আদৌ ফুটে ওঠার অবকাশ পায় না। বরং এই রীতি অবলম্বনের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয় এক অতি-জনপ্রিয় লেখকের ভাবাবেগ-আক্রান্ত ইচ্ছাপূরণধর্মী মনের প্রবণতা। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করতে পারি, 'গৃহদাহ' উপন্যাসের শেষ দিকে ডিহরীতে গৃহশিক্ষকরূপে মহিমের আকস্মিক আবির্ভাব-দৃশ্য, কিংবা 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সাঁওতাল পরগণায় সরোজিনীর সঙ্গে সতীশের অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ-দৃশ্য অথবা ওই উপন্যাসেই বর্ণিত সুদূর বর্মায় কিরণময়ী-দিবাকরের বাসায় সতীশের আবির্ভাবের ঘটনাটি। সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতা-সন্ধানী জীবনদৃষ্টিতে যে একধরণের বিষয়-নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময়েই চোখে পড়ে—শরৎচন্দ্রে তার বিপরীত ছবিই বেশি দেখি। তাঁর সৃষ্ট বিষয় বা চরিত্রের সঙ্গে তাঁর নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও ভাবালুতা বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। তাঁর নিজের ব্যক্তিচরিত্রের ভাবোচ্ছ্বাস তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে সংক্রামিত হয়। এর ফলে এক অদ্ভুত ধরণের 'প্যারাডক্স' দেখা দেয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নাট্য পরিস্থিতি বা নাট্যমুহূর্ত প্রচুর, কিন্তু তার পিছনে স্রষ্টার মন নির্লিপ্ত বা 'অবজেকটিভ্' নয়, তা অনেকটাই তাঁর নিজের ভাবপ্রবণতা বা ভাবাবেগের রঙে রাঙানো।

এ থেকেই শরৎচন্দ্রের বড়ো উপন্যাসগুলির চরিত্রসৃষ্টির শিল্পগত সার্থকতা নিয়ে মনের মধ্যে সংশয় দেখা দেয়। সন্দেহ জাগে, চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের সংঘাত ও ঐক্যের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের যে বিকাশ-বিবর্তন সেটাই শরৎ-চন্দ্রের অন্বিষ্ট, নাকি এই অনিবার্য পরিণাম-মুখী বিবর্তনের বদলে কেবল নানা

চমকপ্রদ নাটকীয়তায় বিক্ষুব্ধ ঘটনার সাহায্যে চরিত্রের নিছক বিভূতি-প্রকাশন-ই তাঁর লক্ষ্য ?

চরিত্রের স্বাভাবিক বা অনিবার্য পরিণামকে যে শরৎচন্দ্র সর্বত্র সর্বাধিক গুরুত্ব দেন নি, অথচ শিল্পি হিসাবে যা দিতে তিনি একরকম অঙ্গীকারবদ্ধ—তার প্রমাণ মেলে, যখন তিনি একটি চিঠিতে লেখেন :

"গল্প পারতপক্ষে ট্র্যাজেডি করতে নেই। ..গল্প শেষ করে যদি না পাঠকের মনে হয়, 'আহা বেশ।' তবে আবার গল্প কি ?"

[দ্রঃ শরৎচন্দ্র (৩য় খণ্ড)—গোপালচন্দ্র রায়]

কিংবা অন্যত্র লেখেন, "পড়িয়া যদি না আনন্দের আতিশয্যে চোখে জল আসে, তবে আর সে গল্প কি ?" [শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃ. ৯১]—এই দু'টি উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে চরিত্রের স্বাভাবিক বিবর্তনই যদি লেখকের অভিষ্ট হয়, তবে জোর করে চরিত্রের ট্র্যাজিক পরিণতিকে আনন্দের আতিশয্যসঞ্চারী কমেডিতে রূপান্তরিত করা আদৌ কি সম্ভব না সঙ্গত ?

আসলে শরৎচন্দ্রের প্রতিভা স্থির অপরিবর্তনীয় চরিত্র ও পরিবেশ সৃষ্টির প্রতিভা। আর এই কারণেই তাঁর হাতে রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, নিষ্কৃতি, মহেশ ইত্যাদি গল্পের চরিত্রগুলি আশ্চর্য সজীব হয়ে ওঠে। কিন্তু বড় উপন্যাস, যেখানে চরিত্রের বিবর্তন একান্ত প্রত্যাশিত ও অনিবার্য, সেখানে তাঁর বিচ্যুতি বিশেষ পীড়াদায়ক বোধ হয়। শরৎচন্দ্রের বড় উপন্যাসগুলিতে, আগেই বলেছি, ঘটনাগুলি অনেক স্থলেই চরিত্রের উপর আরোপিত বা বাইরে থেকে তার সঙ্গে যুক্ত। আর এর ফলেই অনেক চরিত্র ঠিক স্বাভাবিক পথে বিবর্তিত বা বিকশিত হতে পারে না। এদের জীবনের বহিরঙ্গনে অনেক পরিবর্তন এলেও শেষ পর্যন্ত এদের অন্তর্লোকে কোন গভীর অনিবার্য রূপান্তর সাধিত হয় না। এরা চারিত্রধর্মে আগাগোড়া প্রায় অপরিবর্তিতই রয়ে যায়। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে অনেক চরিত্রের নাম : উপেন্দ্র, সতীশ, মহিম, নরেন (দত্তা), রমেশ, বিজয়া, কমল ইত্যাদি।

আপাতদৃষ্টিতে 'গৃহদাহ' উপন্যাসের অন্তিমপর্যায়ে সুরেশের চরিত্রে কিছু রূপান্তর এসেছে মনে হলেও, তা কখনই গভীর হতে পারে নি—ভাবালুতার স্তরেই প্রায় রয়ে গেছে। এর জন্য পরিকল্পিত চরিত্রটির অগভীর উচ্ছ্বাসপ্রবণ প্রকৃতি ও অস্থিরতাকেই মূলত দায়ী করতে হয়। অচলার মধ্যে এই অন্তর্গূঢ় রূপান্তরমুখীনতার আভাস গোড়া থেকে থাকলেও, তা শেষ পর্যন্ত কিছুটা

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেছে যেন। আসলে সুরেশ ও মহিমের প্রতি তার আকর্ষণ-বিকর্ষণের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি জোরালো না হওয়ায় ওই রূপান্তরমুখীনতা অনেকটা অগভীর চাঞ্চল্য বা 'দোলাচল'-বৃত্তির স্তরেই রয়ে গেছে। অচলার সমগ্র ব্যক্তিসত্তার গভীর পরিবর্তনের প্রত্যয়সিদ্ধ শিল্পরূপটি যথাযথ ফোটে নি। অথচ সেই সঙ্গে তুলনা করলে অনুভব করি অনুরূপ দ্বিমুখী আকর্ষণে আবর্তিত Anna Karenina-র অন্তর্দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ ব্যক্তিসত্তা শেষ পর্যন্ত কী গভীর মর্মস্পর্শী ট্রাজিক জীবনবোধে উত্তীর্ণ হয়েছে।

৫

চরিত্রের বিবর্তন ও পরিণাম-চিন্তার অনুষঙ্গে আরেকটি প্রসঙ্গ অনিবার্য-ভাবে এসে পড়ে। সেটি উপন্যাসের সমাপ্তি প্রসঙ্গ। উপন্যাসের আরম্ভ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের সচেতনতার কথা আগেই বলেছি। উপন্যাসের 'শেষ' সম্পর্কেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তাৎপর্যপূর্ণ। উপন্যাসের ট্রাজিক পরিণাম সম্পর্কে তাঁর অনীহার কথা উল্লেখ করেছি। এছাড়া, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে, যখন, 'বড়দিদি' ব্যতীত আর কোন বই প্রকাশিত হয়নি, তখনই, মাত্র ৩৭ বছর বয়সে শরৎ-চন্দ্র এক চিঠিতে বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখছেন:

"ট্রাজেডি লিখিব না। ট্রাজেডি ঢের লিখিয়াছি আর না। তাছাড়া ছেলে ছোকরারা ট্রাজেডি লিখুক, আমাদের এ বয়সে ট্রাজেডি লেখা কালি-কলমের অপব্যয়" [শরৎচন্দ্র (৩য় খণ্ড)—গোপালচন্দ্র রায়, পৃ. ৫০]

সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশের একেবারে সূচনাপর্বেই শরৎচন্দ্রের এরকম মন্তব্য থেকে তাঁর মনোভাবের একটি মৌল বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত মনোভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পিসত্তা যে এক বলিষ্ঠ ট্রাজিক কল্পনার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, সেখানে শরৎচন্দ্রের শিল্পিস্বভাব তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের সমাপ্তি-অংশে এক ধরণের ভাবালু ইচ্ছাপূরণধর্মী মনো-ভাবের কৃত্রিম কোমলতায় আশ্বস্ত হতে চেয়েছে। বস্তুত উপন্যাসের সমাপ্তি সম্পর্কে তাঁর প্রকরণগত এই প্রবণতা থেকে তাঁর শিল্পিব্যক্তিত্বের মৌল পরিচয়টি অনেকখানি ফুটে ওঠে। প্রগতিচেতনা ও রক্ষণশীলতায় দ্বন্দ্বজনিত যে-দ্বিধা শরৎচন্দ্রের শিল্পিস্বভাবের একটি মৌলিক লক্ষণ, সেই প্রাচীন ও আধুনিকপন্থার মিশ্রণজাত দ্বিধা-লক্ষণ ফুটে উঠেছে তাঁর উপন্যাসের গঠনশিল্পেও। সেই

দ্বিধান্বিত শিল্পিসত্তাই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে অসঙ্গতভাবে বহু চমকপ্রদ নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টির দ্বারা জোর করে ঘটনা ও চরিত্রের মোড় ফেরাতে চেয়েছে (এই প্রসঙ্গ নিয়ে আগেই বলেছি), আবার সেই সত্তাই উপন্যাসের আরম্ভের সঙ্গে সমাপ্তির সুষ্ঠু স্বাভাবিক সামঞ্জস্য সাধনে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। আরম্ভে যে জটিল সমস্যা-সচেতনতা বা প্রগতিশীল সমাজদৃষ্টির আভাস ফুটে ওঠে, শেষ পর্যন্ত স্থিতাবস্থার প্রতি চিত্তের নিহিত আকর্ষণে প্রারম্ভের ওই দৃষ্টি থেকে সরে আসেন শরৎচন্দ্র। শেষ পর্যন্ত তাই সংরক্ষণশীল দৃষ্টির সঙ্গে প্রগতি-পন্থী চেতনার সংঘাতে যা অনিবার্য ছিল, উপন্যাস-শেষের সেই কঠিন ট্র্যাজিক পরিণামকে অনেকক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে পাল্‌টিয়ে ভিন্নমুখী করে দেন তিনি। সেক্ষেত্রে হয় তা মিলনান্তক, আর নয়তো বিয়োগ-বিচ্ছেদ এলেও তা ভাবুলতায় পাঠকের হৃদয়দ্রাবী—তা কখনই 'Stark' ও 'Stern reality' নয়। একথা মনে রেখেই সম্ভবত বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন—

"Saratchandra shocked, threatened...but rounded up everything in a nice neat comfortable bundle" [An Acre of Green Grass—pp 31]

অসামান্য জনপ্রিয়তার আকর্ষণে এভাবে 'round up' করতে গিয়ে শরৎ-চন্দ্র তাঁর অনেক উপন্যাসের শেষেই প্রকরণের দু'একটি কৃত্রিম বাঁধা ছক অনুসরণ করেছিলেন। এদের অন্যতম হ'ল, উপন্যাসের সমাপ্তিপর্বে নায়ক বা অন্য কোন তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্রের আকস্মিক পীড়া বা মৃত্যু ঘটিয়ে কাহিনী বা বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক জটিল সম্পর্কের গ্রন্থিমোচন-প্রয়াস। দৃষ্টান্ত হিসাবে অনেক গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। এদের মধ্যে বড়দিদি, পণ্ডিতমশাই, পল্লীসমাজ, চরিত্রহীন, দেনাপাওনা, গৃহদাহ উল্লেখযোগ্য।

৬

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের অবয়ব-সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে প্রকরণের ক্ষেত্রে তাঁর প্রথানুগত্য ও আধুনিক প্রবণতা নিয়ে কিছু বলেছি। প্রসঙ্গত এদের গুণাগুণ নিয়েও কিছু আলোচনা করেছি। কিন্তু আলোচনার এই পর্যায়ে এসে বলতে পারি যে, এই সমীক্ষা যত মূল্যবান্‌ই হ'ক, নিছক এ ধরণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার কোন ঔপন্যাসিক সম্পর্কে শেষ বিচার তো নয়ই, বোধহয় মুখ্য

বিচারের বিষয়ই নয়। আসল বিবেচ্য বিষয় হ'ল—যে-কর্ম ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন, সেটাই তাঁর বক্তব্য বিষয়ের অনিবার্য বাহন কিনা। তা প্রথানুসারী কি আধুনিক—সে বিবেচনা চরম কথা নয়। লাবকের সেই বিখ্যাত উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে—

"The best form is that which makes the most of its subject— there is no other definition of the meaning of form in fiction."

[The Craft Of Fiction. pp 40]

একথা ঠিক, শরৎচন্দ্র একধরণের ইচ্ছাপূরণমূলক ভাবালু-পরিণামী, হৃদয়দ্রাবী উপন্যাস রচনায় বিশেষ মনোযোগী ও সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। বস্তুত সারাজীবন তিনি মোটামুটি একই ধরণের আঙ্গিকে গড়া উপন্যাস-সৃষ্টির বাঁধা পথেই চলেছেন, তেমন কোন সুস্পষ্ট অভিনব প্রকরণ উদ্ভাবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রবাহকে যেমন প্রকরণের দিক থেকে একাধিক পর্বে বিভক্ত করা চলে, শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে বোধ হয় তা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ নূতন কালের বক্তব্যবাহী মনন-ধর্মী উপন্যাস রচনায় নূতন প্রকরণ বেছে নিয়েছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র 'শেষ প্রশ্নে' কিছুটা মনন ও তত্ত্বঘেঁষা উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করলেও আঙ্গিক সৃষ্টিতে তেমন কোন নূতনত্ব আনতে সচেষ্ট হ'ন নি। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করবো যে, উপন্যাসে নিজের মনোমত প্রকরণ-প্রয়োগের জন্য তাঁর চিত্তের গভীরে একটি গূঢ় আকাঙ্ক্ষা ছিল। তারই কিছুটা প্রকাশ ঘটেছে 'শ্রীকান্তে'।

ওই গ্রন্থের শ্রীকান্ত চরিত্র হয়ত পুরোপুরি তাঁর বিকল্প সত্তা নয়, এবং আগেই বলেছি যে, প্রথম দুই পর্বের 'আমি' চরিত্র যথার্থই উপন্যাসের উত্তম-পুরুষ নয়, তবুও নিশ্চয় বলা যায় যে, একমাত্র এই গ্রন্থেই শরৎচন্দ্র প্রকরণ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সহজ হয়েছেন, কারণ সবচেয়ে বেশি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পেরেছেন তিনি এই গ্রন্থেই। নিজের বহুল ব্যবহৃত প্রকরণ-ভঙ্গি থেকে প্রায় পুরোপুরি সরে এসেছেন তিনি এখানে। অন্তত এর প্রথম দুটি পর্বে কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে তেমন কোন কৃত্রিম সংযোগ চোখে পড়ে না। ইচ্ছাপূরণ বা ভাবালুতা সৃষ্টির জন্য কাহিনী বা চরিত্রের গতি-প্রকৃতি জোর করে এখানে নিয়ন্ত্রিত হয়নি। লেখকের শিল্পিসত্তা তাঁর বক্তব্যকে

এখানে একান্ত সহজ স্বাভাবিকভাবে ও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পেরেছে এক বিশেষ ধরণের আলগা বুনুনি-যুক্ত অবয়বের মাধ্যমে। শ্রীকান্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে ব্যবহৃত প্রকরণ শিল্পের দৃষ্টিতে নিখুঁত না হতে পারে, কিন্তু ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র বোধহয় এই একটি ক্ষেত্রেই নিজেব শিল্পস্বভাবের সবচেযে অনুকূল প্রকাশমাধ্যম খুঁজে পেযেছিলেন। এরই মধ্য দিযে তিনি তাঁর প্রকরণগত আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে কিছুটা যেন অগ্রসর হযেছিলেন। শেষ বযসে লেখা শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব সম্পর্কে একটি মন্তব্য থেকে এর আংশিক আভাস পাওযা যায়। ওই পর্ব সম্পর্কে দিলীপকুমার রাযকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

"এ সম্বন্ধে একটু নিজের কথা বলি। আমার অভিপ্রায ছিলো সাধারণ সহজ ঘটনা নিযে এ পর্বটা শেষ করবো এবং নানা দিকের থেকে অল্প কথায এবং সাহিত্যিক সংযমের মধ্য দিযে কতটুকু রস সৃষ্টি হয সেটা যাচাই করবো। উপাদান বা উপকরণের প্রাচুর্যে নয, ঘটনার অসামান্যতায নয, বরঞ্চ অতি সাধারণ পল্লী অঞ্চলের প্রাত্যহিক ব্যাপার নিযে এ বইটা শেষ হবে। বিস্তৃতি থাকবে না থাকবে গভীবতা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি নয, থাকবে শুধু ইঙ্গিত— শুধু রসিক যারা তাঁদের আনন্দের জন্য। [৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ সাল]

এর আগে নানা চিঠিপত্রে, প্রবন্ধে ও বিভিন্ন উপলক্ষে উপন্যাসের প্রকরণ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র অন্যকে যে সব উপদেশ-নির্দেশ দিযেছেন, এখানে যেন নিজেই তা প্রযোগ ও যাচাই করতে অগ্রসর হযেছেন। শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বে হযতো পূর্বোক্ত ইচ্ছাগুলি সম্যক্ রূপাযিত হয নি, কিন্তু বোধ হয এটাই তাঁব যথার্থ মনোমত প্রকরণ। কাবণ কেবল একেই তিনি প্রকৃত শিল্পরসিকের আনন্দজনক সৃষ্টিকৌশল বলে অভিহিত করেছেন। এবং কেবল এখানেই তাঁর পরীক্ষামূলক মনোভাবের পরিচয পাওযা যায (পূর্বোক্ত মন্তব্যে 'যাচাই' শব্দটি লক্ষণীয)। এই ইঙ্গিতবাহী, জীবনের-গভীর-তাৎপর্যসঞ্চারী সহজ সংযত শিল্পাধারই শরৎচন্দ্র বোধ হয সাবাজীবন ধরে সন্ধান করে ফিরেছেন—যদিও দুঃখের সঙ্গে স্বীকার কবতেই হয যে, সেরকম একটি আধার সৃষ্টির পরমাসিদ্ধি চিরদিনই তাঁর আযত্তের বাইরে থেকে গেছে।

উপন্যাসের অবযব সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরমাসিদ্ধিলাভ না হ'ক, তবু পাঠকচিত্তে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের 'কন্টেন্টে'র আধার হিসাবে প্রকরণের আবেদনকে কখনোই উপেক্ষা করা চলে না। অবশ্য সেই প্রকরণেরই চূড়ান্ত সংবেদন বোধ হয শেষ পর্যন্ত তাঁর কাহিনী-বিন্যাসের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ সৃষ্টিতেই।

ব্যালজাকের 'লা কমেডি হিউমেন' (La Comedie Humaine) সম্পর্কে কথিত মন্তব্যটি—'The reader is held by the pattern of events' শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে বোধ হয় আরেক অর্থে একান্ত সত্য হয়ে উঠেছে। সেই 'pattern of events' সৃষ্টিতে প্রকরণগত বিশুদ্ধি যদিও বার বার নানাভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং বহুক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ-কথিত ('ষোড়শী' প্রসঙ্গ স্মরণীয়) যথার্থ 'পার্সপেকটিভে'র অভাব যদিও সৎ পাঠকের শিল্পদৃষ্টিকে পীড়িত করে তোলে, তবু সব মিলিয়ে ফরস্টার যাকে বলেছেন 'বাউন্সিং' (Bouncing) কতকটা সেই ধরণের এক দুর্বার আকর্ষণী শক্তিতে শরৎ-চন্দ্রের জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির অবয়ব পাঠককে মুগ্ধ আবিষ্ট করে রাখে, সন্দেহ নেই।

শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য ও সমসাময়িক কাল

সাহিত্য-সৃষ্টির রহস্য যতই নিগূঢ় হ'ক, এর নেপথ্যলোকে দেশ-কালের অনিবার্য ভূমিকাকে বোধহয় কোনোমতেই অস্বীকার করা চলে না। স্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবন-চরিত কিংবা milieu ও moment-এর তাৎপর্যের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে সেণ্ট বাউভ বা টেইন-এর মতো মনস্বী সমালোচকরাই শুধু সৃজনশীল সত্তার ওপর সমকালের প্রভাবকে মেনে নেন নি, রবীন্দ্রনাথের মতো অসামান্য মৌলিক প্রতিভাদীপ্ত স্রষ্টাও যে কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর সেই যে বিশ্রুত উক্তি—'লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করে', মনে রাখতে হবে সেটি বিশেষভাবে একটি উপন্যাস প্রসঙ্গেই উচ্চারিত।

বস্তুত উপন্যাসের মধ্যেই সমাজের তথা জীবনের বাস্তবতার প্রতিফলন বোধহয় সর্বাধিক পরিস্ফুট, তাই কোনো ঔপন্যাসিক ও তাঁর সৃষ্টির যথার্থ পরিচয় পেতে হলে, তাঁর সমসামযিক কালকে আশ্রয় করে একটি প্রেক্ষাপট রচনা করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট চোখে পড়ে সমকাল তাঁর শিল্পিসত্তাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে এবং তাঁর রচনায় ওই কালের প্রতিফলন কতখানি। অবশ্য একথা বলা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন যে, নিছক সমকালীন জীবন-পরিবেশের একান্ত বাস্তবসম্মত প্রতিফলনের জোরেই কোনো উপন্যাসই শিল্পসিদ্ধিলাভ করতে পারে না, ঔপন্যাসিকের সমসাময়িক কাল তাঁর রচনার পরিবেশ, কাহিনী কিংবা চরিত্রের মধ্য দিয়ে যখন শুধু প্রতিফলিত নয়, শিল্পিত রূপান্তর লাভ ক'রে সমকালের সুনির্দিষ্ট সংকীর্ণ গণ্ডীর সীমা উত্তীর্ণ হযে যায়, তখনই সেই সৃষ্টি চিরায়ত মহিমা অর্জন করে।

এইসব প্রসঙ্গের প্রেক্ষিতে এবারে শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য-ভুবনে সমকালের ভূমিকা সম্পর্কিত পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওযা যেতে পারে।

২

শরৎ-সাহিত্যের সমসাময়িক কাল বলতে বলা বাহুল্য, মুখ্যত আমরা বুঝবো তাঁর সাহিত্য-স্থষ্টির সমকালকে। অর্থাৎ আপাত-বিচারে মোটামুটি-ভাবে 'বড়দিদি'র প্রকাশকাল (১৯১৩) থেকে মৃত্যুবৎসর অর্থাৎ ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু সাহিত্য স্থষ্টির কাল বিচার কখনই এমন গাণিতিকভাবে স্থনির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। কারণ 'বড়দিদি' ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হলেও 'ভারতী'-তে প্রকাশিত হয় ১৯০৭-এ। কিন্তু এটি প্রথম লেখা হয় ভাগলপুরে ১৯০১ সালের মধ্যে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে ১৯০১ সালের মধ্যে উত্তরকালে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের আরও কয়েকটি গল্প-উপন্যাস লেখা হয়। যেমন, দেবদাস, চন্দ্রনাথ, কাশীনাথ, অনুপমার প্রেম ইত্যাদি। স্থতরাং, সেদিক থেকে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য স্থষ্টির কাল বলতে বিশ শতকের প্রথম চার দশককেই হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে।

কিন্তু এই বাহ্য। শরৎ সাহিত্যের সমসাময়িক কালের সম্যক্ পরিচয় পেতে গেলে কেবল তাঁর রচনাকালটুকু গণনা করলেই যথেষ্ট হবে না, আরও পিছনে চলতে হবে, যেতে হবে উৎসের অভিমুখে। প্রথম জীবনের যে কালপর্বের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর সৃজনশীল সত্তার প্রথম উন্মেষ, প্রাথমিক প্রস্তুতি, সেই কাল-পর্যায়কে, উনিশ শতকের সেই শেষ পঁচিশ বছরকে (১৮৭৬-১৯০০) অবশ্যই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যস্থষ্টির সমসাময়িক কালের অঙ্গীভূত করতে হবে। কারণ প্রথমত, কোনো লেখকের সমকাল অর্থে, শুধু তাঁর রচনা-কালকেই বুঝবো না, তাঁর সেই সব রচনার উপকরণ সংগ্রহের কালকেও বুঝবো, বুঝবো তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ব্যাপক কালপাঠকে।

দ্বিতীয়ত, বাস্তববাদী লেখকেরও রচনায় তাঁর যে সমকাল প্রতিফলিত হয়, তা প্রায়শই একেবারে অব্যবহিত বর্তমান নয়, বরং কিছু দূরকালের পরি-প্রেক্ষিত। কারণ এই দূরত্বের প্রেক্ষণী না থাকলে প্রত্যহের তুচ্ছ অভিজ্ঞতার উত্তরণ ঘটে না শিল্পলোকে।

শরৎচন্দ্রের মতো বাস্তবজীবনবাদী কথাশিল্পির সমসাময়িক কালের বিচারে প্রবৃত্ত হতে গেলে গোড়াতেই একটি বিষয়ে অবহিত হতে হবে। বিষয়টি সকলেরই জানা, তথ্য হিসাবেও নতুন কিছু নয়। কিন্তু তবু একবার সেটি স্পষ্ট করে স্মরণ করতে অনুরোধ করি। বিষয়টি হ'ল, তাঁর জীবনগত

অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রগুলিকে সময়ের মাপে ভেঙে ভাগ করে নেওয়া। একথা সকলেরই জানা যে শরৎচন্দ্র আর পাঁচজন বাঙালীর মতো নিতান্ত সাধারণ স্থিতিশীল নীড়াশ্রয়ী গৃহস্থ ছিলেন না, তাঁর মনের মধ্যে চিরদিনই এক ভবঘুরে যাযাবর ছিল, যার প্রেরণায় তিনি আকৈশোর ভ্রাম্যমান পথিক। শরৎচন্দ্রের জীবন থেকে জানা যায় যে, সাতাশ বছর বয়সে (১৯০৩ খৃষ্টাব্দে) তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ব্রহ্মদেশে চলে যান এবং সেখানে প্রায় চোদ্দ বছর বাস করেন। এর অর্থ, তাঁর প্রথম জীবনের যে অংশটি তিনি স্বদেশে অতিবাহিত করেন, সেটি মুখ্যত উনিশ শতক। বিশ শতকের প্রায় গোড়া থেকেই স্বদেশের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ নিতান্ত শিথিল হয়ে পড়ে। সুতরাং একথা স্বীকার করতে হবে যে, এই বাস্তব-জীবনবাদী ঔপন্যাসিকের বাঙালী সমাজও জীবন-গত অভিজ্ঞতার একটা বড় অংশই উনিশ শতক থেকে সংগৃহীত। ব্রহ্মদেশে বসে যেসব গল্প উপন্যাস তিনি লিখেছেন, তার মধ্যে বাঙালী সমাজ-পরিবেশের যে ছবি এঁকেছেন, তার প্রায় সবটাই সেই উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ের বাঙালী গ্রামীণ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার স্মৃতি থেকে আহরণ-করা।

প্রসঙ্গত আর একটা কথা মনে করিয়ে দিই। চল্লিশ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে, যখন শরৎচন্দ্র স্থায়ীভাবে আবার স্বদেশে ফিরে এলেন, অন্তত তার আগে পর্যন্ত বাঙালী জীবনকে নিযে যা কিছু গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, তার প্রায় সবটাই উনিশ শতকের বাঙালী জীবন-পরিবেশের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা, সন্দেহ নেই। অবশ্য মনে রাখতে হবে, এই অভিজ্ঞতার অনেকটাই কিন্তু বাংলা-দেশের সমাজ থেকে পাওয়া নয়। তার কারণ শরৎচন্দ্রের বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবনের বেশীর ভাগই কেটেছে বাংলার বাইরে, বিহার অঞ্চলে—ডিহরী মজঃফরপুর ভাগলপুর ইত্যাদি স্থানে। বিশেষত, আঠারো থেকে ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত (১৮৯৪-১৯০২) শরৎচন্দ্র যখন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক, সামাজিক রীতি-নীতি ও সমস্যা সম্পর্কে যখন তিনি পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠেছেন, তখন তিনি প্রধানত ভাগলপুর-প্রবাসী। অবশ্য ভাগলপুরে তখন বহু বাঙালীর বাস; উনিশ শতকীয় বাংলা দেশের গ্রামীণ সমাজের এক সংক্ষিপ্ত রূপ ওই ভাগলপুরের বাঙালী সমাজ। কলহ, দলাদলি, রক্ষণশীলতা, প্রথানুগত্য, আবার তারি মধ্যে প্রগতিশীলতার স্ফুরণ—সব মিলিয়ে ভাগলপুরের প্রবাসী বাঙালী সমাজের ওই একান্ত সজীব পরিবেশ থেকেই সেদিনের তরুণ শরৎচন্দ্র

মুখ্যত বাংলায় সমাজজীবনের জটিল সমস্যা-ক্ষুব্ধ রূপের প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।

৩

শরৎচন্দ্রের সমগ্র ব্যক্তি-জীবন ও সাহিত্য সৃষ্টির কালপর্বকে বিশ্লেষণ করলে চোখে পড়ে মোটামুটি তিনটি পর্যায়। একটি, উনিশ শতকের অন্তিম পর্ব, অন্যটি বিশ শতকের প্রথম দুই দশক আর সব শেষেরটি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালপর্ব অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষ দুই দশক। বলা বাহুল্য, এই ভাগ গাণিতিক অর্থে সুনির্দিষ্ট নয়। কেবল আলোচনার সুবিধার জন্য শরৎচন্দ্রের জীবনকে কয়েকটি নির্দিষ্ট কাল-সীমায় বাঁধতে চেয়েছি। তবে একথা ঠিক যে, শরৎচন্দ্রের চিন্তা-চেতনা বা প্রবণতার সম্যক্ পরিচয় পেতে হ'লে কিংবা কথা-সাহিত্যে প্রতিফলিত তাঁর সমাজ-তথা জীবন-গত দৃষ্টিভঙ্গীর সামগ্রিক রূপটিকে স্পষ্ট করে বুঝতে গেলে কালের এই রূপান্তরের পটভূমিতে রেখেই তা বুঝতে হবে। কারণ শরৎচন্দ্র এই রূপান্তরমুখী সমকালের বহতা স্রোত থেকেই তাঁর সৃষ্টির উপকরণগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। তাই সমসাময়িক কাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল স্বতন্ত্র শিল্পসৃষ্টি হিসেবে এদের বিচার করতে গেলে সে বিচার শুধু খণ্ডিত অসম্পূর্ণ নয়, অনেকাংশে বিভ্রান্তিকরও হতে পারে।

আগেই বলেছি, শরৎচন্দ্রের বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবনের যে দিনগুলি স্বদেশে অতিবাহিত হয়েছে, সেগুলি বস্তুত উনিশ শতকের কালসীমায় বাঁধা। উনিশ শতকের বাংলা দেশের সমাজ-ভাবনায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যে রূপান্তর তথা 'নবজাগৃতি'র সূচনা হয়েছিল, তা বলা বাহুল্য বহুলাংশে নাগরিক জীবনের স্তরেই সীমিত ছিল। বাংলার গ্রামীণ সমাজ ও পরিবারের জীবন-বিন্যাস আবহমান মধ্যযুগীয় সংস্কার ও বিশ্বাসের সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণ তাল মিলিয়েই চলেছিল। শরৎচন্দ্রের প্রথমদিকের উপন্যাসে-গল্পে এই সমাজেরই বিশ্বস্ত চিত্ররূপ ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই। উনিশ শতকে শহর কলকাতার শিক্ষিত নাগরিক সমাজে যখন চলেছে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন, কৌলীন্য প্রথা, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মত প্রকাশের দৃপ্ত প্রয়াস, চলেছে স্ত্রী-শিক্ষা ও নারীর ব্যক্তি-স্বাধীনতার সপক্ষে জোরালো সমর্থন, বাংলা দেশের গ্রামীণ সমাজকে কিন্তু তখনও নবজাগৃতির এই সব তরঙ্গ-বেগ বস্তুত আদৌ তেমন স্পর্শ করছে না। তাই সেখানে কোন প্রতিবাদী স্বর জেগে ওঠে না, কেউ বিদ্রোহের মৃদু আভাসও বয়ে আনে না। পুরনো কালের স্রোত সেখানে

প্রায় স্থির জনড় সীমাবদ্ধ। এরই পরিচয় আছে 'বড়দিদি'র মাধবীর বাল-বিধবা-জীবনের নিরুপায় বেদনার ছবিতে, আছে 'দেবদাস' গল্পে পার্বতীর প্রায় প্রৌঢ় 'দোজবরে' ভুবন চৌধুরীকে নীরবে স্বামিত্বে বরণ করে নেবার কাহিনীতে, আছে 'বিরাজ-বৌ'-এ বিরাজের আপন জীবনের বিনিময়ে স্বামিভক্তি ও সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার দুঃসহ যন্ত্রণাবিদ্ধ আখ্যায়িকায় কিংবা 'পল্লীসমাজে'র আত্মকলহ-দলাদলি সংকীর্ণতায় জীর্ণ বিপর্যস্ত সমাজরূপের বর্ণনায়। বাংলা দেশের এই দীর্ঘকালব্যাপী প্রথানুযায়ী সামাজিক কাঠামোর নানান্ দিক, যা উনিশ শতকের গ্রামীণ সমাজেও প্রবলভাবে বর্তমান ছিল, তারই বিচিত্র ছবি এঁকেছেন শরৎচন্দ্র এই পর্যায়ের আরও অনেক রচনায়—চন্দ্রনাথ, মন্দির, অরক্ষণীয়া, বামুনের মেয়ে ইত্যাদিতে।

উনিশ শতকের গ্রামীণ সমাজ-জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র যে কেবল প্রথাবদ্ধ সমাজের হৃদয়হীন নিষ্ঠুর রূপকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা নয়, এই বাস্তবনিষ্ঠ জীবন-শিল্পী উনিশ শতকীয় সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে জীবনের অনেক সদর্থক ও শুভ রূপের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। সেই সব অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তাকে এই সমাজের প্রতি একধরণের মমতায় ও সংবেদনায় পূর্ণ করে তুলেছিল।

যে-সমাজ সম্পর্কে তিনি বলেছেন: 'যে সমাজ মড়া মরিলে কাঁধ দিতে আসে, আবার শ্রাদ্ধের সময় দলাদলি পাকায়, বিবাহে যে ঘটকালি করিয়া দেয়, অথচ বউভাতে হয়ত বাঁকিয়া বসে...উৎসব ব্যসনে যে সাহায্য করে, বিবাদও করে, যে সহস্র দোষত্রুটি সত্ত্বেও পূজনীয়' (সমাজধর্মের মূল্য)—সেই সমাজের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রথম পরিচয় উনিশ শতকেই। কেবল প্রাচীন কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান বলেই নয়, শরৎচন্দ্রের বাস্তব জীবন-বোধের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছিলো এই সমাজেরই আপাত-নিষ্ঠুরতার আড়ালে আরেক ছবি। সেখানে যৌথপরিবার-বদ্ধ মানুষগুলির কী আশ্চর্য সহনশীলতা, কী অমেয় স্নেহ, মমতা ও আত্মত্যাগ, সব মিলিয়ে তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের কী এক অম্লান মহিমা! নিষ্কৃতি, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি ইত্যাদি কাহিনী তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

পুরনো যুগের পারিবারিক-সামাজিক জীবনের মূল্যবোধের প্রতি শরৎচন্দ্রের মনের এই গূঢ় আকর্ষণ ও মমত্ববোধ তাঁর সত্তার এত গভীরে নিহিত, সে সারাজীবন ধরে এই সব ক্রমক্ষীয়মান মূল্যবোধের প্রতি "একধরণের

'নষ্ট্যালজিক' মধুর বেদনারসে তাঁর চিত্ত পরিপূর্ণ ছিল। উত্তরকালে সমাজ ও ব্যক্তি সম্পর্কে রূপান্তরমুখী নানান নূতন অভিজ্ঞতার ভিড়ের মধ্যেও শরৎচন্দ্র ওই সেকেলে ধরণের সমাজরূপের ছবিটি ভুলে যান নি। বরং জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে—সমাজ-উৎপীড়িত নারী-পুরুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় উজ্জ্বল অনেক ছবি আঁকা যখন শেষ হয়েছে, তখনও সেই ১৯৩৫-খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি উপন্যাসে (বিপ্রদাস) দেখি, তীক্ষ্ণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-সমুজ্জ্বল আত্মসম্মানবোধ-দৃপ্ত নায়িকা শেষ পর্যন্ত প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছে প্রাচীনপন্থী আচারপরায়ণ এক পরিবারের রক্ষণশীল জীবনচর্যার প্রতি। অর্থাৎ এক বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে আরেক বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত যে কালপর্ব, যে কাল আধুনিক বিশ্বের বিচিত্র পরিবর্তমান ভাব ও ভাবনা, প্রত্যয় ও প্রবণতার আবর্তে চঞ্চল বিক্ষুব্ধ, সেই পর্বের শিল্পস্রষ্টা হয়েও শরৎ-চন্দ্রের সত্তার কোন এক গোপন প্রকোষ্ঠে সুরক্ষিত ও অচল-প্রতিষ্ঠ ছিল উন-বিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ-পরিবারের কয়েকটি সনাতন মূল্যবোধ।

প্রসঙ্গত আরেকটি কথা। শরৎচন্দ্রের শিল্পিসত্তায় উনিশ শতকীয় যে জীবন প্রত্যয় ও মূল্যবোধ সঞ্চারিত হয়েছিল, তা নিশ্চয় মুখ্যত জীবন থেকেই আহরণ করা। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে, সমকালীন সাহিত্য থেকেও, বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, যা ওই কালের, ওই যুগমানসেরই এক পরমা শিল্পপ্রতিমা, তা থেকেও শরৎ-চেতনায় একধরণের জোরালো অভিঘাত সৃষ্ট হয়েছিল। বস্তুত শরৎচন্দ্রের কৈশোর ও প্রথম যৌবনকাল বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়াতলে আচ্ছন্ন। শরৎচন্দ্র নিজেই সেই কৈশোর-স্মৃতি স্মরণ করে বলেছেন, "এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস-সাহিত্য এর পরেও যে কিছু আছে, তখন ভাবতেও পারতাম না। পড়ে পড়ে বই-গুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়। লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।" (জয়ন্তী উৎসর্গ, পৌষ, ১৩৩৮)

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের 'অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা' হয়ত 'বোঝা', 'কাশীনাথ' ইত্যাদি স্বল্পসংখ্যক রচনাতেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রথম পর্বের অন্যান্য রচনাতেই শুধু নয়, সমগ্র জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনায় তথা সমাজ-ও জীবন-গত দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্রের একধরণের প্রভাব অনুভব করা যায় না কি?

বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক-সামাজিক উপন্যাসের প্রভাব শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের সচেতন স্তর অতিক্রম করে অবচেতনায় গিয়ে স্থির প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, বলা চলে। তাই ভাগলপুর-পর্বে রচিত গল্প-উপন্যাসেই নয়, ব্রহ্ম-প্রবাস-পর্বে, এমন কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে রচিত কথাসাহিত্যে-ও—যেখানে তাঁর সৃষ্ট নরনারীর ব্যক্তিত্বের স্বকীয়তা যথেষ্ট সোচ্চার, সেখানেও কোন কোন চরিত্রকে আশ্রয় করে ভেসে আসে, হয়ত বা কিছুটা অস্ফুটভাবে, বঙ্কিমের কালের কণ্ঠস্বর। বিরাজ-বৌ, স্বামী, চরিত্রহীন (উপেন্দ্র-সুরবালা-উপাখ্যান) গৃহদাহ (মৃণাল-কাহিনী) ইত্যাদি রচনা এর সাক্ষ্য বহন করছে। দাম্পত্য তথা পারিবারিক জীবনের আদর্শ ও মহিমায় যে অবিচল আস্থা, সামাজিক সংহতি রক্ষার জন্য ব্যক্তির বিশেষত নারীর চাওয়া-পাওয়ার সীমাকে প্রয়োজনবোধে সঙ্কুচিত করার ও নৈতিক বিশুদ্ধি রক্ষার যে ঐকান্তিক আগ্রহ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পরিস্ফুট হয়েছে, শরৎচন্দ্র সেই প্রত্যয়গত উত্তরাধিকার থেকে একেবারে বঞ্চিত নন, একথা অসংশয়ে বলা চলে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিসত্তায় উনিশ শতকের প্রভাবই চরম ও চূড়ান্ত নয় নিশ্চয়। সেখানে সময়ের স্রোত নিয়ে এসেছে উত্তরকালের অনেক নতুন ভাব ও ভাবনা, প্রত্যয় ও প্রবণতা। তাঁর বিবর্তমান চেতনায় ক্রমেই দেখা দিয়েছে নতুন শতাব্দীর আলোকিত উদ্ভাসন। উনিশ শতকের শেষ প্রহরগুলিতে সেই নতুন দিগন্তের পূর্বাভাস ফুটে উঠেছে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিসত্তায়, তাঁর জীবনগত অভিজ্ঞতায়।

কিশোর শরৎচন্দ্র ছিলেন বঙ্কিম-সাহিত্যের 'অন্ধ' অনুরাগী পাঠক। বঙ্কিমচন্দ্রের যে-বছর মৃত্যু হ'ল, সেই ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র টি, এন, জুবিলী কলেজে ঢুকলেন ছাত্র হিসেবে। স্কুলের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্রকে যে দৃষ্টিতে দেখেছিল, কলেজের পরিণতমনস্ক ছাত্রের দৃষ্টি তা থেকে কিছু অন্যরকম হয়ে গেল। কলেজী ছাত্রের মনে হল, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিণীকে গুলি করে মারা খুবই অসঙ্গত ঘটনা, কিংবা বিষবৃক্ষে নিরীহ ভালোমানুষ কুন্দকে বিবাহ করার পর তার প্রতি 'চকিতে নির্বিকার' হওয়া নগেন্দ্রনাথের পক্ষে অবশ্যই অমানুষের কাজ (দ্রঃ শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য—সৌরেন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৯)। প্রায় তিরিশ বছর পরে বিশ শতকের তৃতীয় দশকে যে নিবন্ধে ('সাহিত্য ও নীতি') শরৎচন্দ্র রোহিণীর মৃত্যুকে 'আর্টে'র মৃত্যু ব'লে সিদ্ধান্ত করেছেন,

বস্তুত তার বীজ উপ্ত হয়েছিল সেদিনই, সেই উনিশ শতকের শেষ পর্বে, শরৎ-চন্দ্রের পক্ষে যা ছিল, 'age of transition'।

একালে লেখা কিংবা একালের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা গল্প-উপন্যাসে এই যুগসন্ধি-কালের ভাবনা ও প্রবণতার ছবি সহজেই চোখে পড়ে। উনিশ শতকের চেতনার ভূখণ্ডে আধুনিক কালের নানান্ প্রবণতা অঙ্কুরিত হতে থাকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বিশেষত নারীর, এক বিশেষ ভূমিকা পেয়েছিল একালের মনন-চিন্তায়। কিন্তু তখনও সমাজ-সত্তার বিশাল ছায়ার নীচে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ছবি একরকম ঝাপসা হয়েই ছিল। তার স্বীকৃতি ছিল অনেকাংশে বুদ্ধির জগতে, বাস্তব জীবনে তার প্রয়াস ছিল নানা বিধি-নিষেধে সীমিত। কিন্তু শতাব্দী যতই শেষ হয়ে আসতে লাগল, ততই ক্রমে অনাগত বিশ শতকের নানারঙের ভাব ও ভাবনার ঢেউ ওই পুরনো যুগের প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকল। এই ভাবসন্ধির অনতিস্ফুট রূপচিত্র ফুটেছে শরৎচন্দ্রের একালের রচনায়। তাই দেখতে পাই, বড়দিদি, চন্দ্রনাথ, দেবদাস—সর্বত্রই সামাজিক 'স্থিতাবস্থা' মেনে চলার ইচ্ছার পাশাপাশি বর্তমান রয়েছে সমাজ-যন্ত্রের অমানবিক নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে লেখকের অনতিপ্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ-স্পৃহা। আবার এই স্মার্ত রঘুনন্দন-নিয়ন্ত্রিত সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই আত্মপ্রকাশের ভাষা খুঁজে মরছে বিধবা মাধবীর ব্যক্তিসত্তার রুদ্ধ গহনলোকে অঙ্কুরিত আর্ত প্রণয়-বাসনা।

উনিশ শতক তথা বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজদৃষ্টির অমোঘ প্রভাবকে মেনে নিয়েও তা থেকে উত্তরণের প্রয়াস স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ফুটে উঠছে শরৎচন্দ্রের একালের রচনায়—যুগসন্ধির খরস্রোতের অনিবার্য টানে।

৪

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বলতে গেলে, বিশ শতকের গোড়াতেই শরৎচন্দ্র চলে গেলেন ব্রহ্মদেশে। ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনস্রোতে যখন ক্রমশ রূপান্তরের তীব্র আবর্ত ফেনিল হয়ে উঠছে, ঠিক তখনই শরৎচন্দ্র সেই প্রবাহ থেকে সরে গেলেন। সমাজের যান্ত্রিক নিষ্ঠুর পেষণ থেকে যখন ক্রমেই ব্যক্তির বন্ধন মোচন ঘটছে, একালের বাঙালী জীবন যখন ক্রমশ যুক্তি ও ব্যক্তিত্বের স্বকীয়তার স্পর্শে সজীবতা ও স্ফূর্তি লাভ করতে শুরু করছে, অর্থাৎ আধুনিকতার দীপ্তি যখন দিনে দিনে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে, তখনই শরৎচন্দ্র দেশ ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন। কিন্তু এর অর্থ এমন নয় যে, তাঁর মনে

স্বদেশ-সম্পর্কিত কাল-প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে গেল। বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর চেতনা কেবল উনিশ শতকে কিংবা বড় জোর, দুই শতকের সন্ধি-প্রহরেই সীমিত হয়ে রইল, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। স্বদেশের ক্রম-স্ফুটমান 'আধুনিক' চেতনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অকস্মাৎ সরে যাওয়ার ফলে কেবল বিগত শতাব্দীর সমাজকেন্দ্রিক জীবনবোধের সংকীর্ণ কক্ষপথে তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে রইল, তা নিশ্চয় নয়। শরৎচন্দ্রের ভিতরকার বন্ধন-অসহিষ্ণু, মুক্তি-পিপাসু মানুষটি ব্রহ্মদেশে গিয়েও আপন সত্তাকে আধুনিক কালের উপযোগী রসদ যুগিয়ে চলেছিল। মুখ্যত দু'দিক থেকে এটা ঘটে-ছিল। প্রথমত, ব্রহ্মদেশের তৎকালীন জীবনযাত্রায় সমাজ-বন্ধনের তথা সামাজিক বিধি-নিষেধের শৈথিল্য ব্যক্তির জীবনকে এনে দিয়েছিল স্বাতন্ত্র্যধর্মী মনুষ্যত্ব-বিকাশের সম্ভাবনা। শরৎচন্দ্রের 'আধুনিক' প্রগতিবাদী সত্তার কাছে সেদিন এই অভিজ্ঞতার তাৎপর্য ছিল অমোঘ। শরৎচন্দ্রের উত্তরকালের রচনায় নারীর বন্ধন-অসহিষ্ণু ব্যক্তিত্ব-সচেতন রূপের যে পরিচয় ফুটে উঠেছিল, তার নেপথ্যে ব্রহ্মদেশের ওই বাস্তব অভিজ্ঞতার যে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'স্বরাজ সাধনায় নারী' নিবন্ধে শরৎচন্দ্রের একাধিক উক্তি থেকে আমাদের এই মন্তব্যের সমর্থন মিলবে। এবারে দ্বিতীয় দিকটি। বিশ শতকের বাংলাদেশের দৈনন্দিন জীবনচর্যার সঙ্গে সংযোগ হারিয়েছিলেন ব্রহ্মপ্রবাসী শরৎচন্দ্র, একথা ঠিক, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও সত্য যে বাংলা সাহিত্য, যা বাঙালী জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্পণ, সেই সাহিত্যের সর্বাধুনিক ধারার সঙ্গে প্রবাসী শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়নি। বিদেশে বসেই সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাদির সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য যথাসম্ভব সচেষ্ট ছিলেন তিনি।

এভাবেই বিশ শতকের বাঙালী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশী, সেই রবীন্দ্রনাথের রচনার অন্তঃশীলা আধুনিক জীবন দৃষ্টি ও নতুন শিল্প-রীতির সঙ্গে তাঁর যোগ ব্যাহত হয় নি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের যে উপন্যাসটির প্রভাব তাঁর উপর সর্বাধিক, সেই 'চোখের বালি' যদিও ব্রহ্মদেশ যাত্রার আগেই সম্ভবত তিনি পড়ে ফেলেছিলেন, তবু মনে রাখতে হ'বে এটি বিশ শতকেরই ফসল (১৯০২)। আধুনিক মানুষের ব্যক্তিহৃদয়ের এমন গূঢ় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জটিল মনোবিশ্লেষণমূলক কাহিনী বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম। এরই সমসময়ে বেরিয়েছিল 'নষ্টনীড়'। বিশ শতকের অন্তশ্চেতনা যেন প্রত্যক্ষ সজীব হয়ে

উঠল এইসব রচনায়। নরনারীর জীবনকে কেবল সমাজ-কল্যাণের সংকীর্ণ চোখে না দেখে; ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়াস এর আগে আর বাংলা উপন্যাসে চোখে পড়ে নি। আর শুধু তাই নয়, উনিশ শতকের উপন্যাসে ঘটনার যে একটি প্রধান ভূমিকা ছিল, তাকে সরিয়ে, স্থূল ঘটনাগত সংঘর্ষের বদলে ব্যক্তির অন্তর্লোকের, তার মনোজীবনের ছবিকেই মুখ্য করে তুললেন, রবীন্দ্রনাথ।

'চোখের বালি' শরৎচন্দ্রের উপর অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই উপন্যাস-প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, "ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলবো না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরেব কল্পনাব ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে চায়, এর পূর্বে কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম।"

একেবারে প্রথম জীবনে শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের দ্বারা গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিলেন। পরে সেই অভিভব স্তিমিত হয়ে এল ক্রমশ। বিশ শতকের গোড়াতেই প্রকাশিত 'চোখের বালি' তাঁর দৃষ্টির সামনে উন্মোচন করল জীবন ও শিল্পের এক বিস্ময়কর জগৎ। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে নারীর ব্যক্তি-হৃদয়ের রুদ্ধ গোপন সত্য অপরূপ শিল্প-সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ শতকের জীবনদৃষ্টি শরৎচন্দ্রের সংবেদনশীল চিত্তে ক্রমেই স্ফুটতর হয়ে উঠল। 'দেয়ালের লিখন' নির্ভুলভাবে পাঠ করলেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের কাল থেকে পরিবর্তিত জীবন পরিবেশে ব্যক্তিকে গৌণ করে সমাজকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া যে আসলে সময়ের স্রোতের বিপরীত দিকেই চলা, এটা তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন। সমাজের নিয়ন্ত্রণ শক্তি যে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে, ব্যক্তির অনুভূতি ও ব্যক্তির স্বাধীনতাই যে আগামী দিনের সমস্ত কর্ম ও চিন্তার মূল্যায়নের মানদণ্ড, সে উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল।

বিশ শতকী জীবন-ভাবনার এই প্রতিফলন ঘটেছে ব্রহ্ম-প্রবাসী শরৎচন্দ্রের লেখা বিভিন্ন উপন্যাসে। যেমন, পল্লীসমাজ, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত (১ম ও ২য় পর্ব) এবং গৃহদাহ (যার অন্তত কিছু অংশ এই সময়ে লেখা)।

ব্যক্তিচেতনার বিকাশের বিরোধী যে অন্ধ যান্ত্রিক সমাজ-সত্তা, তার বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের যে প্রতিবাদের মনোভাব পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলিতে আত্মপ্রকাশ

করেছে তাতেই তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর নির্ভুল পরিচয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ব্যক্তিসত্তার ও সমাজসত্তার এই সংঘর্ষের ছবি ফুটে উঠেছে মুখ্যত নরনারীর প্রেম-চেতনাকে অবলম্বন করে। শরৎচন্দ্র বুঝেছিলেন, প্রেমের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি তার সমগ্রসত্তাকে, তার জীবনের প্রতি প্রবলতম তৃষ্ণাকে তাৎপর্যময় করে তুলতে পারে। আর সেই প্রেম-পিপাসা যেখানে চরিতার্থতা খুঁজে পায় না, নিষ্ঠুর সমাজসত্তা কিংবা আপন চিত্তের অন্ধ সংস্কারের প্রাচীরে যখন তা' প্রতিহত হতে থাকে বারবার, তখন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নরনারীর ব্যক্তিত্বের গভীরতম সংকট মুহূর্ত। ব্যক্তির এই আত্মিক-সঙ্কটের, তার আত্ম-প্রকাশের জন্য এই নিষ্ফল প্রয়াসের বেদনার রূপকার হিসাবেই শরৎচন্দ্রের আধুনিকতা। এই অর্থে তিনি আধুনিক কালের শিল্পী।

পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলিতে প্রেমচেতনাকে আশ্রয় করে ব্যক্তিত্বের এই গূঢ় সঙ্কট নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে, কোথাও তা হিন্দু বিধবার সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমে (পল্লীসমাজ), কোথাও বা বিবাহিতা সধবা নারীর পরকীয় প্রেমে (গৃহদাহ কিংবা শ্রীকান্তের অভয়া-আখ্যান), আবার কোথাও পতিতা নারীর দুর্মর প্রণয়-বাসনায় (সাবিত্রী-রাজলক্ষ্মী-আখ্যান)। প্রেমের এই রহস্য-রূপের নানা প্রকাশের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের আধুনিক যুগসম্মত ব্যক্তিত্বের স্বরূপটি যে ফুটে উঠতে পেরেছে, তার কারণ, এদের সকলেরই প্রেমের সমাজ-নিষিদ্ধ অবৈধ প্রবণতা। উনিশ শতকের যে দেশ-কালের অনিবার্য টানে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে রোহিণীর জীবন-পরিণাম 'মর্মান্তিক' হয়ে উঠেছিল, বিগত শতাব্দীর সেই কালসীমাকে অতিক্রম করে এসে শরৎচন্দ্র আধুনিক কালের চেতনাকে সোচ্চার করে তুললেন তাঁর বিশ শতকী উপন্যাসের অসামাজিক নায়িকাদের নিষিদ্ধ অথচ প্রগাঢ় প্রেম-বাসনার মধ্য দিয়ে।

বিশ শতকের গোড়াতেই (১৯০৩) শরৎচন্দ্র দেশ ছেড়ে দূর প্রবাসে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি থেকেছেন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত। এই সময়সীমার মধ্যে স্বদেশে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানান ঘটনার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠল প্রথমে অহিংস 'স্বদেশী' আন্দোলনমূলক ব্যাপক গণ-চেতনা এবং পরে তা থেকে যুবশক্তির হাতে রূপ নিল সহিংস সন্ত্রাসবাদ। সমগ্র বাংলাদেশের জীবনস্রোত বিপুল প্রাণবেগে চঞ্চল বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

কিন্তু ১৯১১-র, ডিসেম্বরে 'বঙ্গভঙ্গ' রহিত হবার ফলে সেই 'স্বদেশী' আন্দোলনের কূলছাপানো জোয়ারে অকস্মাৎ দেখা দিল ভাঁটার টান। দেশের যুবসমাজ যে ভাবাদর্শ ও কর্মের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিকে চেয়েছিল, তার গতি যেন হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে এল। যুবচিত্তে হতাশা ও ক্লান্তির ছায়া দীর্ঘতর হতে থাকল। আর স্বদেশের জীবনে তরঙ্গের এই বিচিত্র ওঠা-পড়ার মুহূর্তে একসময়ে আবির্ভূত হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। অন্যদিকে, বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সময়েই দেখা দিয়েছে মননধর্মী পত্রিকা 'সবুজপত্র'। বাঙালী যুবচিত্তের সেই হতাশা-ব্যর্থতাবোধের দিনগুলিতে ,সবুজপত্রকে আশ্রয় করে মননধর্মী বাঙালীর যৌবনদীপ্ত জীবনবোধ আত্মপ্রকাশের এক নূতন মাধ্যম খুঁজে পেয়েছিল সন্দেহ নেই। এছাড়া এই কালসীমায় বেরিয়েছে রবীন্দ্রনাথের বহু শ্রেষ্ঠ রচনা। কথাসাহিত্যের দিক থেকে স্মরণ করতে পারি, এ সময়েই বেরোয়' গোরা।' আর, সবুজপত্রের পৃষ্ঠায় 'চতুরঙ্গ' 'ঘরে বাইরে'।

স্বদেশের সমকালীন এই সব ঘটনা সুদূর ব্রহ্মপ্রবাসী শরৎচন্দ্রের জীবন ও তৎকালীন সাহিত্য সৃষ্টির উপর বিশেষভাবে কোনো প্রত্যক্ষ অভিঘাত যদি সঞ্চার করতে না পেরে থাকে, তাতে বিস্মিত হবার নিশ্চয় কিছু নেই। যদিও সাধারণভাবে বিশ শতকী আধুনিকতার চেতনা শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মপ্রবাসকালীন রচনায় নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেকথা আগেই বলেছি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শরৎচন্দ্র সুযোগ পেলেন আপন ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য-সৃষ্টির ধারাকে স্বদেশের নানামুখী ঘটনা ও ভাবপ্রবাহের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করার। ১৯১৬-র এপ্রিলে তিনি স্থায়ীভাবে ফিরে এলেন বাংলাদেশে। স্বদেশে ফিরে এসে, সেখানকার নানা রূপান্তরমুখী ঘটনাপ্রবাহ ও চিন্তা-চেতনার আবর্তের মধ্যে যখন তিনি অনিবার্যভাবে এসে দাঁড়ালেন, তখনকার চারপাশের জীবনের সেই বিক্ষুব্ধ বাতাবরণের প্রত্যক্ষ প্রভাবে তাঁর সৃষ্টির জগৎ কতটা আলোড়িত হল, এ প্রশ্ন সহজেই মনে জাগতে পারে।

১৯১৬-তে দেশে ফিরে শরৎচন্দ্র স্বদেশী-আন্দোলন-উত্তর বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ করলেন। এরপর ক্রমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'তে শুরু করল। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূল ঘটনার কঠিন আঘাতে বাঙালী মধ্যবিত্ত-সমাজ, বিশেষত যুবসমাজের বিভ্রান্তি দিনে দিনে তীব্রতর হয়ে উঠল। এক ধরণের হতাশা,

অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা এবং সব মিলিয়ে প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা যুবচিত্তকে তখন ক্রমশই বিহ্বল করে তুলেছিল। রুশ বিপ্লবোত্তর সাম্যবাদী ভাবনা, ফ্রয়েড্-হ্যাভ্‌লক এলিসের রচনাবাহিত অবচেতনা-সংক্রান্ত প্রশ্ন, বিশেষত যৌন-জিজ্ঞাসা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুবমানসকে সেদিন এক কঠিন আত্মসমীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

প্রেম সম্পর্কে মানুষের যে আবহমান রোম্যান্টিক ধারণা, যে দেহাতীত আদর্শের বোধ—তাকে বড়োরকম আঘাত দিল ফ্রয়েড্‌ এলিসের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি। অবচেতনার আবিষ্কারের ফলে এতদিনের প্রচলিত নীতিবোধের ক্ষেত্র, যা মুখ্যত নরনারীর সচেতন আচরণের উপর নির্ভরশীল, সেখানে যেন অরাজকতার সৃষ্টি হল। এককথায়, মানুষের ব্যক্তিত্বের স্বীকৃত স্বরূপটি বহুলাংশে বদলে গেল। আর এইসব চাঞ্চল্যকর তির্যক্ চিন্তা-চেতনা-উপলব্ধির উপকরণে গড়ে উঠল প্রথম যুদ্ধোত্তর কালের তরুণদের হাতে এক সাহিত্য-বোধ, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ কথিত এক 'leaning tower'। বিশের-দশকে দেখা দিলেন কল্লোল-কালিকলম-পর্বের নবীন কথাশিল্পীরা। বাংলা-কথাসাহিত্যে জেগে উঠল নতুন এক কালের কণ্ঠস্বর।

এখন প্রশ্ন, ১৯১৬-র পরবর্তী কালপর্বে রচিত শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসকে এই তাৎপর্যপূর্ণ বিক্ষুব্ধ সময়ের ঢেউ কি স্পর্শ করেছে?

অর্থাৎ বাংলা কথাসাহিত্যে যাকে বলা যায় 'অতি-আধুনিকতা', তারই সূচনা পর্বের—সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের তরুণদের চিন্তা-ভাবনা-প্রবণতার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের রচনায় নিহিত দৃষ্টিভঙ্গীর কি কোন সাযুজ্য আছে?

এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায়—কেবল ইতি বা নেতিবাচক ভঙ্গিতে যে দেওয়া সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য। মনে হয়, এর সঠিক জবাব মিলবে ওই দুয়ের মিশ্রণে।

শরৎচন্দ্র যখন স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য স্বদেশে ফিরে এলেন, তখন তাঁর বয়স চল্লিশ। বাংলা সাহিত্য-জগতে তখনও তিনি একরকম নবাগত হ'লেও (১৯১৩ তে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়), বয়সে আদৌ নবীন ন'ন। সুতরাং স্বদেশের এই ক্রান্তিকালের নানা নূতন চিন্তা-প্রবণতার যে অভিঘাত তরুণ কথাশিল্পীর রচনায় প্রকাশিত, তা এই দীর্ঘকালব্যাপী প্রবাসী প্রবীণ মানুষটির পরিণত জীবনদৃষ্টিতে বা তাঁর রচনায় তেমনভাবে হয়তো আশা করা যায় না। তবু শরৎচন্দ্রের মতো বাস্তবমুখী সংবেদনশীল শিল্পীর

চিত্ত যুগপ্রভাবে অবশ্যই স্পন্দিত হয়েছে। সেই প্রভাবের অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ—পথের দাবী (১৯২৬)। স্বাদেশিকতার যে প্রবল ভাবাবেগের আভাস ব্রহ্মপ্রবাসকালীন জীবনেই তিনি দূর থেকে পেয়েছেন, তাই পূর্ণায়ত রূপ নিয়েছে স্বদেশে ফিরে অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০) সঙ্গে প্রত্যক্ষ সক্রিয় সংযোগের মধ্য দিয়ে। 'পথের দাবী' শরৎচন্দ্রের সেই জাতীয়তাবোধের আদর্শ ও উত্তেজনা থেকেই জন্ম নিয়েছে। এই উপন্যাসের ঘটনার প্রধান অংশ যদিও ভারতবর্ষের বাইরেকার পটভূমিতে সংস্থাপিত, তবুও সন্দেহ নেই, এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন স্বদেশী সমাজের আদর্শবোধ ও দুঃখ-যন্ত্রণার এক সজীব ছবি ফুটে উঠেছে।

অবশ্য 'পথের দাবী'তে পরাধীন ভারতীয় যুবচিত্তের যে দুঃখ-বেদনা, প্রধানত তার মূলে ছিল বিদেশী শাসক গোষ্ঠির সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষ-জনিত বহিরঙ্গ ঘটনা ও পরিবেশ।

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের তরুণ সমাজের যে দুঃখ-যন্ত্রণা, তার সবটাই স্বাদেশিকতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ-জড়িত ছিল না। সে যন্ত্রণা আরও অন্তর্গূঢ় ও আত্মক্ষয়ী। সেই যন্ত্রণার মূলে ছিল প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি সংশয় এবং তা থেকে উদ্ভূত হতাশা ও অস্থিরতা। যুবচিত্তের এই সঙ্কটের ছবি শরৎচন্দ্রের এই কালের রচনায় একেবারে নেই একথা কখনই বলা যাবে না। 'চরিত্রহীনে'র (যদিও এটি ব্রহ্মদেশে লেখা) সতীশ ও বিশেষভাবে কিরণময়ী চরিত্রে, 'গৃহদাহ' (রেঙ্গুনে শুরু করা হলেও, নানা কারণে মনে হয় যে, খুব সম্ভবত এটি শেষ হয়েছিল স্বদেশে ফিরে এসে) উপন্যাসে সুরেশ ও বিশেষ ভাবে অচলার মধ্যে আধুনিক কালের অস্থিরতার যন্ত্রণা অভিব্যক্তিলাভ করেছে। সতীশ কিংবা সুরেশের মতো ধৈর্যহীন যুবকের চিত্তদর্পণে সমকালীন বাঙালী জীবনের প্রত্যয়হীনতার ছবিটিই মুখ্যত প্রতিফলিত হয়েছে। তবে এই কালপর্বের নিহিত আত্মক্ষয়ী নৈতিক সঙ্কটের ছবি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে কয়েকটি নারী চরিত্রের মধ্যে। এদের মধ্যে অচলা অন্যতম। অচলার বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিসত্তার জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে শরৎচন্দ্রের জীবনদৃষ্টির আধুনিকতা তথা সমকাল-চেতনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একই ব্যক্তির সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা ও প্রবল আকর্ষণের সহ-অবস্থান—যা সুরেশ সম্পর্কে অচলার মনোভাব, তা বস্তুত সমকালীন ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব-সঞ্জাত হওয়া অসম্ভব নয়। সুরেশ ও অচলার দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র আধুনিক

নারীকে একনিষ্ঠ প্রেমের স্বর্গলোক থেকে ভ্রষ্ট করেছেন আর তার মধ্য দিয়ে তীব্র সংশয় জাগিয়ে তুলেছেন প্রচলিত নৈতিক মূল্যবোধের' স্থিতাবস্থা'র বিরুদ্ধে। এই সংশয় ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উগ্র প্রতিবাদের রূপ নিয়েছে 'গৃহদাহে'র সমকালীন কিংবা আরও পরবর্তী পর্যায়ের রচনায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'শ্রীকান্ত' ২য় পর্বের অভয়া কিংবা 'শেষপ্রশ্নে'র কমল চরিত্রের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বিশ কিংবা ত্রিশের দশকের তরুণ লেখক গোষ্ঠি-অঙ্কিত যে সব চরিত্রের মধ্য দিয়ে সামাজিক বিধি-নিষেধের আতিশয্য-বিরোধী এক বিদ্রোহ-চেতনা মাথা তুলছিল, স্বাতন্ত্র্যবাদিনী কমলের সঙ্গে তাদের 'স-হৃদয়' না হলেও মননগত সাযুজ্য অবশ্যই ছিল।

শরৎ-সাহিত্যে নরনারীর নৈতিক সঙ্কটের ছবি নানা রঙে ফুটে উঠেছে, কিন্তু সমাজের অর্থনৈতিক দিকটা তাঁর সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বাস্তব সমস্যারূপে তেমন উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব পায় নি। অথচ আধুনিক বাস্তব জীবনধর্মী কথা-সাহিত্যে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা ক্রমশই এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে-গল্পে এদিকটি অপরিস্ফুট থাকলেও শরৎচন্দ্র তাঁর ব্রহ্ম-প্রবাস-উত্তর কথাসাহিত্যে অর্থ নৈতিক সমস্যা-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। 'মহেশ' গল্পের (১৯২২) অর্থ নৈতিক বৈষম্য-পীড়িত দরিদ্র বঞ্চিত মানুষের চোখের জল 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে (১৯২৩) ষোড়শীর প্রেরণায় এক সংঘবদ্ধ সংগ্রামী জনতার বহ্নিজ্বালায় রূপান্তরিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের এই মনোভাব মার্ক্সীয় সাম্যবাদ কিংবা রাশিয়ায় সদ্যোসমাপ্ত বিপ্লবের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল কিনা জানিনে, তবে এটুকু মানা যায় যে, এই সময় সমাজতান্ত্রিক চেতনা তাঁর মনে ক্রমেই দানা বাঁধছিল এবং 'বাংলাদেশে প্রথম সোস্যালিষ্ট নিউক্লিয়াস...তিনিই সৃষ্টি করে দেন।' (শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন', পৃঃ ৭৭)

বিশ ও ত্রিশের দশকের বাঙালীর জীবনদৃষ্টিতে যে রূপান্তরের আভাস ফুটে উঠেছিল, তা শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে যেটুকু প্রভাব রেখে গেছে তার কথা বললাম। কিন্তু এবারে দেখবো, শরৎচন্দ্র কোথায় কতখানি এই বিশেষ কালের প্রবণতা থেকে দূরে সরে থেকেছেন। অর্থাৎ এই কাল সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি কতটা নেতিমূলক।

এতক্ষণ শরৎচন্দ্রের উপর যুদ্ধোত্তর কালের যে সব চিন্তা-চেতনার অভিঘাত নিয়ে আলোচনা করলাম, সেগুলি মুখ্যত নগরকেন্দ্রিক (ব্যতিক্রম অবশ্য

আছে)। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্য-সৃষ্টির ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর দৃষ্টি প্রথম থেকেই গ্রামমুখী, যে গ্রামকে আশ্রয় করে বাঙালীর সনাতন সমাজ-ব্যবস্থা রূপ পেয়েছে। এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের পরেও সেই দৃষ্টির তেমন মৌল রূপান্তর ঘটে নি। এর মূলে আছে তাঁর শিল্পিব্যক্তিত্বের স্বকীয় প্রবণতা। তাঁর মানস দৃষ্টির সামনে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের রস ও রহস্য, গ্রামীণ সমাজের দুঃখ-সমস্যাই অধিক মাত্রায় উদ্ঘাটিত। তাই বিশ শতকী তথা যুদ্ধোত্তর কালের প্রভাব হিসাবে তাঁর রচনায় ব্যক্তিচেতনার আত্মপ্রকাশের কথা যতই বলিনা কেন, তা কখনই এই পর্বের কল্লোল-গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের 'স্পর্ধিত' ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নয়। সমাজের প্রভাবকে অস্বীকার ত' নয়ই, এমনকি দুর্বল করেও শরৎচন্দ্র ব্যক্তির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে পারেন নি। আর এর ফলেই, বিশ ত্রিশের দশকের তরুণদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাসের সমান্তরাল ধারায় বেরিয়েছে শরৎচন্দ্রের কৌলীন্যসমস্যামূলক উপন্যাস 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০), প্রাচীন রক্ষণশীল সামাজিক আদর্শ-নিষ্ঠ রচনা বিপ্রদাস (১৯৩৫)। শুধু তাই নয়, যে-'গৃহদাহ' উপন্যাসে আধুনিক নারীর আত্মক্ষয়ী দ্বন্দ্ব ও নৈতিক সঙ্কটের জটিলতার মধ্য দিয়ে অতি-আধুনিক কালের স্পর্শ পাই, সেখানেও দেখি নগরনন্দিনী অচলার ব্যক্তিকেন্দ্রিক অস্থিরতা ও আবহমান মূল্যবোধের প্রতি সংশয়ে পীড়িত ক্ষুব্ধ মূর্তির পাশে অটল সংযম ও অচঞ্চল আদর্শের মূর্তিমতী প্রতিমা পল্লীবালা মৃণাল। উপন্যাসের উপসংহারে, বিপর্যস্ত নিরাশ্রয় অচলাকে লেখক যে সনাতন মূল্যবোধের শান্ত নীড়ের আশ্রয়ের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন—তার অন্য নাম মৃণাল।

তাই বলতে পারি যে, শরৎচন্দ্র মুখ্যত যুদ্ধোত্তর কালের বুদ্ধিজীবী আত্ম-কেন্দ্রিক নরনারীর জটিল জীবন সমস্যার চিত্রকর ন'ন। তাঁর রচনায় এই জীবন-সমস্যার কিছু বাস্তব উপকরণ ইতস্ততঃ খণ্ডিত ভাবে ছড়িয়ে থাকলেও, তা কখনই তাঁর মূল জীবন-প্রত্যয় তথা শিল্প প্রেরণার মধ্যে সংহত হয়ে ওঠে নি। তাঁর কোন কোন রচনায় যেখানে এই অস্থিরতা, হতাশা দেখা দিয়েছে, বিশেষত নায়ক চরিত্রের মধ্যে (সতীশ, জীবানন্দ প্রভৃতি), সেখানেই চোখে পড়ে, এই অস্থিরতা থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রেমময়ী নায়িকা-হৃদয়ের সঞ্জীবনী সুধার জন্য নায়কদের তৃষিত বিক্ষুব্ধ চিত্তের ব্যাকুলতা। এর ফলে সে কাহিনীতে যুগ-প্রভাবিত হতাশা ও অস্থিরতার

স্বরূপটি নায়ক চরিত্রের মধ্য দিয়ে তেমনভাবে পরিস্ফুট হওয়ার অবকাশ পায় নি। কাহিনীটি শেষ পর্যন্ত নায়িকার আদর্শান্বিত প্রণয়-আখ্যানে রূপান্তরিত হয়েছে।

অন্যদিকে (আগেই বলেছি), আধুনিকা সংশয়-অস্থিরতায়-বিভ্রান্ত নায়িকার (অচলা-কিরণময়ীর) ছবির পাশেই ফুটে উঠেছে সনাতন পারিবারিক তথা সামাজিক মূল্যবোধের মূর্তিমতী প্রতিমা (মৃণাল, সুরবালা)। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ সমকালের ক্ষুব্ধ তরঙ্গবেগকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি, তার আঘাতে তাঁর শিল্পিসত্তার একাংশ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল ঠিকই। কিন্তু তা কখনই তাঁর সত্তার মর্মমূলে গভীরভাবে নাড়া দিতে পারে নি।

এসব দিক থেকে 'অতি আধুনিক' তরুণ কথাসাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে শরৎ-সাহিত্যের সাযুজ্যের বিশেষ অভাবই সূচিত হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আবার এও মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের প্রতিবাদ ক'রে 'অতি আধুনিক' তরুণ লেখকদের প্রবল সমর্থনে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' (বঙ্গবাণী, আশ্বিন, ১৩৩৪)। শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, 'আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এত বড় অবিচারে... আমার...বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।'

বস্তুত এই প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিযে সেদিনের এই বর্ষীয়ান্ সুপ্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক সমকালের নবীন সাহিত্যব্রতীদের চিন্তা-ভাবনা-উপলব্ধির সঙ্গে নিজেকে বহুলাংশে সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। তাদের লাঞ্ছনা, অসম্মানের দায়ভাগের অনেকখানি যেন নিজেও বহন করতে স্বেচ্ছায় এগিযে এসেছিলেন। এ থেকে শরৎচন্দ্রের শিল্পিসত্তার সমকাল-সচেতন তথা 'অতি আধুনিক' জীবনদৃষ্টির প্রতি সংবেদনশীলতার এক নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যায়।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, শরৎচন্দ্র অতি আধুনিক তথা 'কল্লোল'পন্থী তরুণ লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও তাঁদের রচিত সাহিত্যের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। একালের কথাসাহিত্যে ক্রমেই যে উগ্রতা, বিশেষত নরনারীর যৌন সম্পর্ক ও সমস্যা নিয়ে আতিশয্য প্রকাশ পাচ্ছিল, শরৎচন্দ্র নানা প্রসঙ্গে বরং তার নিন্দাই করেছেন। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় ও কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ ভৌমিককে লেখা যথাক্রমে ১০ই চৈত্র, ১৩৩৬ ও ২৪শে ভাদ্র, ১৩৪০-

এর চিঠি। অতি-আধুনিক কথাসাহিত্যের সামনে এ ব্যাপারে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপনের মনোভাব নিয়েই তিনি 'শেষপ্রশ্ন' লেখেন। দিলীপকুমার রায়কে (৪ঠা কার্তিক, ১৩৩৮) একটা চিঠিতে তিনি লিখছেন:

'শেষ প্রশ্ন পড়ে খুসি হয়েছ শুনে আনন্দ পেলাম। 'খুব করবো গর্জন করে নোঙরা কথাই লিখবো,' এই ধরণের মনোভাবটাই অতি আধুনিক সাহিত্যের central pivot নয়, এরই একটু নমুনা দেওয়া।'

উক্তিটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে একদিকে সমকালীন অতি-আধুনিক সাহিত্যধারার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মানসিক ব্যবধান, অন্য দিকে এই প্রবাহকে স্তব্ধ করে না দিয়ে তাকে সঠিক পথে চালিত করার আন্তরিক আগ্রহ। এদিক থেকে মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই।

৬

আলোচনা প্রায় শেষ হয়ে এলো। সমগ্র বিষয়কে মনের মধ্যে সংহত করে নিতে গিয়ে একটা কথাই বারবার বোধ হচ্ছে যে আপন রচনার ভিতর দিয়ে শরৎচন্দ্র কোথায় যেন একটা ভাবসঙ্কট ও স্ববিরোধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। 'রক্ষণশীল' সামাজিক আদর্শনিষ্ঠা ও 'প্রগতিশীল' ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-প্রবণতার পারস্পরিক টানাটানিতে শরৎচন্দ্রের হৃদয় যেন দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি যেন সারাজীবনেও এ সম্পর্কে মনস্থির করতে পারেন নি। আর বাহুল্য মনে হলেও এটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, শরৎচন্দ্রের মধ্যে এই যে ভাবসঙ্কট-গত স্ববিরোধ, এ' ত' আসলে তাঁর সত্তায় 'প্রাচীন' ও 'আধুনিক' এই দুই ভিন্নমুখী কালকে মেলাবার প্রয়াস থেকে উদ্ভূত এক অনিবার্য সঙ্কট।

শরৎচন্দ্র যে তাঁর সমসাময়িক দেশ-কালের সঙ্গে কত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিলেন, এই ভাবসঙ্কট তার এক নিশ্চিত নিদর্শন।

সবশেষে একটি প্রশ্ন। একটি মূল প্রশ্নকেই দু' দিক থেকে উপস্থাপিত করছি। একালের সচেতন পাঠকমাত্রেরই মনে শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে এই 'শেষ প্রশ্ন' অনিবার্যভাবে মনে জেগে ওঠে।

শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে যে সমসাময়িক কালের জীবনচিত্র, যে সমকালীন সামাজিক সমস্যা ও চিন্তা-চেতনা-মূল্যবোধের ছবি আছে, দিনবদলের স্বাভাবিক নিয়মে সেই সব সমস্যা-পরিবেশ ও মূল্যবোধেরও বিরাট রূপান্তর সাধিত হয়েছে। বিন্দুর ছেলে, নিষ্কৃতি-র সেই যৌথ পারিবারিক কাঠামো, বামুনের মেয়ে-র কৌলীন্যশাসিত নিষ্ঠুর সমাজ-পরিবেশ, বিভিন্ন উপন্যাসে

উপস্থাপিত পূর্বতন জাতিভেদ ও অকাল বৈধব্য-সমস্যার দুর্মোচ্য জটিল রূপ, সর্বোপরি ঐকান্তিক ভাবাবেগপ্রবণ হৃদয়বৃত্তি-নির্ভর মূল্যবোধ—এ সব-কিছুই সময়ের খরস্রোতের টানে ক্রমেই যেন ভেসে চলে যাচ্ছে। আজকের আত্মকেন্দ্রিক এবং আগেকার তুলনায় বহুলাংশে বিচ্ছিন্নতাধর্মী 'বৃত্ত'-নির্ভর জীবন-চেতনার চোখ দিয়ে দেখলে শরৎচন্দ্রের অনেক রচনাকেই এ যুগের পক্ষে তাৎপর্যহীন ও বিগতকালের ক্রমবিলীয়মান সামগ্রী বলে মনে হতে পারে।

নিবন্ধের আরম্ভে রবীন্দ্রনাথের যে মন্তব্যটি স্মরণ করেছিলাম, সেটি এখানে আরেকবার স্মরণ করতে পারি—'লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করে।' সুতরাং শরৎচন্দ্র তাঁর রচনায় তাঁর কালকে যে ব্যক্ত করেছেন, সেটা, বলাবাহুল্য, আদৌ অপ্রত্যাশিত বা অসঙ্গত নয়। এবং কাল যখন অনড় অচল বস্তু নয়, তখন তার পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। এখন প্রশ্ন যে, সেই পরিবর্তনের ফলে জীবন-পরিবেশে যে রূপান্তর আসে, সেই রূপান্তরিত পটভূমিতে ওই লেখকের আবেদন কি ক্রমেই হারিয়ে যায়? তখন ওই লেখকের অবমূল্যায়ন কি অনিবার্য? সবসময় নিশ্চয় নয়। টলস্টয় ডস্টয়েভস্কী কিংবা টমাস মান-এর মতো লেখকদের রচনা-বিধৃত কাল এবং সেই কালসীমায় বর্ণিত সমাজ-সম্পৃক্ত ও অন্যবিধ সমস্যা বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ব্রাদার্স কারামাজভ কিংবা রেজারেকশন-এর ফিউডাল সমাজ-পট কিংবা বাডেনব্রুক্‌স-এর পারিবারিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর আজ হয়তো বহুল রূপান্তর ঘটেছে। কিন্তু তবু এইসব রচনায় দেশকালাতিশায়ী যে মহৎ জীবন-চেতনা নিহিত, মানব-সম্পর্কের তথা মানব ভাগ্যের যে চিরন্তন আবেদন সেখানে সঞ্চারিত—তার ফলে এরা নিছক সমসাময়িক কালের সীমায় খণ্ডিত হয়ে থাকে নি। কেবল পূর্বোক্ত বিদেশী লেখকদের রচনাতেই নয়, আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের অনেক উপন্যাসেও আমরা সমকালের ঊর্ধ্বে নরনারীর জীবনের যে চিরকালীন সমস্যা ও উপলব্ধি, তার মুখোমুখি হই।

প্রসঙ্গত জানাই যে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে হিন্দু-ব্রাহ্ম সম্পর্কের অথবা ব্রাহ্ম নরনারীর জীবনের কিছু চিত্র থাকলেও সেগুলি সব মিলিয়ে লেখকের সমকালীন কোন স্বতন্ত্র সামাজিক সমস্যা বা সমাজ-ভাবনার রূপ নেয়নি বলে, এই নিবন্ধে পৃথক্‌ভাবে আলোচিত হয় নি।

কিন্তু শরৎচন্দ্র-প্রসঙ্গে সেকথা কি অকুণ্ঠ চিত্তে আমরা মেনে নিতে পারি? তাঁর অধিকাংশ রচনার আবেদন কি সমসাময়িক কালের সমাজ-জাতি-ধর্ম ও সংস্কারের সীমাকে উত্তীর্ণ হবার মতো চিরায়ত জীবনবোধে স্পন্দিত?

এই বিতর্কিত প্রসঙ্গের প্রকৃত মীমাংসা হয়তো আজই হবে না। হয়তো অনাগত কালের গর্ভে এর যথার্থ উত্তর নিহিত আছে। সুতরাং আজকের এই বিতর্কের উত্তেজনায় শরৎচন্দ্রকে যেন তাঁর প্রাপ্য দাবী থেকে আমরা বঞ্চিত না করি। তাঁর সাহিত্যে সমসাময়িক কালের পরিস্ফুট রূপ ও প্রবণতার প্রকৃত মূল্য ও গুরুত্ব যেন আমরা অস্বীকার না করি। শরৎ-সাহিত্যে যে উনিশ শতক এবং বিশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের নানামুখী চিন্তা ও চেতনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিচয় ফুটে উঠেছে, তা থেকেই শরৎচন্দ্রের শিল্পিব্যক্তিত্বের সচলতা ও সজীবতার নিশ্চিত প্রমাণ মেলে। রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি এ সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য: 'তিনি (শরৎচন্দ্র) সম্পূর্ণভাবেই নিজের দেশের এবং কালের। এটা সহজ কথা নয়।...নিজের দেশকালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না' (চৈত্র, ১৩৪৪—ভারতবর্ষ)।—রবীন্দ্রনাথের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে শরৎ-সাহিত্যে সমকালের যথার্থ ভূমিকাটি সামান্য কয়েকটি কথায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

এবারে এই প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন। সমকালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যাওয়ার অর্থ কি আপন রচনায় সমকালের দাবীকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া? সে রকম প্রবণতার মধ্যেও কি যথার্থ মহৎ সাহিত্যের আসন থেকে বিচ্যুত হবার আশঙ্কা নিহিত নেই?

একথা সর্বজনবিদিত যে, বাঙালী পাঠক সমাজের এক সীমিত অংশ—তার মধ্যে কিছু রক্ষণশীল হিন্দু, যাঁদের মধ্যে 'চরিত্রহীন' 'created alarming sensation', এঁরা ছাড়া আর কিছু উগ্র নবীনপন্থী, আর হয়তো শরৎচন্দ্রের তথাকথিত ব্রাহ্ম-বিরোধিতায় বিরূপ কিছু গোঁড়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তি—এই অল্পসংখ্যক বিরোধী ছাড়া বাংলা সাহিত্যের বৃহৎ পাঠকসমাজ সেদিন শরৎচন্দ্রের প্রবল সমর্থক ও অন্ধ অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। দেশব্যাপী জনপ্রিয়তার বিপুল স্রোতের তরঙ্গ-শীর্ষে সেদিন শরৎচন্দ্র সমুন্নীত হয়েছিলেন, একথা এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। জনপ্রিয়তার কূলছাপানো জোয়ারের টানে বিহ্বল হয়ে কোন লেখকের পক্ষে অনেকক্ষেত্রে সমকালের

দাবীকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া তাই বোধহয় আদৌ অস্বাভাবিক নয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে শরৎচন্দ্রের একটি উক্তি: "সাহিত্যের বর্তমান কালটা যত বড় সত্য, ভবিষ্যৎ কালটা কিছুতেই ঠিক অত বড় সত্য নয়।'

স্রষ্টা হিসাবে অকপট সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েও তাই শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক সময়েই জনপ্রিয়তার অমোঘ আকর্ষণে এ ধরনের দুর্বলতা বা শিথিলতা প্রকাশ করেছেন কিনা তা' ভেবে দেখতে হবে। প্রত্যাশিত নির্মোহ জীবনদৃষ্টির বদলে মধ্যবিত্ত বাঙালী পাঠকচিত্তের তুষ্টির জন্য চরিত্রের বাস্তব সহজ গতিকে অনেকস্থলে ক্ষুণ্ণ করে মধ্যবিত্তসুলভ ভাবালুতা ও আদর্শবোধের অতিশয়িত ব্যবহার এবং প্রায় একই ধরনের জনপ্রিয় 'থীম' (theme), চরিত্র ইত্যাদির পুনরুক্তি-প্রবণতা—এই ধরণের অভিযোগ শরৎ-সাহিত্য-প্রসঙ্গে ইদানীং বিশেষভাবে শোনা যায়।

কিন্তু সমকালের দাবীর কাছে বাংলা সাহিত্যের এই জনপ্রিয় কথাশিল্পীর আত্মসমর্পণের অভিযোগ নতুন নয়। সম্ভবত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের লেখাতেই এই অভিযোগ সর্বপ্রথম একটি সুস্পষ্ট রূপ নেয়।

১৩৩৪ সালের ৪ঠা ফাল্গুন তারিখে 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ষোড়শী' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে একটি পত্রে লিখেছিলেন: 'সকল বড় সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত (perspective) সেটা দূরব্যাপী, সেইটির সঙ্গে পরিমাণ রক্ষা করতে পারলে তবেই সাহিত্য টিঁকে যায়—কাছের লোকের কলরব যখন দেয়াল হয়ে সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনে তাকে অবরুদ্ধ করে, তখন সে খর্ব হয়ে অসত্য হয়ে যায়।...তুমি উপস্থিতকালের কাছ থেকে দাম আদায় করে খুশি থাকতে পারো—কিন্তু সকল কালের জন্য কি রেখে যাবে?'

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কালের যথার্থ সম্পর্কটি চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করতে হলে শরৎসাহিত্যের পাঠকসমাজকে ওই গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়াতেই হবে শেষ পর্যন্ত।

বুদ্ধদেব বসু : কল্লোলের কথাকোবিদ

বুদ্ধদেব বসুর কথাসাহিত্যসৃষ্টির যে পর্বটি আমাদের আলোচ্য, সেটি তাঁর সমগ্র কথাশিল্পভুবনের এক সীমিত ভূখণ্ডমাত্র। এমন একটি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের সমীক্ষার মধ্য দিয়ে কোন লেখকের সমগ্র শিল্পজগতের পূর্ণাঙ্গ বিচার হয়ত সম্ভব নয়। বিশেষত বুদ্ধদেবের কথাসাহিত্যের এই প্রথম পর্যায়টি কথাশিল্পী হিসাবে হয়ত তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়ও বহন করে না। কিন্তু তবু এই পর্বটি পৃথক্‌ভাবে পর্যালোচনার বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে মনে করি।

বস্তুত এই পর্বটি বুদ্ধদেবের সাহিত্যসৃষ্টির সূচনাপর্ব। বিশের দশকে কল্লোল (ও প্রগতি) পত্রিকায় প্রকাশিত ইতস্তত: ছড়ানো কবিতা ও গল্পের মধ্য দিয়ে যে সৃষ্টির উৎসমুখ উন্মুক্ত হয়েছে, তিরিশের দশকে সেই প্রবাহই আপন স্বকীয়তায় অনন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 'বন্দীর বন্দনা' কিংবা 'শাপভ্রষ্ট' কবিতা প্রথম বেরোয় কল্লোলের পৃষ্ঠায়। আর সেই বহু-বিতর্কিত চাঞ্চল্যকর গল্প 'রজনী হ'ল উতলা', তারও প্রথম আবির্ভাব কল্লোলেই। অর্থাৎ কবি বা কথশিল্পী হিসাবে বুদ্ধদেবের ব্যক্তিত্বের যে মৌল প্রবণতা, তা তাঁর সারস্বত জীবনের একেবারে প্রথম পর্যায়েই নিশ্চিতভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আর সেই সুনিশ্চিত আত্মপ্রকাশের মুখ্য আশ্রয়রূপে সেদিন দেখা দিয়েছিল 'কল্লোল'।

২

কেবল কল্লোল-এর নিয়মিত লেখক হিসাবেই নয়, বুদ্ধদেব বসু গভীরতর অর্থে, কল্লোলগোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। 'An acre of Green Grass' গ্রন্থে তাঁর মতো স্বাতন্ত্র্যবাদী লেখকও স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে—'we, of the Kallol-clan' (১০ পৃ.) বলে বেশ গর্বের সঙ্গে আত্মপরিচয় দিয়েছেন।

কল্লোল-এর একেবারে সূচনাপর্ব থেকে বুদ্ধদেব অবশ্য এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশের প্রায় তিন বছর পরে বুদ্ধদেবের প্রথম লেখা বেরুলো কল্লোলে। সেটি গল্প নয়, কবিতা। কল্লোলের ১৩৩২,

অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রথম কবিতার মাধ্যমেই বুদ্ধদেব কল্লোল-এর ঘনিষ্ঠ মহলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন।

কল্লোল, পত্রিকার সঙ্গে লেখক হিসাবে তাঁর মুখ্য যোগ কবি হিসাবে। কারণ এই পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা নগণ্য—মাত্র চারটি। আর 'কল্লোলে' তাঁর কোন উপন্যাসই প্রকাশিত হয় নি

তবু আমরা তাঁকে কল্লোলের কথাকোবিদরূপে অভিহিত করেছি। বলা বাহুল্য, তা পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা-সংখ্যার বিচারে নয়। সে বিচারের মাপকাঠি স্বতন্ত্র। বস্তুত সেই বিচারের উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকের বাংলা সাহিত্যে কল্লোলের আবির্ভাব কেবল নিছক একটি পত্রিকারূপেই নয়, তা আরো বেশী কিছু দাবী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। বস্তুত কল্লোল এবং তার সমভাবাপন্ন অন্যান্য পত্রিকা, যেমন, কালি-কলম, প্রগতি, সংহতি ইত্যাদির তরুণ লেখকগোষ্ঠী তাঁদের রচনায় সেদিন জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কিছু অভিনব বক্তব্য ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমস্ত দিক থেকে প্রচলিত চিন্তাভাবনা ও চেতনা-প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে একটা প্রচণ্ড নাড়া দেবার উদ্যোগ করেছিলেন এই তরুণের দল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন কল্লোলগোষ্ঠীর আরও অনেক লেখকের মতই বুদ্ধদেবও নিতান্ত বালক। যদিও তাঁর শৈশব কৈশোর ও প্রথম যৌবন কেটেছে কলকাতার বাইরে, ঢাকায়, তবু সেখানেও সেই স্ফুটনোন্মুখ স্পর্শকাতর কিশোর-হৃদয়ের উপর যুদ্ধোত্তরকালের নানা মূল্যবোধজনিত অভিঘাত এসে পড়েছিল। একদিকে হতাশা সংশয় ও মূল্যবোধের বিপর্যয়জনিত যন্ত্রণা আরও অনেকের সঙ্গে বুদ্ধদেবের তরুণ মনকেও বিক্ষুব্ধ করে তুলল, অন্যদিকে আবার সেইকালের নিহিত দুর্মর রোম্যান্টিক প্রেরণা পুরনো জীর্ণ সবকিছু ভেঙে এক বিদ্রোহ-চেতনায় উচ্চকিত হয়ে উঠল। বাংলা ১৩৩০ সালে 'কল্লোল'-এর আবির্ভাব হয়েছিল তরুণ সমাজের এইসব নানামুখী চেতনা ও মননের অনিবার্য টানে। আর এইসব কারণেই 'কল্লোল' কেবল একটি মামুলী সাহিত্যপত্ররূপেই দেখা দেয় নি, তখনকার বাঙালী যুবসমাজের একাংশের কাছে মনন-চিন্তা অনুভূতির এক প্রাণবন্ত প্রতীকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বস্তুত কল্লোলকে ঘিরে যে জীবনগত ও সাহিত্যশিল্পগত প্রবণতাগুলি সেদিন রূপ লাভ করেছিল, সেইসব প্রবণতা বা চেতনা যাঁদের রচনাতেই পরিস্ফুট হয়েছিল, তাঁরাই 'কল্লোলপন্থী,' বলে চিহ্নিত হতে পারেন। আর সেই অর্থে, অর্থাৎ

গল্প-উপন্যাস প্রকাশের দাবীতে নয়, কল্লোলের অন্তর্গূঢ় প্রবণতার সাযুজ্যে তিরিশের দশকের বুদ্ধদেব কথাসাহিত্যিক হিসাবে যথার্থ কল্লোলপন্থী কিনা —সেটাই আমাদের অন্বেষণের সামগ্রী।

৩

যাকে আমরা কল্লোল-চেতনা বলছি, যে সব চেতনা-প্রবণতা এই শতকের বিশ ও তিরিশের দশকে বাংলাদেশে মুখ্যত 'কল্লোল'কে আশ্রয় করে একটি সজীব সহিত্য-আন্দোলনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিল, আত্মপ্রকাশ করেছিল তরুণ লেখকগোষ্ঠীর কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে,—সেইসব চেতনা-প্রবণতা অবশ্যই প্রধানত বিশেষ এক দেশ-কালের অনিবার্য সৃষ্টি। বুদ্ধদেব বসুর কথাসাহিত্য-সৃষ্টির প্রেক্ষাপটেও সেই দেশ-কালের সক্রিয় অপরিহার্য ভূমিকাটিকে মনে রাখতে হবে। অবশ্য বাহুল্য হলেও, ভুল বোঝার আশঙ্কা আছে বলেই, জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে, যে-কোন সত্যকার সৃজনশীল লেখকের মতই বুদ্ধদেব নিছক দেশ-কালের কয়েকটি উপকরণ-সম্ভব লেখক ন'ন, সৃষ্টির গূঢ় রহস্যময় নিভৃতলোকে সেইসব উপকরণ যেখানে আশ্চর্য রূপান্তর লাভ করে, সেখানে কোন দেশ-কাল, কোন সাহিত্য-আন্দোলন-সঞ্জাত চেতনা-প্রবণতার ভূমিকা একান্ত হতে পারে না। বুদ্ধদেবের তিরিশের দশকের উপন্যাস-গল্প আমাদের আলোচনার বিষয়। সেইসব রচনায় হয়ত এমন কিছু প্রবণতা চোখে পড়বে, যেগুলিকে নিছক কল্লোল-চেতনার সমধর্মীরূপে ব্যাখ্যা করা যাবে না। সাহিত্য-বিচারে সেরকম সুনির্দিষ্ট গাণিতিক কোন ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ যে মূঢ়তা, সেকথা সবিনয়ে স্বীকার করি।

কিন্তু তবু আমরা বুদ্ধদেব বসুর তিরিশের দশকের কথাসাহিত্যের পটভূমিরূপে তাঁর দেশ-কালের কয়েকটি সুপরিচিত উপকরণের কথা আরেকবার মনে করিয়ে দিতে চাই।

বুদ্ধদেব তথা কল্লোল-এর সাহিত্যসৃষ্টির পটভূমিতে একদিকে ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা—অন্যদিকে ছিল পশ্চিমী দেশ থেকে আগত কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা বা ভাবধারা। তার মধ্যে প্রথম হ'ল, মার্কসবাদী ভাবধারা ও রুশবিপ্লবের অভিঘাত। আর দ্বিতীয় হ'ল, ফ্রয়েড ও হ্যাভ্‌লক এলিসের বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তের প্রচার ও প্রসার। বুদ্ধদেব বসুর

উপর প্রথমটি অর্থাৎ মার্ক্সীয় চিন্তাভাবনার বিশেষ প্রভাব চোখে পড়ে না। কিন্তু ফ্রয়েড ও এলিসের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী কার্য, প্রেম সম্পর্কে প্রথাবিরোধী এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর সঞ্চার হল ওই সব সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে। মানুষের অবচেতনার উৎসে আছে যৌনচেতনা। আর এই আবিষ্কারের অভিঘাতে প্রেম সম্পর্কে আবহমান রোম্যান্টিক আদর্শবোধের ভিৎ কেঁপে উঠল। দেহ-চেতনা জীবনের বহিরঙ্গ রূপের অন্তরালবর্তী দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে জানার এক তীব্র কৌতূহল জাগিয়ে তুলল একালের তরুণ বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মনে। বুদ্ধদেব বসু এঁদেরই একজন। প্রসঙ্গত জানাই কল্লোল, কার্তিক ১৩৩৬-এ প্রকাশিত গল্প 'অভিনয় নয়'-এ এক জায়গায় আছে— 'ফ্রয়েড পড়ে অবধি আমার মনে হয়েছিল যে পৃথিবীতে এমন কোন জিনিষ নেই—থাকতে পারে না—যা আমি না বুঝতে পারি।' এ উক্তি গল্পের কথকের জবানীতে আসলে গল্প-লেখকেরই।

বস্তুত এই দুটি নতুন ভাবধারার দিক থেকেই কল্লোলপন্থী তরুণরা, বুদ্ধদেব যাঁদের বলেছেন 'adolescent rebels', সেদিন তাঁদের চোখে 'রোম্যান্টিক আদর্শবাদের সর্বোত্তম প্রতিভূ' রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তরুণ গোষ্ঠীর বিদ্রোহ মূলত রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নয়, বিদ্রোহ তাঁর জীবন-দর্শনের বিরুদ্ধে। বুদ্ধদেবের চোখে রবীন্দ্রনাথ মহিমান্বিত ঈশ্বরের মত হলেও তাঁর কাব্যে ও কথাসাহিত্যে দেহ-চেতনার তথাকথিত অভাববোধ এই তরুণ লেখককে বিক্ষুব্ধ করেছে। বুদ্ধদেব স্পষ্টতই অভিযোগ করেছেন: 'তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হলো তাঁর জীবন দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।' (রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক, সাহিত্যচর্চা, পৃঃ ১১৮)। কিংবা অন্যত্র বলেছেন, 'গোরার পর থেকে একমাত্র মধুসূদনকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পাত্র পাত্রীরা প্রায় সকলেই দ্বিরায়তনিক, যথাযোগ্য শরীরের অভাবে ঈষৎ পাণ্ডুর', (রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য, পৃঃ ১৮৪)।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কথাসাহিত্যের তথাকথিত রোম্যান্টিক আদর্শবাদের মধ্যে বুদ্ধদেব তথা তরুণগোষ্ঠীর পিপাসা সম্পূর্ণ চরিতার্থ হয় নি। কতকটা এই অভাববোধ থেকেই তাঁরা ইংরেজী কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের দিকে হাত বাড়ালেন। বুদ্ধদেব বলেছেন—'We read Whitman, the Russians

and the Scandinavians.'—বুদ্ধদেবের উপন্যাসে-গল্পে 'দেহের রহস্তে বাঁধা' প্রেমের যে বিচিত্র রসরূপ, তার মূলে পাশ্চাত্ত্যের কাব্য-কথাসাহিত্যের প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। একথা মনে রেখেই সম্ভবত বুদ্ধদেব তাঁর গল্পের কথকের জবানীতে বলেছেন :—

'ফরাসী-রুশ-নরোয়েজীয় উপন্যাসগুলোর ইংরেজী তর্জমা বাঙলাদেশে যদি না ছড়াতো, তবে একা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধ্যি ছিল না, দেশের তরুণ-তরুণীদের এমন Universal প্রেমের মন্ত্রে মন্ত্রণা দেন।' (অভিনয় নয়, কল্লোল, কার্ত্তিক, ১৩৩৬)

৪

এইসব দেশকালগত উপকরণের অনিবার্য টানে বুদ্ধদেব বসু-রচিত বিশ ও তিরিশের দশকের গল্পে-উপন্যাসে কয়েকটি চেতনা বা প্রবণতা ফুটে উঠল, সেই প্রবণতাগুলি সম্পর্কে এবারে কিছু বলবো।

এই প্রসঙ্গে তথ্যের দিক থেকে জানাতে পারি যে, কল্লোলের পৃষ্ঠায় ১৩৩৩-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রজনী হল উতলা' বুদ্ধদেবের প্রথম উল্লেখযোগ্য গল্প। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সাড়া' প্রকাশিত হয় ১৯৩০-এ। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অভিনয়' অভিনয়, নয়'-ও বেরোয ১৯৩০-এর মার্চে। এই দশকের শেষ-পর্যন্ত যে-কালপর্ব, সেই সময়ের মধ্যে তাঁর অন্তত মোট তিরিশখানি গল্প-উপন্যাস বেরিয়েছে। এছাড়া বেশ কযেকটি ছোটদের উপযোগী গল্প-সঙ্কলন বা উপন্যাসও এ সময় বেরোয়। এই পর্বের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে যবনিকা পতন (১৯৩২), এরা ওরা এবং আরো অনেকে (১৯৩২), যেদিন ফুটলো কমল (১৯৩৩), ধূসর গোধূলি (১৯৩৩), বাসরঘর (১৯৩৫) ইত্যাদি বিশেষ-ভাবে স্মরণযোগ্য।

বর্তমান আলোচনায় আমরা বুদ্ধদেবের কথাসাহিত্যের প্রথম পর্যাযকে গ্রহণ করেছি। বুদ্ধদেবের কথাসাহিত্যের পর্যায়-বিভাগ আদৌ সহজ কাজ নয়, বোধহয় পুরোপুরি সঙ্গতও নয। কারণ তাঁর কথাসাহিত্যের ধরাটা প্রায একই রকম, সেখানে পালাবদলের চেহারা খুব স্পষ্ট নয়। তবু আমরা আলোচনার স্থবিধার জন্ত এই ধরণের ভেদরেখা টানতে চেয়েছি। অবশ্ব এই পর্ববিভাগ একেবারে কৃত্রিম বা আরোপিত নয় বলেই মনে করি। যে-প্রেম বুদ্ধদেবের কবিতার মত কথাসাহিত্যেরও মৌল চেতনা, চল্লিশের পর

থেকে অনেক উল্লেখযোগ্য উপন্যাসে সেই প্রেমের প্রত্যক্ষ সজীব ও গাঢ়-গভীর উপস্থিতি চোখে পড়ে না, সেখানে প্রেম মৃদু স্মৃতিমাত্র। কখনও বা প্রেমের আসনে সমাসীন হয়েছে সেখানে অন্য কোন প্রবণতা ও যন্ত্রণা, এক কথায়, অংশত অপ্রেমের চেতনা। দৃষ্টান্ত হিসাবে মৌলিনাথ, নির্জন স্বাক্ষর, পাতাল থেকে আলাপ, শোণপাংশুর নাম মনে আসছে।

৫

আমাদের আলোচ্য তিরিশের দশকে, যে সময়টায় 'কল্লোল'-এর বিশিষ্ট চেতনাগুলির প্রকাশ পরিস্ফুট, সেই সময়কার বুদ্ধদেবের উপন্যাস-গল্পের নিহিত প্রবণতার সন্ধান করলে কল্লোলের মনন ও মানসিকতাই মূলত চোখে পড়বে। বুদ্ধদেবের এই পর্যায়ের গল্প-উপন্যাসের একটি পরিস্ফুট লক্ষণ হল, সামাজিক ও বাস্তব জীবনপটের অস্পষ্টতা। 'রজনী হল উতলা' বা 'এমিলিয়ার প্রেমে'র মত গল্প, কিংবা সাড়া, যেদিন ফুটলো কমল, বাসরঘরের মত উপন্যাসের কথা মনে রাখলেই এই মন্তব্যের তাৎপর্য বোঝা যাবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের অস্থিরতা অনিশ্চয়তার দরুণ এবং সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে কল্লোলপর্বের রচনায় এই সামাজিক ও পারিবারিক জীবনপটকে উপেক্ষার প্রবণতা দেখা দেয়। বুদ্ধদেবের রচনাতেও দেখি, সেখানে সমাজ ও পরিবারের ভৌগোলিক পরিচয় হয়ত কিছুটা আছে, কিন্তু তার আত্মিক প্রভাব প্রায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য। সেই শূন্য স্থান গ্রহণ করেছে ব্যক্তি-চেতনা। ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির হৃদয়ের গূঢ় গভীর পিপাসা ও আর্তি নানা কাহিনী ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে। বস্তুত কল্লোল-এর অধিকাংশ লেখকের মত বুদ্ধদেবের জীবনগত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র আদৌ প্রসারিত ছিল না; গ্রাম-বাংলার বিস্তৃত জীবন-পরিবেশ, ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায় শ্রমজীবী মানুষ কিংবা সাধারণ সংগ্রামী দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত নিম্নবিত্ত মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়নি বুদ্ধদেবের। তিনি কলকাতার নাগরিক জীবনের রূপকার। অবশ্য সে নাগরিক জীবনও জীবন-সংগ্রামের উত্তরঙ্গ স্রোতের আঘাতে সংঘাতে বিক্ষুব্ধ জটিল বা কূলপ্লাবী নয়। সেই নাগরিক জীবনপট পরিশীলিত নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিহৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভব-চেতনার আলো-ছায়ায় কারুকার্যমণ্ডিত।

কথাসাহিত্যে কলকাতার নগর-জীবনকে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার

করেছেন 'কল্লোলে'র বহু শিল্পী। সমাজ-সত্তার অস্তিত্ব ক্ষীণ হয়ে গিয়ে, যে-লেখকদের জীবন-ভাবনায় ব্যক্তির সমস্যা অন্তর্দ্বন্দ্ব সংশয় ও স্বপ্ন-কামনা প্রবল হয়ে উঠেছে, তাঁরাই বুদ্ধদেবের মত এই নগর-জীবন থেকেই নায়ক-নায়িকার সন্ধান করেছেন। বুদ্ধদেবের প্রায় সব উপন্যাসেরই নায়ক হয় কবি-শিল্পী, না হলে সাহিত্যের কৃতী ছাত্র কিংবা কবিতা-প্রেমিক অধ্যাপক। বলা বাহুল্য, তারা সকলেই হয় গোড়া থেকেই কলকাতার মানুষ, না হলে মফঃস্বল শহর থেকে কলকাতায় এসে বসবাস করছে। বুদ্ধদেবের নানা উপন্যাস-গল্পে ছড়ানো এই যে অসংখ্য নায়ক-চরিত্র—এদের মধ্যে বৈচিত্র্য বা স্বাতন্ত্র্য তেমন চোখে পড়ে না। বস্তুত তাঁর সব নায়ক-চরিত্রই একটি মাত্র মুখের ছাঁচে গড়ে তোলা। সে মুখ স্বয়ং লেখকের। তাঁর রচনায় বিভিন্ন নায়ক যত কথা বলেছে, তাদের প্রায় সকলের কথার মধ্য দিয়ে একজনের কণ্ঠস্বরই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সে কণ্ঠস্বর বলা বাহুল্য, স্বয়ং লেখক বুদ্ধদেব বসুর।

বুদ্ধদেবের কথাসাহিত্যে যাকে ব্যক্তিচেতনা বলেছি, আসলে তা অনেক পরিমাণে লেখকের আত্মচেতনারই নামান্তর। 'সাড়া' উপন্যাসের সাগর, 'যেদিন ফুটল কমলে'র পার্থপ্রতিম, 'বাসরঘরে'র পরাশর 'একদা তুমি প্রিয়ে'র পলাশ—এদের সকলের চিন্তা মনন ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে লেখক নিজেকেই উন্মোচিত ও প্রসারিত করতে চেয়েছেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বুদ্ধদেবের 'আমার বন্ধু' (১৯৩৩) উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে এই লক্ষণটির কথা মনে রেখেই বোধহয় তৎকালীন অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখেছিলেন "The whole book is a self-criticism."

বুদ্ধদেবের উপন্যাসে এই আত্ম-প্রক্ষেপ, যা কেবল আংশিক 'প্রক্ষেপ' নয়, অনেক ক্ষেত্রেই যা আত্মময়তা—এই প্রবণতাই বোধকরি তাঁর রচনাকে বিশেষ এক স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। আবার এরই মধ্যে ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর দুর্বলতার লক্ষণও সর্বাধিক।

'রজনী হল উতলা' ও 'সাড়া' থেকে শুরু করে এই পর্বের প্রায় সর্বত্র বুদ্ধদেবের আপন সত্তার যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা হল, আত্মমুখী রোম্যান্টিক কবিপ্রাণতা ও নিরুচ্চার বিষণ্ণ স্বপ্নাতুরতা। বলা বাহুল্য, এ দুটি বিচ্ছিন্ন প্রবণতা নয়, একই মনের আকাশের দুটি রঙ, যার একটির সঙ্গে আরেকটি অলক্ষ্যে মিশে আছে।

এই আত্মমুখী রোম্যান্টিক কাব্যময়তার সৌরভ বুদ্ধদেবের রচনাকে প্রচলিত

উপন্যাস-গল্পের গঠন থেকে নিশ্চিত স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। ঘটনার যে ঘনত্ব বা জটিলতা প্রথাবদ্ধ কথাসাহিত্যে আমরা প্রত্যাশা করে এসেছি, বুদ্ধদেব সে বিষয়ে আমাদের সচেতনভাবেই হতাশ করেছেন। তিনি নিজের এই ত্রুটি সম্পর্কে স্বীকার করতে গিয়ে বলেছেন : 'আমার উদ্ভাবনী শক্তি দুর্বল ; ঘটনার চাইতে বর্ণনার দিকে আমার ঝোঁক, নাটকীয়তার চাইতে স্বগতোক্তির দিকে...। এমন গল্প আমি কমই লিখেছি যার গল্পাংশ মুখে বলে দেয়া যায়।' (গল্প লেখার গল্প)

উপরের উক্তিটিকে কিছুটা সবিনয় ত্রুটি স্বীকারের মতো শোনালেও, আসলে 'প্লট-প্রধান' উপন্যাসের প্রতি বুদ্ধদেবের অনীহা আত্যন্তিক। 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থে (পৃঃ ১৩) তাঁর সেই উক্তি : 'তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) কথাসাহিত্যের একটা বড়ো অংশের প্রতিপত্তির কারণই তাঁর কবিত্বগুণ।'—একথা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যতোটা সত্য, তার চেয়ে কোন অংশে কম সত্য নয়; বুদ্ধদেবের নিজের রচনা প্রসঙ্গে। বস্তুত বুদ্ধদেব প্লট-প্রধান উপন্যাসের ক্ষেত্রে পাঠককে যে হতাশ করেছেন, সে তাঁর আপন শিল্পিসত্তার বিশেষ এক প্রবণতার জন্যই। পাঠকের সেই হতাশা, সেই অভাববোধ তিনি দূর করতে চেয়েছেন তাঁর অনুভবের তীব্রতায়, গাঢ় আবেশ-সঞ্চারী সর্বব্যাপী কবিত্বের দ্বারা। সমগ্র কথাসাহিত্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেবের মুখ্যতম পরিচয় এই যে, তিনি কবি—আত্মমুখী এক নির্জন, স্বপ্নাবিষ্ট রোম্যান্টিক কবি। কল্লোল পর্বের জীবনভাবনায় এই মনোভাবটি সেদিন অনেকের রচনাতেই অল্পবিস্তর ফুটে উঠেছিল। মণীন্দ্রলাল বসু, গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত,—এঁদের অনেকের রচনার সঙ্গেই এদিক থেকে বুদ্ধদেবের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। অবশ্য বলা বাহুল্য, সাদৃশ্য সত্ত্বেও বুদ্ধদেবের স্বকীয়তা ছিল পরিস্ফুট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের আহত ক্ষয়িষ্ণু সংশয়ী যৌবনের পায়ের তলা থেকে যখন সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধগুলি ক্রমশই সরে সরে যাচ্ছে, যখন বাস্তব পৃথিবীর চারদিকে আশার আলো একটু একটু করে নিবে আসছে, তখন সেই হতাশা-ম্লান, ধূসর পরিবেশে সেদিনের যৌবন রোম্যান্টিক স্বপ্নকে বুকে লালন করে বাঁচতে চেয়েছে। সেদিনের সেই আশা ও নিরাশা, সংশয় ও স্বপ্ন, ভাঙা ও গড়ার ক্রান্তিলগ্নে রোম্যান্টিক মোহরস বুদ্ধদেবের মত অসংখ্য তরুণ চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। অচিন্ত্যকুমার বলেছেন, 'যেমন শোক থেকে শ্লোকের জন্ম তেমনি তারুণ্য থেকেই কল্লোলের

আবির্ভাব।' এই তারুণ্য বা যৌবনধর্মের মর্মকোষে ছিল রোম্যান্টিকতার মোহরস।

সেদিনের এই দেশ ও কালের পটভূমিতে বুদ্ধদেবের- কবিপ্রাণে বিষণ্ণ স্বপ্নাতুর রোম্যান্টিকতার মূর্চ্ছনা জেগেছিল। সে মূর্চ্ছনা কখনই তীব্র ঝঙ্কার নয়, তা নিরুচ্চার, মৃদু সৌরভের মতো। তাঁর সব ক'টি রোম্যান্টিক কাব্যধর্মী উপন্যাসের বর্ণনায় ও নায়ক-নায়িকার হৃদয়-সংবেদনার প্রকাশে এই নিরুচ্চার কাব্যময়তা আশ্চর্য আবেদন সৃষ্টি করেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই, 'বাসর ঘর' উপন্যাস থেকে। উপন্যাসের নায়ক পরাশর ভাবছে, 'দুজনের মধ্যে জন্ম নিলো বিশাল রহস্যময় নদী, স্বপ্নের মতো কানে এসে লাগছে আতঙ্কের কালো জলের কলরোল। এ নদী কোথায় গেছে কত ঘূর্ণিতে, কত আবর্তে, কত প্রচণ্ড ঢেউ তুলে, অন্ধকার বিসর্পিল স্রোতে কোন পরিপূর্ণতার সময়হীন দিগন্তহীন সমুদ্রে। তার গম্ভীর ধ্বনি পরাশরের বুকের মধ্যে স্পন্দিত। আকাশের অন্ধকার যেন কোন দূর মন্দিরের ঘণ্টার শব্দে ভরে গেলো। রাত্রির থরোথরো বুক ভরে কোনো অনির্বচনীয় মন্ত্র-নিঃস্বন।'

এই সূক্ষ্ম সঙ্গীতধর্মী ভাষার সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনার জন্যই রবীন্দ্রনাথ এই 'বাসর ঘর' উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'গল্প হিসাবে তোমার এ লেখা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ কবির লেখা গল্প, আখ্যানকে উপেক্ষা করে বাণীর স্রোত বয়ে চলেছে।...এই যে তোমার গল্প-না-বলা-গল্পটিকে তুমি যে এমন করে দাঁড় করাতে পেরেছ সে তোমার কবিত্বের প্রভাবে।' (দ্রঃ বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪২)। প্রসঙ্গত একটা কথা জানাই, উপন্যাসে এই 'কবিত্বের প্রভাবে'র ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের স্বকীয়তার কথা মেনে নিয়েও একটা সত্য বোধহয় স্বীকার করতেই হবে। বুদ্ধদেবের কৈশোর-প্রান্তের রবীন্দ্র-বিরোধিতা যৌবনের সূচনাতেই অনেকখানি স্তব্ধ হয়েছিলো ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে প্রবাসীতে 'শেষের কবিতা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই। 'শেষের কবিতা' যেন যাদুকরের স্পর্শ বুলিয়ে দিল বুদ্ধদেবের তরুণ মনে। তাঁর নিজের কথায়,

'শেষের কবিতা আগাগোড়াই কাব্য,...কাব্যে,...বাক্যের ইন্দ্রজালে সমস্ত বইটি আচ্ছন্ন, সেই পুষ্পভারে গল্পের বল্লরীটি দেখা-না-দেখায় মেশা বিদ্যু-ল্লতার মতোই বিলীয়মান। তাতে আপত্তির কিছু নেই,...এ বইয়ে রবীন্দ্র-নাথ এনেছেন নতুন একটি রূপকল্প—পুরনো নামের লেবেলে যাকে ঠিক চেনা যায় না।'—(রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য, ২০১ পৃঃ)।

মনে রাখতে হবে, 'শেষের কবিতা' প্রকাশিত হবার আগে বুদ্ধদেবের কোন উপন্যাসই বেরোয়নি এবং প্রকাশিত গল্পের সংখ্যাও অতি অল্প। তাঁর প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস 'সাড়া' বেরোয় ১৯৩০-এ। উত্তরকালে বুদ্ধদেব 'শেষের কবিতা'র ত্রুটি ও অপূর্ণতা সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু তবুও কেবল পূর্বোক্ত মন্তব্যেরই নয়, আরও কিছু ইতস্ততঃ ছড়ানো স্বীকৃতির (দ্রঃ An acre of Green Grass, রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য) আলোকে এবং শেষের কবিতা ও বুদ্ধদেবের কথাসাহিত্যের সম্পর্ক-বিচারের দ্বারা কবিপ্রাণ রোম্যান্টিক কথাশিল্পী বুদ্ধদেবের সঙ্গে 'শেষের কবিতা'র অন্তর্গূঢ় সংস্পর্শ ও সংযোগ কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

অবশ্য এও ঠিক যে, বুদ্ধদেবের কথাসাহিত্যে রোম্যান্টিক কাব্যচেতনার সবটুকুই নিছক 'শেষের কবিতা'র অভিঘাতের ফল নয়। 'শেষের কবিতা'র মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব ও তাঁর সগোত্র তরুণ-লেখকরা কল্লোল-প্রবণতারই এক সার্থক-রূপ দেখতে পেয়েছিলেন সেদিন,—বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে, যার নেপথ্যে ছিল 'indirect, I might say inverse influence of the Kalloleans on Rabindranath'.

বুদ্ধদেব 'শেষের কবিতা'র পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আমাদেরই অনেক স্বপ্নের চোখ-ধাঁধানো মূর্তি। আমরা যা-কিছু চেষ্টা করছিলাম অথচ ঠিক পারছিলাম না, সেই সবই রবীন্দ্রনাথ করেছেন।' 'শেষের কবিতা'র স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে 'আধুনিক' বলতে গিয়েও এই 'কল্লোলপন্থী' লেখক বলেছেন, 'আমরা আধুনিক বলতে যা ভাবছিলাম ঠিক তা নয়, কিন্তু তারই কোন সার্থক রূপান্তর'—অর্থাৎ সব মিলিয়ে মনে হয়, সেদিনের কথাশিল্পী বুদ্ধদেবের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সর্বাত্মক নয়। রবীন্দ্রনাথকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েও এই তরুণ লেখক সেদিন তাঁর গোষ্ঠীগত তথা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য আদৌ হারিয়ে ফেলেন নি।

৬

আবার পুরনো কথায় ফিরে যাই। তারি সূত্র ধরে আরেকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে শিল্প-সচেতনতার অতিরেকের ফলে জীবন তথা জীবনগত অভিজ্ঞতা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, এ রকম যেন অনেক সময় মনে হয়। কথাবস্তুর চেয়ে কথনশিল্পের উপর অনেক স্থলেই তিনি যে

গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এবং কাব্যরীতির যে গূঢ়-গভীর সংক্রমণ ও অতিশয্য-প্রবণতা তাঁর রচনায় চোখে পড়ে, তাতে এরকম মনে হওয়া বিচিত্র নয়।

কিন্তু বস্তুত বুদ্ধদেব জীবনকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন নি কোথাও। 'আর্টে'র সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে এক সুন্দরতর শিল্পিত জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। আর সেই জীবনবোধের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে প্রেম-চেতনা। তাঁর সাহিত্যে জীবন ও প্রেম প্রায়-সমার্থক।

কবিতা, গল্প-উপন্যাস সর্বত্রই তিনি প্রেমের এক আশ্চর্য রূপকার। প্রেমের লাবণ্য ও দীপ্তি, প্রেমের মোহমদির স্বপ্নাবেশ ও বেদনার সুর—সবই তাঁর কবিতার মত উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার জীবনকে ঘিরেও বিচিত্র রঙে রসে উন্মোচিত হয়েছে। সাড়া, যেদিন ফুটলো কমল, অসূর্যম্পশ্যা, বাসর ঘর, সূর্যমুখী প্রভৃতি উপন্যাসে লেখকের জীবনচেতনা এই সূক্ষ্ম কাব্যময় প্রেম-চেতনার মাধ্যমেই পরিস্ফুট।

কিন্তু কেবল লাবণ্যময় গীতিপ্রাণতাই বুদ্ধদেবের কথাসাহিত্যের প্রেম-চেতনার একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি বিশ শতকের তিরিশের দশকের কথা-শিল্পী। নরনারীর প্রেম যে কেবল বায়বীয় প্লাটোনিক আদর্শ-স্বপ্ন নয়, দেহকে ঘিরে প্রবৃত্তি-কামনার যে আত্মক্ষয়ী যন্ত্রণা ও গূঢ়চারী রহস্য—সে সবকিছুই বুদ্ধদেবের সৃষ্ট চরিত্র ও কাহিনীকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়েছে।

কল্লোলে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প 'রজনী হল উতলা'র মত তথাকথিত মর্বিড গল্পে যে দেহচেতনার যন্ত্রণা ও রহস্যের সূচনা, 'যবনিকাপতন'-এ কিংবা 'একদা তুমি প্রিয়ে'র অংশ বিশেষে সেই চেতনারই বিচিত্র রূপায়ণ। ভারতী ও নারায়ণ পত্রিকার পৃষ্ঠায় দেহ-চেতনাকে অবলম্বন করে প্রাক-রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র যে সাহিত্য-সৃষ্টির নতুন আন্দোলন সূচিত হয়েছিল, কল্লোল -এর তরুণ স্পর্ধিত বিদ্রোহীদের হাতে সেই আন্দোলন, আরও ব্যাপক ও বিচিত্র রূপ গ্রহণ করেছিল। বুদ্ধদেবও সেই আন্দোলনের শরিক।

বুদ্ধদেবের লেখায় দেহচেতনা অবশ্য স্থূল দেহসর্বস্বতায় পর্যবসিত হয় নি কখনও। দেহকে ঘিরে প্রেমের যে রহস্যময় আর্তি ও অনুভব, দেহ ও আত্মার যে ক্রন্দন, এবং বিরহের বেদনায় শারীর চেতনাকে বিশুদ্ধ করে তোলার জন্য নরনারীর যে যন্ত্রণা,—তাকেই ধরবার চেষ্টা করেছেন বুদ্ধদেব তাঁর কাব্যরসবাহিত সাঙ্কেতিক ইমেজ বা শব্দচিত্রের মাধ্যমে। 'ধূসর গোধূলি' উপন্যাসে নারীর রূপবিহ্বলতা থেকে যে 'দারুণ হলাহল উঠে এসেছে, তা পান

করে উপন্যাসের চরিত্রগুলির যে দুঃসহ যন্ত্রণা ক্লান্তি আর বিষাদ—তার কাব্য-ব্যঞ্জনাময় রহস্যমেদুর চিত্রটি সত্যই অনুপম।' রোম্যান্টিক কবিপ্রাণ কথাশিল্পী বলেই বুদ্ধদেব প্রেমের শারীর চেতনায় বিশ্বাসী হয়েও, কখনই দেহজ কামনার অভিজ্ঞতার বিস্তৃত চিত্রাঙ্কনে বা বিশ্লেষণে তেমন আগ্রহ বোধ করেন নি। বরং তাঁর এই পর্বের উপন্যাসে ব্যর্থ প্রেমের কারুণ্য ও মাধুর্যের সূক্ষ্ম সুকুমার রূপটিই পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করে। এ ধরণের উপন্যাসের মধ্যে ধূসর গোধূলি ছাড়াও একদা তুমি প্রিয়ে, হে বিজয়ী বীর, লাল মেঘ, বাসর ঘরের নামও স্মরণযোগ্য।

৭

বুদ্ধদেবের সাহিত্যে আত্মমুখী রোম্যান্টিক স্বপ্নময়তার কথা বলেছি। এই চেতনায় যখন বুদ্ধদেব আবিষ্ট হন তখন যেন মনে হয়, তিনি বাস্তব সমাজের জীবনগত অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তাঁর কথাসাহিত্যে (কবিতাতেও) এমন আরেকটি প্রবণতা চোখে পড়ে, যেখানে তাঁকে আত্মময়তার সীমাস্বর্গের বাইরেকার সমাজ ও জীবন সম্পর্কে কিছুটা অবহিত বলে প্রত্যয় জন্মায়। সেটি তাঁর ব্যঙ্গ-প্রবণতা। এই ব্যঙ্গ মুখ্যত আভিজাত্যের বর্ণিল আবরণের অন্তরালস্থ নিষ্ফল অন্তঃসারশূন্যতার বিরুদ্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বুদ্ধি-জীবী মধ্যবিত্তের। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, চিন্তায়, মননে এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সমাজের অন্য শ্রেণী থেকে অগ্রণী। কিন্তু অর্থনৈতিক সঙ্কটে তারা ক্লিষ্ট ক্লান্ত। এর ফলে তারা সামাজিক মর্যাদা থেকেও অনেকাংশে বঞ্চিত। কেবল আর্থিক প্রাচুর্যের জোরে যারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সিংহাসন অধিকার করে রাখতে চায়, সেই তথাকথিত অভিজাতদের বিরুদ্ধে তাই এই ব্যর্থ বঞ্চিত বুদ্ধিজীবীদের আক্রোশ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বুদ্ধ-দেবের এই পর্বের অনেক উপন্যাস-গল্পে—যেমন 'সাড়া' 'সানন্দা', 'যবনিকা পতন', 'রডোডেনড্রন গুচ্ছ', 'অতনু মিত্র, সাবিত্রী বোস আর বুলু' ইত্যা-দিতে প্রায়শই নায়কের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী লেখক (কল্লোল-গোষ্ঠীভুক্ত সব লেখকেরই যা শ্রেণী-পরিচয়) বুদ্ধদেব বসুই এই বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করেছেন।

এই ব্যঙ্গ-প্রবণতার সঙ্গে তুলনা চলে 'শেষের কবিতা'র অন্তঃসারশূন্য অভিজাত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের কটাক্ষের কিংবা হাক্সলির Crome

Yellow, Antic Hay, Those Barren Leaves ইত্যাদি উপন্যাসের ভঙ্গীসর্বস্ব সাহিত্যিক ও হৃদয়হীন দেহসর্বস্ব 'সম্ভ্রান্ত' নরনারীর বিরুদ্ধে কঠিন বিদ্রূপের। বুদ্ধদেবের যে ব্যঙ্গ তাও প্রধানত পূর্বোক্ত সমাজের দু'টি দিক্‌কে বিদ্ধ করেছে। একটি, ওই সমাজের সৌখিন সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা, অন্যটি, হৃদয়হীন স্থূল দেহসর্বস্ব প্রণয়-বিলাস।

এই বিদ্রূপের শিল্পমূল্য যাই হোক, বুদ্ধদেবের উপন্যাসে বারবার এই ধরণের ব্যঙ্গাত্মক প্রবণতা প্রকাশিত হবার ফলে, এটি নিশ্চয় এক স্বতন্ত্র তাৎপর্যে চিহ্নিত হয়ে উঠেছে। সেটি হল, প্রকারান্তরে 'কল্লোল'-ধর্মী প্রতিবাদের চেতনা। কল্লোলে'র অন্যতম অন্তর্লীন চেতনাই হল বিরুদ্ধবাদের তথা বিদ্রোহের চেতনা। সেই বিরোধিতার একটা দিক হ'ল পালিশ-করা মার্জিত কৃত্রিম নাগরিক আভিজাত্যের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে বঞ্চিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর স্পর্ধিত প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তিরিশের দশকে সেদিন সোচ্চার হয়েছে কল্লোলপন্থী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে', প্রবোধকুমার সান্যালের 'নবীন যুবক', 'দুই আর দুয়ে চার', 'আঁকাবাঁকা' ইত্যাদি উপন্যাসে।

খুব সঙ্কীর্ণ সীমিতভাবে হলেও বুদ্ধদেব বসুর এই প্রতিবাদও এক ধরণের সামাজিক প্রতিবাদ নিশ্চয়ই। কিন্তু এই প্রতিবাদের প্রবণতা বুদ্ধদেবকে কোন বৃহত্তর বৈপ্লবিক সমাজ-চেতনায় উদ্বেজিত করে নি।

সেদিনকার কল্লোলপন্থী লেখকদের প্রতিবাদ—নানা প্রভাব, ব্যক্তিগত প্রবণতা ও প্রতিক্রিয়া এবং শ্রেণীবৈশিষ্ট্যের অনিবার্য টানে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, বলতে পারি, আত্মমুখী রোম্যান্টিক বোহেমীয় চেতনা অথবা প্রেমস্বপ্নের বিষণ্ণ গীতিমূর্চ্ছনায় নিজেকে সঙ্কুচিত করে এনেছে।

বস্তুত বুদ্ধদেবের মধ্য দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর একই জীবনবোধ কখনও বা অন্তঃসারশূন্য সভ্যতার হৃদয়হীন কৃত্রিমতাকে কঠিন ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছে, আবার কখনও বা সমাজ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে, আঘাত করার নেতিমূলক প্রয়াস থেকে সরে এসে আপন রোম্যান্টিক স্বপ্ন-জগৎ গড়ে, শেষ পর্যন্ত প্রেমের মধ্যেই জীবনের আশ্রয় সন্ধান করেছে।

এইভাবেই বুদ্ধদেবের মধ্যবিত্ত মানসিকতায় 'সামাজিক' ব্যঙ্গ ও প্রতিবাদ-প্রবণতা এবং আত্মমুখী নির্জন স্বপ্নাতুরতা—এই দুই তথাকথিত 'স্ববিরোধী' প্রবণতা বিস্ময়করভাবে সহাবস্থান করেছে চিরদিন। কল্লোলের-ই মৌল

চরিত্রে যে এই ধরনের প্রবণতা ছিল, 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমারের উক্তিতে তারই ইঙ্গিত পাই: 'কল্লোল যুগে এ দুটোই প্রধান সুর ছিল, এক প্রবল বিরুদ্ধবাদ; দুই, বিহ্বল ভাববিলাস।'

বক্তব্য শেষ হয়ে এলো। আলোচনার এই পর্যায়ে এসে বোধ হয় একটা সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যথার্থ বাস্তবধর্মী জীবননির্ভর কথাসাহিত্য-রচনায় এই পর্বে বুদ্ধদেব প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করেন নি। জীবনগত বাস্তবতার যে কঠিন মেরুদণ্ড কথাসাহিত্যে, বিশেষভাবে উপন্যাসে, আমরা প্রত্যাশা করি, সময়-সমাজের যে দ্বন্দ্ব-জটিল তীব্র সচেতনতা উপন্যাসের দৃঢ় অবয়ব গড়ে তোলে—বুদ্ধদেবের রচনায় তার অভাব বড় বেশী প্রকট।

এই প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবেই মনে আসছে তিরিশের দশকে বুদ্ধদেবের সমকালীন বিভিন্ন লেখকের গল্প-উপন্যাসের কথা। ভাবতে অদ্ভুত লাগছে যে, বুদ্ধদেব যে সময়ে তাঁর আত্মমুখী স্বপ্নাতুরতায় আবিষ্ট গল্প-উপন্যাসগুলি এক-একটি করে লিখে চলেছেন, ঠিক সেই সময় কল্লোলের মানসবৃত্তের বাইরে সম্পূর্ণ 'স্বতন্ত্র' এক জীবনবোধ ও শিল্পভাবনা কথাসাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করছে। তিরিশের এই আশ্চর্য ফলবান দশকে বুদ্ধদেবের 'কাব্য-ধর্মী' কথাসাহিত্যের পাশাপাশি বেরিয়েছে ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, পদ্মানদীর মাঝি, প্রাগৈতিহাসিক, একদা'র মত আরও অনেক গল্প-উপন্যাস।

শিল্পগত গুণাগুণের বিচার আপাতত স্থগিত রেখেও বলতে পারি যে, বাংলা কথাসাহিত্যের এই বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত পটভূমিতে বুদ্ধদেবের রচিত গল্প-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বস্তুত কল্লোল-চেতনাই যথার্থভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

তাঁর গল্প-উপন্যাসে যে কাব্যব্যঞ্জনা ও বাগ্‌বৈভবের অতিরেক নরনারীর চরিত্রের জটিল মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাবনাময় ইঙ্গিতগুলিকে অস্পষ্ট করে দিয়েচ রিত্রের বাস্তবতাকে ব্যাহত করেছে, যে আত্মগত রোম্যান্টিক আবেগের আতিশয্য উপন্যাস ও গল্পের বস্তুপরিচয়কে সংহত ও সুনির্দিষ্ট হতে বাধা দিয়েছে, যে স্বপ্নাতুর বিষণ্ণ প্রেম ও কামনার সর্বব্যাপিতা সমকালীন জীবনের অন্তবিধ বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সংকট ও তাৎপর্যকে আড়াল করে রেখেছে—আগেই বলেছি, সে সবই কল্লোল-এর এক একটি তরঙ্গবেগ।

তবু কল্লোল-চেতনায় কথাকোবিদ হিসাবে বুদ্ধদেবের শিল্পিব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য,—অতি সোচ্চার না হলেও যা একধরণের 'স্পর্ধিত' স্বাতন্ত্র্য—তা অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। উপন্যাস-গল্প রচনায় তিনি 'স্বধর্মে' স্থিত

থেকেছেন চিরদিন—'ঘটনাঘন' গল্পের শত প্রলোভন সত্ত্বেও 'পরধর্মকে' তিনি সর্বদাই 'ভয়াবহ' জেনে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। এবং তা শুধু তিরিশের দশকেই নয়, তার পরবর্তী পর্যায়ের কথাসাহিত্যেও।

সর্বশেষে বুদ্ধদেবের এই পর্যায়ের সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর আত্মসমীক্ষা দিয়েই বক্তব্য শেষ করি :

'I conclude that our first efforts, despite youthful excesses, did reveal a new world, that though we sometimes succumbed to the temptations of shocking and showing off, our sincerity was manifest' (An acre of Green Grass, P.71)

বস্তুত ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসাবে সার্থকতার উচ্চতম স্বর্গ যদি তাঁর করায়ত্ত না হয়েও থাকে, তবু কেবল অন্তরের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় এবং স্বীয় জীবন ও শিল্পগত প্রত্যয়ে ও প্রবণতায় এই কল্লোলপন্থী কথাকোবিদ প্রেম, সংরাগ ও স্বপ্নাতুর বিষণ্ণতা দিয়ে যে এক অনন্য জগৎ রচনা করে যেতে পেরেছেন—শিল্পী হিসাবে সেখানেই তাঁর পরম চরিতার্থতা।

বিভূতিভূষণের শিল্পিসত্তা ঃ দিনলিপিতে প্রতিফলন

কবি-কথাশিল্পীর সৃষ্টি-সমীক্ষায় তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ শিল্পিস্বভাবের অন্তরঙ্গ পরিচয়লাভ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। সেই পরিচয়লাভের অন্যতম উপায় বা উপকরণ হ'ল লেখকের ব্যক্তিগত ডায়েরী বা দিনলিপি। পশ্চিমী দিনলিপির সংখ্যা কম নয়, কিন্তু বাংলা ভাষায় দিনলিপি-রচয়িতার সংখ্যা নিতান্ত বিরল। শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণের নামই কেবল এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। তাও আবার শিবনাথ শাস্ত্রীর 'ইংলণ্ডের ডায়েরী' (১৮৮৮ ?) এবং রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' (১৮৯০) ও 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী' (১৯২৪-২৫) নামেমাত্র ডায়েরী বা দিনলিপি। বস্তুত ব্যক্তিসত্তার যে অন্তরঙ্গ গূঢ় পরিচয়-উন্মোচন দিনলিপির অন্বিষ্ট, তা এই দুই বিশিষ্ট ব্যক্তির 'ডায়েরী'তে হয়ত চোখে পড়ে না। সেদিক থেকে দিনলিপির ক্ষেত্রে যথার্থ অনন্য শিল্পী বিভূতিভূষণ। তাঁর সৃষ্টি সমীক্ষাতেও এক অভিনব পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছে এই দিনলিপিগুলি। তাই এগুলিকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ ও বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে মনে করি।

বিভূতিভূষণ সারাজীবনে যত গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, সেই অনুপাতে তাঁর দিনলিপির সংখ্যা নিতান্ত সামান্য নয়। বলা যেতে পারে, তাঁর গল্প-উপন্যাস রচনার পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে চলেছে দিনলিপি রচনার ধারা। শুধু তাই নয়। এ-ও দেখতে পাই যে, তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'পথের পাঁচালী' বেরোবার (১৯২৯) আগে থেকেই তিনি দিনলিপি লিখছেন, 'স্মৃতির রেখা' নামে তা পরবর্তীকালে সংকলিত হয়েছে।

বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করার আগে বিভূতিভূষণের দিনলিপি-গুলির নাম ও সম্ভাব্য কালসীমার একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

(ক) স্মৃতির রেখা ॥ ২৭শে অক্টোবর ১৯২৪ থেকে ২৬শে এপ্রিল ১৯২৮।

(খ) তৃণাঙ্কুর ॥ ১৯শে জুন ১৯২৯ থেকে জানুয়ারী ১৯৩৯।

(গ) ঊর্মিমুখর ॥ মে ১৯৩৫ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৩৬।

(ঘ) উৎকর্ণ ॥ ১১ই অক্টোবর ১৯৩৬ থেকে ১৬ই নভেম্বর ১৯৪৩।

(ঙ) হে অরণ্য কথা কও ॥ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ও তৎপরবর্তী কিছু-দিনের রচনা। সম্ভবত 'উৎকর্ণ'র পরবর্তী কালপর্ব।

. এ ছাড়া অনেকটা এ ধরনের রচনার মধ্যে নাম করা চলে 'অভিযাত্রিক' ও 'বনে পাহাড়ে'। কিন্তু এগুলি যথার্থ 'ডায়েরী' নয়। কিছুটা 'ডায়েরী'র ভঙ্গিতে লেখা হলেও আসলে ভ্রমণ-কাহিনী। অর্থাৎ লেখকের আপন অন্তরঙ্গ সত্তার সহজ আত্মপ্রকাশের প্রবণতা এখানে তেমন ফুটে ওঠে নি। বরং ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনার বস্তুনিষ্ঠ ভঙ্গিটাই এখানে অধিকতর প্রকট।

বিভূতিভূষণের জন্ম ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে। মৃত্যু ১৯৫০-এ। উপরের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ৩০ বছর বয়স থেকে শুরু করে প্রায় সারাজীবন ধরেই তিনি ডায়েরী লিখে গেছেন। আর এই ডায়েরী রচনার সময়-সীমা যেমন সুদীর্ঘকালে প্রসারিত, তেমনি এর রচনার স্থানবৈচিত্র্যও যথেষ্ট। বিভূতিভূষণ নিজেই এ সম্পর্কে 'ঊর্মিমুখর'-এর একেবারে শেষে বলেছেন :

"কত জায়গায় বসেই কত ডায়েরী লিখলুম, ভাগলপুরে, ইসমাইলপুর দিয়ারায়, আজমবাদ কাছারীতে, কাশীতে, রাখা মাইন্‌সে, নাগপুরে, কলকাতায়।"

বলা বাহুল্য, এটি সমগ্র তালিকা নয়। অংশমাত্র। তাঁর দিনলিপির পাতায় পাতায় চেনা-অচেনা অনেক মাটি-আকাশ-অরণ্যের ছায়া পড়েছে। বাঙলা, বিহার, ওড়িশ্যা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম—ভারতবর্ষের এক বৃহৎ ভূখণ্ড তাঁর দিনলিপির পটভূমি ও প্রেরণারূপে বিরাজ করেছে।

কোন লেখকের গল্প-উপন্যাস-কবিতাকে যে দৃষ্টি দিয়ে পড়ি, আলোচনা করি—তাঁর ব্যক্তিগত দিনলিপিকে নিশ্চয় সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করব না। বিভূতিভূষণের অন্য অনেক লেখায় তাঁর ব্যক্তিসত্তারই ছায়া পড়েছে সন্দেহ নেই, তবু মনে রাখতে হবে, সেগুলি সবই পাঠকসাধারণের জন্য অল্পবিস্তর সচেতন হয়ে লেখা। কিন্তু এখানে এই দিনলিপিতে সেই পাঠক নেই। সেই সচেতন শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসও নেই। এখানে কেবল বিভূতিভূষণের নিঃসঙ্গ একক সত্তার প্রকাশ। নিজের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া, নিজেকে কেবল নিজের কাছেই মেলে ধরা। 'তৃণাঙ্কুর' গ্রন্থের ভূমিকা-অংশে বিভূতিভূষণের নিজের উক্তি থেকেই কথাটি আরও স্পষ্ট করা যেতে পারে :

"বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনে মনের মধ্যে যে অনুভূতি জাগে, আমার এই দৈনন্দিন লিপিতে তাহাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে মাত্র।... বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে বা শান্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে মন যেখানে নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত ছিল—এই সব রচনার সৃষ্টি সেখানে। পুস্তকে বা পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশের জন্য এগুলি লিখিত হয় নাই। সেই জন্য বহুস্থলে

এই রচনাগুলির মধ্যে এমন জিনিস দেখা দিয়াছে যাহা নিতান্তই ব্যক্তিগত। লিপিকৌশলের ইচ্ছাও ইহাদের মূলে ছিল না।... যে অবস্থায় যেটি ছিল, অপরিবর্তিত ভাবেই সেগুলি ছাপা হইয়াছে। আমার জীবনে ব্যক্তিগত অনুভূতির অতীত ইতিহাসের দিক হইতে ইহার মূল্য আমার নিজের কাছে যথেষ্ট বেশি।"

তাই বিভূতিভূষণের এই একান্ত 'ব্যক্তিগত অনুভূতি'র নিভৃতলোকে প্রবেশ করতে হলে পাঠককে সাহিত্য-শিল্প-সচেতন মন থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র মন নিয়ে এগোতে হবে। একজন যথার্থ শিল্পীর রচনা পাঠ করছি, অথচ সেই রচনাকে তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির মত করে দেখা চলবে না—পাঠকের কাছে এই পরিস্থিতি কিছুটা অস্বস্তিকর হয়ত, কিন্তু উপায় নেই। আসলে এগুলি তো আমাদের অর্থাৎ পাঠকসাধারণের জন্য রচিতই হয় নি; আমরা এখানে হয়ত কিছুটা 'অনধিকার' প্রবেশ করছি। আড়ি পেতে শুনছি লেখকের নিভৃত মনের আত্মকথন।

বিভূতিভূষণের দিনলিপি নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনার প্রধান অসুবিধা, প্রাত্যহিক দিনলিপিতে সন তারিখের উল্লেখ নেই (একমাত্র 'স্মৃতির রেখা' ছাড়া)। এই অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'উর্মিমুখর' গ্রন্থে 'ভূমিকা'-অংশে শ্রীসজনীকান্ত দাস বলেছেন:

"......কোথাও সন তারিখের বালাই নাই, পাণ্ডুলিপিও আর পাওয়া যায় না। এইগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিভূতিভূষণের জীবনের ইতিহাসও খণ্ডিত হইয়াছে।"

এমনিতেই আমরা দেখি যে আত্মজীবনী ধরনের গ্রন্থে যে কালগত স্তর-পারম্পর্য থাকে, তা দিনলিপিতে সাধারণত থাকে না। কতকগুলো বিচ্ছিন্ন দিনের এলোমেলো ঘটনা চিন্তা অনুভূতি নিয়েই দিনলিপির জগৎ। সেখানে ঘটনা বা চিন্তাভাবনা নিজেদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করে না। সেখানে একমাত্র যোগসূত্র হল দিনলিপি-লেখকের মন। কিন্তু বিভূতি-ভূষণের দিনলিপিতে সন-তারিখের বিশেষ উল্লেখ না থাকায় সেই মনের সূক্ষ্ম বিবর্তন বা রূপান্তরের গতিপথটি তেমন স্পষ্ট করে নির্ধারণ করা যায় না। তবে মোটামুটিভাবে সমগ্র গ্রন্থের যে কালসীমা আগেই দেওয়া হয়েছে তা থেকে এই মানস বিবর্তন অনুমানের কতকটা সুযোগ মেলে। এ থেকে অবশ্যই এটা অনুমতি হয় যে, বিভূতিভূষণের মনের তেমন কোন সুস্পষ্ট বিবর্তন

এই দীর্ঘ কালপর্বে ঘটেনি। 'স্মৃতির রেখা' থেকে 'হে অরণ্য কথা কও' পর্বের মধ্যে পঁচিশ বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু পঁচিশ বছর আগে ও পরে বিভূতিভূষণের মনের চেহারা যেন অবিকল এক। 'তৃণাঙ্কুর'-এর লেখক ও 'ঊর্মিমুখর'-এর লেখক কিংবা 'উৎকর্ণ'-এর লেখকের মধ্যে তেমন কোন স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্য কি চোখে পড়ে, যা উল্লেখযোগ্য? এই প্রসঙ্গে বলা চলে সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের মৌল দৃষ্টিভঙ্গীতে ঐক্যসূত্র লক্ষ্য করা গেলেও বিষয় নির্বাচন বা চরিত্র বিন্যাস বা অন্য যে কারণেই হ'ক, তাঁর উপন্যাসের জগতে এই স্বাতন্ত্র্য কিন্তু একেবারেই দুর্লক্ষ্য নয়। 'আরণ্যক'-এর স্রষ্টা এবং স্কুলশিক্ষকের জীবনচিত্র 'অনুবর্তন'-এর লেখক কিংবা 'দেবযান'-এর রচয়িতা ও 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-এর স্রষ্টার শিল্পকৃতির মধ্যে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে না কি? তাই তাঁর উপন্যাসসমূহ বিচারের সময় স্বভাবতই তাদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনার সার্থকতা বা প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাঁর দিনলিপিগুলির প্রত্যেকটি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার অবকাশ তেমন নেই। এদের সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনাই বোধহয় যথেষ্ট এবং বলা যেতে পারে, সঙ্গতও। অবশ্য বর্তমান সমীক্ষায় প্রসঙ্গক্রমে তাদের কোন কোনটি নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা যে অপরিহার্য, এ কথা বলাই বাহুল্য।

সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা ও উপকরণ এবং সহজ মানবীয় রূপ—দিনলিপিতে লেখকের এই দুটি মুখ্য পরিচয় বোধ হয় পাঠকের অভীষ্ট। কিন্তু বিভূতিভূষণের দিনলিপিগুলিতে এই দুটি পরিচয় পৃথক্‌ভাবে খুব বেশী পাওয়া যায় না। বস্তুত তাঁর পক্ষে তাঁর ব্যক্তিগত সহজ জীবনধারা এবং তাঁর সৃষ্টির ধারা, এ দুটো তেমন কোন স্বতন্ত্র ব্যাপার নয়। দুটি ধারা প্রায়শই অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেছে তাঁর জীবনে—দিনলিপিতে তারই প্রতিফলন দেখতে পাই।

তবু আলোচনার সুবিধার জন্য কতকটা পৃথক্‌ভাবে সমীক্ষার হয়ত প্রয়োজন আছে। গভীর জীবনরসপিপাসু এবং প্রকৃতি ও জীবনের রহস্য-সন্ধানী লেখক বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে যে নিভৃত চিন্তা ও নিগূঢ় অনুভবের আশ্চর্য প্রকাশ, তাই যে বস্তুত তাঁর গল্প-উপন্যাসের মুখ্য প্রেরণারূপে সক্রিয় হয়েছে, তাতে বোধ করি সন্দেহ নেই। তবে সমারসেট ম'ম তাঁর 'Note-Book'কে 'Storehouse of materials for future use and nothing else' বলে অভিহিত করেছেন। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে ভাবী রচনার জন্য সেই ধরনের উপকরণ সংগ্রহের সচেতন প্রয়াস তেমন চোখে পড়ে না।

অবশ্য কিছু কিছু এমন পংক্তি তাঁর দিনলিপিতে এখানে ওখানে পাওয়া যায়, যার সঙ্গে তাঁর রচিত উপন্যাসের কোন কোন অংশের যথেষ্ট সাদৃশ্য, এমন কি দু'এক স্থলে প্রায়অবিকল মিল চোখে পড়ে। সেই সাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত দেবার আগে আরেকটি কথা বলি। বিভূতিভূষণের সাহিত্যসৃষ্টি-সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে মাঝে মাঝে দেখতে পাই যে তিনি যখন যে-পরিবেশে বাস করেছেন, উপন্যাসে তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, হয়ত বা কিছুটা বিপরীত পটভূমি সৃষ্টি করেছেন। অন্তত দু'খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সম্পর্কে একথা সত্য। 'স্মৃতির রেখা' থেকে জানা যায় যে, তিনি দূর দুর্গম আরণ্য পরিবেশে বসে 'পথের পাঁচালী'র গ্রামবাংলার সহজ ঘরোয়া জীবনের ছবি আঁকছেন। আবার 'উৎকর্ণ'-পর্বে পল্লীবাংলার শান্তস্নিগ্ধ পটভূমিতে বসে লিখছেন 'আরণ্যক'-এর রহস্য-বিস্ময়-ভরা অচেনা জগতের কাহিনী। এটা চাঞ্চল্যকর কোন তথ্য নয়। কারণ আমাদের ত' একথা অজানা নয় যে, লেখকের জীবন-অভিজ্ঞতা কিছুটা স্মৃতির রসে জারিত না হলে, লেখকের মন কোন ঘটনা সম্পর্কে নির্লিপ্ত দ্রষ্টার ভূমিকা না নিতে পারলে যথার্থ সৃষ্টি সম্ভব নয়। তবু উপরের তথ্যটুকু উদ্ধার করলাম এই কথার উপরেই বিশেষ জোর দিতে যে, যা অতীত, যা কিছু পরিমাণে অস্পষ্ট স্মৃতির সামগ্রী, তার প্রতি বিভূতিভূষণের এক ধরনের বিশেষ মোহ আছে। তাই 'স্মৃতির রেখা'র আরণ্য পটভূমিতে বসে পল্লী-বাংলাকে ঘিরে **nostalgic** শৈশব স্মৃতির রোমন্থন তাঁর অতি প্রিয় বিষয়।

'স্মৃতির রেখা'য় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত'র ভাঙাচোরা খণ্ডাংশ। এই গ্রন্থের একস্থানে (১৯১৮ সালের ২১শে মার্চ) লেখক লিখছেন :

"সেই ফুলগাছ দেখে এসে বাঁশতলায় বসা—পিসিমার কঞ্চিকাটা বাঁশবন, মার হাতের হাঁড়ী-কলসী পোড়ো ভিটায় পড়া—মার হাতের পোঁতা সজনে গাছ…"

পরদিন ২২শে মার্চ আবার লিখছেন :

"আমার মায়ের হাতে-পোঁতা সজনে গাছ—ভাঙা কলসী—হরি রায়ের বিষয়—"

'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত'র নিষ্ঠাবান্ পাঠক মাত্রই বুঝতে পারছেন উপন্যাস দুটিতেও উপরের ওইসব তুচ্ছ উপকরণগুলি স্মৃতির মেদুর আলোয় কি লোকোত্তর মহিমা লাভ করেছে।

'স্মৃতির রেখা'র একস্থানে লেখক যা লিখেছেন, 'অপরাজিত' উপন্যাসের পৃষ্ঠায় তাই প্রায় অবিকলভাবে স্থান পেয়েছে। দিনলিপিতে (১লা বৈশাখ, ১৩৩৫) বিভূতিভূষণ লিখছেন :

"কোথায় লেখা থাকবে তার তিন হাজার বৎসর পূর্বের এক বিস্মৃত অতীতের সে সব আনন্দ ভরা জীবনযাত্রা, বহুদিন পরে বাড়ী ফিরে মায়ের হাতে বেলের পানা খাওয়ার মধুময় চৈত্র অপরাহ্নটি, বাঁশবনের ছায়ায় অপ-রাহ্নের নিদ্রা ভেঙে পাপিয়ার যে মনমাতানো ডাক . কোথায় লেখা থাকবে বর্ষা দিনের বৃষ্টিসিক্ত রাত্রিগুলোর সে সব আনন্দ কাহিনী ? দূর ভবিষ্যতের যে সব তরুণ বালক-বালিকার মনে এই কালবৈশাখীর নব নব আনন্দের বার্ত্তা আনবে, কোন্ পথে তারা আসবে ?..."

'অপরাজিত' উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে যেখানে অপু পঁচিশ বছর পরে আবার নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে ফিরে এসেছে, তখনকার অনুভূতির অংশ-বিশেষ উপরের ওই দিনলিপির উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে ভাষা ও বিন্যাসগত আশ্চর্য সাদৃশ্য বহন করছে। কৌতূহলী পাঠক সেটি সহজেই দেখে নিতে পারেন।

এছাড়া 'আরণ্যক'-এর প্রেরণা ও উপকরণের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় 'স্মৃতির রেখা' থেকে। মনে রাখতে হবে 'স্মৃতির রেখা'র পৃষ্ঠাগুলি যখন লিখছেন, তখন 'আরণ্যক' রচিত হয়নি। সেটি রচিত হয়েছে তার অনেক পরে—যখন বিভূতিভূষণ 'উৎকর্ণ' গ্রন্থভুক্ত দিনলিপি লিখছেন। কিন্তু 'আরণ্যক'-এর সমস্ত অভিজ্ঞতা লেখক সংগ্রহ করেছেন 'স্মৃতির রেখা' পর্বে—তখন তিনি কর্মসূত্রে ভাগলপুর অঞ্চলের গভীর অরণ্য-প্রদেশে দীর্ঘদিন আছেন। সমগ্র 'স্মৃতির রেখা' গ্রন্থে সাধারণভাবে 'আরণ্যক'-এর পরিবেশের বর্ণনা নানান্ জায়গায় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। এছাড়া বিশেষ ভাবে উপন্যাসটির চতুর্থ পরিচ্ছেদের গোড়ায় বর্ষণমুখর পুণ্যাহ উৎসবের দিনে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে দরিদ্র অরণ্যবাসী নরনারীর নগণ্য 'ভোজে'র খাদ্য খাওয়ার যে চিত্তস্পর্শী বর্ণনা আছে, তার পূর্বাভাষ আছে 'স্মৃতির রেখা'র ২৭শে জানুয়ারী, ১৯২৮-এর দিনলিপিতে। অনুরূপ আরেকটি সুস্পষ্ট সাদৃশ্যের উল্লেখ করতে পারি। 'আরণ্যক'-এর পঞ্চম পরিচ্ছেদে যে গ্রাম্য হোলির মেলার বর্ণনা আছে ; এমন কি মেয়েরা ওদেশে পরস্পর দেখা হলে যে মায়াকান্না কাঁদে, সেই ঘটনা। এমনকি নিরীহ গোবেচারী দরিদ্র গিরিধারীলালের কথা পর্যন্ত ৫ই ফেব্রুয়ারীর দিনলিপিতে সমস্তই পাওয়া যাচ্ছে।

দিনলিপির পাতা থেকে এমনি সৃষ্টির উৎস বা উপকরণের কিছু কিছু প্রত্যক্ষ পরিচয় অবশ্যই মেলে। 'অনুবর্তন' উপন্যাসের হেডমাস্টার 'ক্লার্ক-ওয়েল' সাহেব যে নিতান্ত লেখকের কল্পনাসৃষ্ট চরিত্র নয়, তাঁর শিক্ষকজীবনেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত, তার লিখিত প্রমাণ আছে 'হে অরণ্য কথা কও'-এর ১০৯ পৃষ্ঠায় (৩য় মুদ্রণ)। আবার পক্ষান্তরে 'তৃণাঙ্কুর'-এর দিনলিপি থেকে জানতে পারি যে, 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত'র 'দুর্গা, রাণুদি, লীলা, কাজল —এরা সত্য সত্যই কল্পনাসৃষ্ট প্রাণী। কোন দিকে এদের কোন ভিত্তি নেই.. কল্পনা ছাড়া।' (তৃণাঙ্কুর [৩য় সং] ৬৮ পৃঃ)। আর সেই সঙ্গে লেখকের এই স্বীকারোক্তিও মূল্যবান্ যে অপু ও সর্বজয়ার সঙ্গে যথাক্রমে স্বয়ং লেখকের ও তাঁর মা'র আংশিক সাদৃশ্য আছে। বিভূতিভূষণের অনুরাগী পাঠকের কাছে এ সমস্ত তথ্যই যথেষ্ট মূল্যবান্ সন্দেহ নেই।

এভাবে সৃষ্টির উপকরণ দিনলিপির পৃষ্ঠায় অন্বেষণ করতে গিয়ে একটা ব্যাপার সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটা দেখেছি যে উপন্যাস-গল্পে রূপ দেবার আগেই লেখকের নানা অভিজ্ঞতা-অনুভূতি ইতস্ততঃ দিনলিপিতে স্থান পেয়েছে। খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় যেখানে দেখছি, উপন্যাস বা গল্পের পৃষ্ঠায় পূর্ণায়ত রূপলাভের পরেও সেই অনুভূতি ও বিষয় দিনলিপির পাতায় আত্মপ্রকাশ করেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগে লেখা 'আরণ্যক'-এর অন্তর্গত নানা অনুভূতি ও চিন্তার অনুরূপ ভাবনার প্রতিধ্বনি ওই গ্রন্থ-প্রকাশের পরবর্তীকালে রচিত দিনলিপি 'হে অরণ্য কথা কও'-এর পৃষ্ঠায় শুনতে পাওয়া যায়। 'আরণ্যক'-এর (৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ২৫২ পৃঃ) পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের ৩ সংখ্যক অংশের একেবারে শেষ দুটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে 'হে অরণ্য কথা কও'-এর (৩য় মুদ্রণ) ১৬০ পৃষ্ঠার অংশবিশেষের গভীর ভাবসাদৃশ্য চোখে পড়ে, যেখানে লেখক লিখছেন :

"আর শুধুই ছবি মনে আসে সে বিরাট দেবতার, কত ভাবে, কত দিক থেকে।.. বিশ্ব রচনা দেখে মনে হয় এর মধ্যে কোন বিরাট শিল্পচেতনা সব সময়ে সক্রিয়।...মহাকবি তিনি, অনাদ্যন্ত শাশ্বত যুগ ধরে এই রকম শিলাস্তৃত ঝর্ণার তটে, অনন্ত নীহারিকা মণ্ডলী ছড়ানো আকাশপটে, বনকুসুমের পাপড়ির দলে, বিহঙ্গ কাকলীতে...জাতির উত্থানপতনে, চাঁদের আলোয়, তরুণীর নির্মল প্রেমের ব্যথায়, শোকে, বিরহের গানে, অগ্নিপুচ্ছ ও ধূমকেতু দলের যাতায়াতে...তিনি আপনমনে তাঁর বিরাট এপিক কাব্য লিখেই চলেছেন...।"

আর 'অপরাজিত' বেরোবার অনেক পরে লেখা 'উৎকর্ণ' গ্রন্থের পাতায় পাতায় 'অপরাজিত'র শেষ অংশের অর্থাৎ দীর্ঘকাল পরে অপুর আবার নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে ফিরে আসার মানসপ্রতিক্রিয়ার রসানুভূতির আভাস পাওয়া যায়।

এইসব আলোচনা থেকে এটাই মনে হয় যে, বিভূতিভূষণের দিনলিপি তাঁর কাছে 'A writer's note book' ছিল না কোনদিন। এখানে তাঁর রচনার উপকরণ বা খসড়ার অংশ বিশেষকে স্বতন্ত্রভাবে সন্ধান করলে ভুল হবে। এই ধরনের দিনলিপি তিনি কেন লিখতেন, তা এক জায়গায় বিভূতিভূষণ নিজেই স্পষ্ট করে বলেছেন :

"আমি সব তুচ্ছ·· খুঁটিনাটি লিখি এই জন্যেই যে, সবশুদ্ধ দিনটাকে ও তার আবহাওয়াটাকে অনেক দিন পরে আবার ফিরে পাওয়া যাবে। বড় আনন্দ হয়।" (স্মৃতির রেখা, ৪৬ পৃঃ)

বস্তুত যথার্থ 'ডায়েরী'-ধর্মী রচনার পিছনে লেখকের মনোভাব বোধহয় সর্বত্র ওই একই। অর্থাৎ তা পরবর্তী রচনার উপকরণের আধার মাত্র নয়, তা লেখকের নিগূঢ় ব্যক্তিসত্তার স্বচ্ছতম দর্পণ। দিনলিপিতে লেখকের ব্যক্তিত্বের যে আত্মপ্রকাশ, তার প্রতিফলন অবশ্যই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পড়তে পারে। এবং প্রায়শ তা পড়েও। বিশেষত, বিভূতিভূষণের মত 'সাবজেকটিভ' দৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পীর রচনায় ত বটেই। সুতরাং সে হিসাবে দিনলিপি থেকে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিস্বরূপের অন্বেষণ বা পরিচয় লাভের দ্বারা তাঁর সাহিত্যের রসোপলব্ধির পথই যে অনেকখানি প্রশস্ত হয়ে যায়, একথা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। তবু দিনলিপির ভিতরকার বিভূতিভূষণের ব্যক্তিপরিচয়ের অন্বেষণেরও বোধহয় একটা স্বতন্ত্র আস্বাদ ও সার্থকতা আছে। সেটা বোধহয় কতকটা এই রকম মনোভাব থেকে উদ্ভূত যে, যদি বিভূতিভূষণ আদৌ উপন্যাস-গল্প না লিখতেন তাহলে এই ক'খানি 'ডায়েরী' থেকে তাঁর সত্তার কী রূপের পরিচয় পেতাম আমরা ?

দিনলিপিগুলি থেকে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিসত্তার যে-রূপটি পাঠকের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে, তা হল তাঁর সজীব চলমান পথিক রূপ। 'পথের পাঁচালী'র স্রষ্টার মনের এই অন্তহীন জীবনপিপাসা ও জগৎ-জীবন সম্পর্কে এই ক্লান্তিহীন বিস্ময়বোধ আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত নয়। সারা জীবন ধরে বিভূতিভূষণ কেবল এক স্থান থেকে অন্যস্থানে, পাহাড়ে বনে জঙ্গলে লোকালয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দিনলিপিগুলি তাঁর সেই সব ভ্রমণের

স্মৃতি বহন করছে। 'স্মৃতির রেখা'র এক জায়গায় বিভূতিভূষণ বলছেন :

"আমি পথে নেমেছি। আমি কিছুর মধ্যে নেই, অথচ সবের মধ্যেই আছি—জগতের এই অপূর্ব গতির রূপ আমার চোখে পড়েছে। আমি আজন্ম পথিক।"

বিভূতিভূষণের পক্ষে এই পথ-চলা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তাঁর অতীত স্মৃতির জগৎ ও লোক-লোকান্তরব্যাপী কল্পনাকে আশ্রয় করে। অর্থাৎ Space ও Time-এর মধ্যেও তাঁর চলমান পথিকসত্তার গতিশীল কল্পনা অনুস্যূত হয়ে আছে। বিভূতিভূষণ লিখছেন :

"আমি এই যাওয়া-আসার স্বপ্নে ভোর হয়ে বড় আনন্দ পাই। আবার যে আসতে হবে তারপর, তাও আমি জানি। হয়ত একবার এসেছিলাম দূর কোন ঐতিহাসিক যুগে—হয়তো রোমের দ্রাক্ষালতার কুঞ্জের আড়ালে ভূমধ্য-সাগরের নীলজলের তীরের কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর প্রাসাদে। হয়তো প্রাচীন গ্রীসের গৌরবের দিনে গ্রীকবীর হয়ে জন্ম নিয়ে ছিলাম...নয়তো কোন পাহাড়ের ছায়ায় বসে এই রকম স্বপ্ন দেখতাম...কে জানে ?

আবার বহুদূরে জন্মান্তরে হয়তো ফিরতে হবে। পাঁচশো বছর পরের সূর্যের আলোকে একদিন অসহায় অবোধ শিশু নয়ন দুটি মেলবো।"

—(স্মৃতির রেখা, ৫৮ পৃঃ)

এই রোম্যান্টিক গতিচেতনা বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্বের অচ্ছেদ্য অংশ। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ' ইত্যাদি উপন্যাসের নায়কদের অনুভূতিতে লেখকের এই অক্লান্ত নিজস্ব উপলব্ধি বা প্রত্যয়েরই প্রতিফলন ঘটেছে। সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র এটি নয়। আমরা শুধু এটুকুই বলবো যে, বিভূতিভূষণের মনে যে-বন্ধনমুক্তির প্রবল পিপাসা তাঁকে বারবার নগরজীবনের কৃত্রিম পরিবেশ থেকে প্রকৃতির উন্মুক্ত সহজ পটভূমির দিকে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করেছে, তার সঙ্গেও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে তাঁর সত্তার মজ্জাগত গূঢ় গতিচেতনা। মানুষের নিত্য পরিবর্তমান জঙ্গমরূপের মধ্যেই তার জীবনের অমেয় মহিমা।

তাই প্রকৃতির বিচিত্র বিকীর্ণ সৌন্দর্য ও ঈশ্বরের লোকোত্তর মহিমা—দুই-ই বিভূতিভূষণের মনে গতিচেতনার প্রবহমান ছন্দের মধ্যেই উদ্ভাসিত ও তাৎপর্য-পূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে তিনি তাঁর গতিচঞ্চল ভ্রাম্যমান জীবনের পথে পথেই উপভোগ করেছেন। আর শুধু তাই নয়, প্রবহমান কালচেতনা

ও পরিবর্তমান বিশ্বচেতনা দিয়ে ঘেরা এই জীবনের গূঢ় সত্যের রহস্য উন্মোচনের অন্যতম চাবিকাঠি হিসাবে তিনি প্রকৃতিকেই আশ্রয় করেছেন। অর্থাৎ বিভূতিভূষণের অধ্যাত্মচেতনার মধ্যেও এই বিশাল বিশ্ব প্রকৃতির অন্তরালবর্তী এক লোকোত্তর পথিকসত্তারই প্রতিচ্ছবি বারবার ফুটে উঠেছে। তাঁরই জয়ধ্বনি দিযে বিভূতিভূষণ 'তৃণাঙ্কুর'-এর এক জায়গায় বলেছেন :

"শত শত জন্মমৃত্যুর মধ্য দিযে যাঁর চলাচলের পথ—জয় হউক সে দেবতার, তাঁর গতির তেজে সম্মুখের ও পশ্চাতের অমুক্তির অন্ধকার জ্যোতির্ময় হউক, নিত্য সৃষ্টি জাযমান হউক তাঁর প্রাণচক্রের নিত্য আবর্তনশীল বিশাল পরিধিতে।"

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে ও ছোটগল্পে যেমন, তেমনি তাঁর দিনলিপির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে প্রকৃতি-সৌন্দর্য-সম্ভোগের আনন্দময় অভিজ্ঞতার বিচিত্র ছবি। পাহাড নদী অরণ্য প্রান্তর রক্তমেঘস্তূপ, এমন কি সামান্য আশশ্যাওড়া, ঘেঁটুফুলের ঝোপ, সজনের ডাল, নিমফুল—প্রকৃতির যে কোন সৌন্দর্যবস্তুর সংস্পর্শেই অভিভূত হবার বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী বিভূতিভূষণ। আসলে, প্রকৃতির বাইরেকার সৌন্দর্য অতিক্রম করে তার অন্তরশায়ী নিগূঢ় সৌন্দর্য-সত্তার উপলব্ধি তাঁর সহজে অনায়াসে ঘটে বলেই প্রাকৃতিক উপকরণ তাঁর কাছে অনেক সমযেই গৌণ। miel তাঁর 'Journal Intime'-এ যে বলেছেন 'প্রতিটি নিসর্গ দৃশ্যই যেন আত্মার এক একটি স্বতন্ত্র প্রকাশ'—বিভূতিভূষণও তাঁর দিনলিপির অসংখ্য স্থানে নানাভাবে সেই কথাই যেন উচ্চারণ করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

"শুধু ঐ ক্ষুদ্র তিৎপল্লার লতা আর ফুল নয়, এক অদ্ভুত ও আশ্চর্য জিনিস দেখি ওর মধ্যে। ও সামান্য বনলতা নয়। গভীর নিঃশব্দতার মধ্যে সন্ধ্যায় এক মনে ওর দিকে চেয়ে দেখো।...ক্ষর ব্রহ্মের প্রাণময়ী বার্তা বহন করে এনেচে ওই বন্যলতা লোক লোকান্তরের অসীমতা থেকে। যে মহাশিল্পীর হাতের ও অতি সুকুমার শিল্প, সেই শিল্পীর স্বাক্ষর আছে ওর পাতায় ফুলে, লাবণ্যময় ঝুলুনিতে। ওর মধ্যে দিয়েই তাঁকে প্রত্যক্ষ কর।"

(হে অরণ্য কথা কও—১৬৬ পৃঃ)

কেবল প্রকৃতির ভিতর থেকেই নয়, মানব সংসার থেকেও নিগূঢ় জীবনরস আহরণ করেছেন বিভূতিভূষণ। আর সে মানুষ ঐশ্বর্যবান, ক্ষমতাশালী অসামান্য কেউ নয়। গ্রামের অতি সাধারণ নগণ্য মানুষ। শহরের অনেক প্রতি-

শক্তিশালী বিদগ্ধ মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, 'তৃণাঙ্কুর'-এ এ ধরনের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা আছে। তাঁদের সাহচর্য তাঁর কাছে আনন্দদায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু যেন মনে হয় তাঁর অন্তরের গূঢ় আকর্ষণ বিদগ্ধ নাগরিক মানুষের চেয়ে সরল অখ্যাত গ্রামবাসীর প্রতি অধিকতর। আর এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি বিভূতিভূষণের দৃষ্টির এক বিচিত্র ধরনের নির্লিপ্তি সম্পর্কে। বিভূতিভূষণের ব্যক্তিসত্তার একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য—একই সঙ্গে দেশ ও কালের সীমাহীন চেতনার মহৎ উপলব্ধি এবং গ্রাম বাঙলার নগণ্যতম অতি-অশিক্ষিত ও দরিদ্র মানুষের সঙ্গে একান্ত সহজ আত্মিক বন্ধন। শুধু এটুকু বললেই বোধ হয় সব বলা হল না। তাঁর দিনলিপিতে দেখতে পাচ্ছি, প্রকৃতির প্রগাঢ় আস্বাদ ও উপলব্ধিতে যখন তাঁর মন অনন্তের অভিমুখী হয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই আবার তা মর্ত্যজীবনের তুচ্ছ দৃশ্য বা ঘটনার মধ্যে নিজেকে অতি সহজে মিলিয়ে দিয়েছে। একটি থেকে আরেকটিতে উত্তরণ একান্ত স্বতঃস্ফূর্ত ও অনায়াস; 'উর্মিমুখর' থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিই।

"যখন নদীর ঘাটে এসে নামলুম স্নান করতে তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে শুধু বৃশ্চিকের একটা নক্ষত্র অস্পষ্টভাবে জ্বলচে। মাথার ওপর দ্যুলোক, চারিদিকে নীরব অন্ধকার। নদীজল ও গাছপালার দিকে চেয়ে মনে যে ভাব এল, তা মানুষকে অমরতার দিকে নিয়ে যায়। বুড়ো ছকু পাড়ুই এই সময় তার স্ত্রী আদাড়িকে সঙ্গে করে নদীতে গা ধুতে এল। সে অন্ধকারে চোখে দেখতে পারে না বলে স্ত্রী ওর সঙ্গে এসেচে।" (৯ পৃঃ)

বস্তুত জীবন ও জগতের সব কিছুকেই সহজভাবে স্বীকার করে নেওয়ার এক সুদুর্লভ মানসিকতার অধিকারী বিভূতিভূষণ; আর সেই সঙ্গে চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে আকাশ নক্ষত্র ও অমরতার উপলব্ধির সঙ্গে বুড়ো ছকু পাড়ুই ও তার স্ত্রী আদাড়ির প্রতি সহমর্মিতায় কোথাও এতটুকু বিরোধ বা অসঙ্গতির আভাসমাত্রও নেই।

বিভূতিভূষণের দিনলিপিগুলিতে কালচেতনা তথা গতিচেতনা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ প্রবণতার কথা আগেই বলেছি। সেই কালচেতনার একটি বিশেষ প্রকাশের বিষয়ে দু'একটি কথা বলতে চাই। সেটি তাঁর মনের nostalgic প্রবণতা। তাঁর দিনলিপিগুলিতে বারবার এই মনোভঙ্গীটি আত্মপ্রকাশ করেছে। বিভূতিভূষণ নানা সময়ে নানান্ স্থানে ভ্রমণ করেছেন। শৈশবের আবাস বারাকপুর ছেড়ে তাঁকে কর্মসূত্রে ও ভ্রমণ উপলক্ষে

ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে যেতে হয়েছে। কিন্তু যখন যেখানেই গেছেন, বা কিছু দেখেছেন, তার মধ্যে থেকেই বারবার পিছন ফিরে শৈশব বা বাল্যের মধুর স্মৃতিরসসিক্ত স্বীয় গ্রামের সহজ জীবনানুভূতিতে তিনি অবগাহন করেছেন। অর্থাৎ প্রবাসের জীবন-পরিবেশ থেকে তিনি যত আনন্দই পান না কেন, সেই আনন্দ তাঁর কাছে মধুরতর হয়েছে কেবল তখনই, যখন তার সঙ্গে মিশেছে অতীতের nostalgic স্মৃতিরস। তাঁর মনের প্রতিটি তন্ত্রী অতীতের ফেলে-আসা দিনগুলির সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা যে, সামান্য ঘটনার ইঙ্গিত বা লঘুস্পর্শেই তা ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে। সমগ্র সত্তা দিয়ে বিভূতিভূষণ আবিষ্ট চিত্তে সেই বিচিত্রমধুর অনুভূতির স্বাদ গ্রহণ করেন। তাঁর ডায়েরীতে এই ধরনের অনুভূতির দৃষ্টান্ত মিলবে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 'স্মৃতির রেখা' থেকে। বিহারের অরণ্য-পরিবেশে যখন বিভূতিভূষণ দিন কাটাচ্ছেন, তখনকার একদিনের (২০শে মার্চ, ১৯২৮) দিনলিপির অংশ বিশেষ :

"আসতে আসতে রণপাল মণ্ডলের ক্ষেতের কাছে জঙ্গলটার সামনেই দেখলাম জমাদার আসছে পরশুরামপুর থেকে—বললে, কুলীরা সব পৌঁছে গিয়েছে। জঙ্গলটার কি সোঁদা সোঁদা গন্ধ। বার হবেই লোধাই টোলার ধাপটার ওপারে উন্মুক্ত প্রান্তর, দূরের পাহাড়, হু হু উন্মুক্ত হাওয়া, আবার সেই পাকা ফসলের গন্ধ—আঃ এই জীবন! ভাবছিলাম সেই কতদিন আগে পিসিমা এল, ঠাকুরমাদের পাশের পথটা দিয়ে—আমি ও বাবা এসেছি মামার বাড়ী থেকে, পিসিমা কঞ্চিঘাটে—সেই সব দিনগুলো।"

কেবল অতীত দিনের স্মৃতিমন্থনেই তাঁর nostalgic প্রবণতার প্রকাশ ঘটেছে এমন নয়। প্রবাসী লেখকের মনে সেই মুহূর্তটিতে বহুদূরবর্তী আপন গ্রামের নরনারীর সহজ জীবনযাত্রা ও গ্রাম্যপ্রকৃতির মধুর ভাবনা অকস্মাৎ উদিত হবে তাঁর চিত্তকে এক বিচিত্ররসে উদ্বেল করেছে। 'উৎকর্ণ' থেকে একটি দৃষ্টান্ত :

"সন্ধ্যায় গৌহাটিতে নামবার পথে মণি ডাক্তারের কথা ভেবে দেখলুম। গাঁয়ের হাটতলায় সে এতক্ষণ সেই মুদীর দোকানটাতে বসে গান করচে। হয়তো বেচারা এবারও বাড়ী যেতে পারেনি। সামনে সূর্যাস্তকে লক্ষ্য করেই যেন মোটর ছুটেচে, সামনে কামাখ্যা দেবীর মন্দির পড়ল একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায়। খুকু এতক্ষণ হয়তো গাঙ থেকে গা ধুয়ে ফিরে এল। জঙ্গলে ভরা পোড়ো ভিটেটাতে ছায়া পড়ে এসেচে।" (পৃঃ ৭০)

বিভূতিভূষণ যদি উপন্যাস বা ছোট গল্প আদৌ না লিখে কেবল এই ক'খানা দিনলিপি লিখে রেখে যেতেন, তাহলেও তাঁর ব্যক্তিসত্তার যে সব দিক পাঠকের সামনে উন্মোচিত হত, সে সব দিক নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করলাম। কিন্তু এইসব নানান্ প্রবণতার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে পর্যালোচনার পরেও সামগ্রিকভাবে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিস্বরূপের একটি চিত্রই বিশেষরূপে পাঠকের হৃদয় আকর্ষণ করে। সে ছবি সহজ নিরভিমান বালকসুলভ সারল্য ও কৌতূহলের অধিকারী প্রাণবন্ত এক মানুষের ছবি। যতদূর জানা যায়, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ থেকে বিভূতিভূষণ 'ডায়েরী' লিখতে শুরু করেন। তার আগে থেকেই বাঙালী তরুণ বুদ্ধিজীবী মহলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের নানা জটিল চিন্তা-ভাবনা সংশয় জিজ্ঞাসা ও অস্থির মূল্যবোধের সংঘাত-সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। বিভূতিভূষণ কিন্তু সে সব জটিলতা থেকে বিস্ময়কর রূপে মুক্ত। তাঁর অধ্যয়ন ও মননের পরিধি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র কক্ষপথে তাঁর যাতায়াত আছে, দিনলিপি থেকে তার যথেষ্ট নিদর্শন মেলে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্বের গড়ন মননজীবীর নয়। জটিল মানসিকতা কোনদিনই তাঁর স্বক্ষেত্র নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছে, তখনকার এক-দিনের দিনলিপি ('হে অরণ্য কথা কও', পৃঃ ৯) থেকে বিভূতিভূষণের মনের এই বিশেষ প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়: "রোজ নদীর কালো জলে গিয়ে সন্ধ্যায় নামি। কালও কুঠির মাঠ বেড়িয়ে এসে সন্ধ্যায় স্নান করতে লাগলাম...। রাঙা মেঘ করেচে আকাশময়, সাঁইবাবলা গাছটার ফাঁকে ফাঁকে রাঙা আলো যেন আটকে আছে।... সাদা সাদা বক চরচে ঘন সবুজ কচুরি পানার দামে। এ জগতে যেন যুদ্ধ নেই, অশান্তি নেই, চালের দোকানের দীর্ঘ শ্রেণী নেই, উড়ন্ত এরোপ্লেন থেকে বোমাবর্ষণ নেই।" এই 'জগৎ'ই বিভূতিভূষণের একান্ত নিজস্ব জগৎ—বিশ্বের সমস্ত কোলাহল ও হলাহলের মধ্যে বাস করেও একটি সহজ অনাড়ম্বর নির্জন জীবনের প্রতি গূঢ় আকাঙ্ক্ষা। দিনলিপির পাতায় পাতায় এই নির্জনতাপিপাসু সহজ জীবনরসিক বিভূতিভূষণ পাঠকের একান্ত প্রত্যক্ষগোচর হয়ে আছেন।

আর একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এই আলোচনা শেষ করতে চাই। প্রসঙ্গটি আলোচ্য দিনলিপিগুলির শিল্প মূল্য নিয়ে। এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজ মনে হয় না। কারণ 'ডায়েরী' বা দিনলিপি বস্তুটা আদৌ কোন Art-form বা শিল্পরূপের অন্তর্গত কিনা সেটাই বিতর্কমূলক। যে গ্রহণ-বর্জন বা

নির্বাচন-রীতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পীকে অনিবার্যভাবে অনুসরণ করতেই হয় সেই নির্বাচন বা সচেতন গ্রহণ-বর্জনের অবকাশ দিনলিপিতে যৎসামান্য। প্রাত্যহিক জীবনের এলোমেলো ছড়ানো অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি সচেতন কারুকার্য ব্যতিরেকেই দিনলিপির পৃষ্ঠায় স্থান পায়। বিভূতিভূষণ নিজেই 'তৃণাঙ্কুর'-এর মুখবন্ধে স্বীকার করেছেন যে, এই 'ডায়েরী' রচনার পিছনে 'লিপিকৌশলের ইচ্ছা' বা 'লেখকমনের কারিকুরি প্রকাশের অবকাশ' আদৌ ছিল না। বর্তমান প্রবন্ধের গোড়ার দিকে আমরাও এই দিক থেকে বিচার করে বিভূতিভূষণের 'ডায়েরী'গুলিকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে সমীক্ষার প্রয়োজনের কথা উত্থাপন করেছি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে হয় শেষ ও সামগ্রিক বিচারে বিভূতিভূষণের (দিনলিপিগুলির একধরনের শিল্প-সার্থকতা) অবশ্যই আছে। সেটি স্বতন্ত্র ধরনের হতে পারে, কিন্তু তাই বলে শিল্পরূপ হিসাবে তার সার্থকতা একেবারে অস্বীকার করা বোধ হয় চলে না।

এ সম্পর্কে আর কোন মন্তব্য করার আগে আরেকটি প্রাসঙ্গিক কথা বলে নিই। আসলে বিভূতিভূষণের জীবনে এই ডায়েরী রচনা কোন বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ব্যাপার নয়। (এই আঙ্গিক-প্রকরণটি তাঁর মূল সাহিত্যসৃষ্টির ধারা থেকেও সম্পূর্ণ পৃথক কোন উদ্ভাবন নয়। তাঁর সত্তার গভীরে এই ধরনের একটি প্রবণতা নিহিত ছিল বরাবর। সেই প্রবণতার পুষ্টি ও বিকাশ ঘটেছে কতকটা সাধারণ দিনলিপির আকারে। আর কিছুটা কোন কোন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে।' 'আরণ্যক' এর উজ্জ্বল নিদর্শন। 'আরণ্যক'-এর মুখবন্ধে লেখক বলেছেন, "ইহা ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে—ইহা উপন্যাস।" এরকম সংশয় অপর কারো মনে জাগার আগেই লেখক তা নিরসনের চেষ্টা করেছেন। এ থেকে এটুকু বেশ বোঝা যায় যে, লেখকের মনেও প্রশ্ন জেগেছে। 'ডায়েরী'র ভঙ্গী বা প্রকরণের সঙ্গে যে 'আরণ্যক'-এর সাদৃশ্য আছে—এ সত্য লেখকের সঙ্গে সকল সচেতন পাঠকই স্বীকার করবেন। আর শুধু তাই নয়, 'আরণ্যক' উপন্যাসের উপকরণ বা পরিবেশের সঙ্গে "স্মৃতির রেখা' নামক দিনলিপির যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য চোখে পড়ে সেকথা প্রবন্ধের মধ্যে আগেই বলেছি। বস্তুত 'আরণ্যক'-কে 'স্মৃতির রেখা', নামক দিনলিপিরই বহুলাংশে সংশোধিত এবং কিছুটা বস্তুনিষ্ঠ কাহিনী-সম্বলিত সংস্করণ-বিশেষ বললে একেবারে মিথ্যা বলা হয় না। (অর্থাৎ দুটি গ্রন্থ মূলত প্রায় এক জাতেরই।

'ডায়েরী'র একটি লক্ষণ তার গঠনের শিথিলতা। অন্তত ডায়েরী-ধর্মী উপন্যাস 'আরণ্যক'-এ এই শিথিলতা সহজেই চোখে পড়ে। এই উপন্যাসে এমন অনেক অংশ আছে যা বর্জন করলে কিংবা আগের অংশ পরে কিংবা পরের অংশ আগে বিবৃত করলে উপন্যাসটির রসাবেদনের বিশেষ কোন তারতম্য হয় না। 'পথের পাচালী'র গঠনরীতিতেও এই শিথিলতা চোখে পড়ে। আসলে বিভূতিভূষণের শিল্পবোধ ও জীবনদৃষ্টির মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ আঁটসাঁট বন্ধনের পরিবর্তে যে একটি প্রবহমান স্বচ্ছন্দ অনায়াস গতিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়, তারই অনিবার্য প্রকাশ একাধারে তাঁর দিনলিপিগুলিতে এবং 'আরণ্যক', 'পথের পাঁচালী' ইত্যাদি উপন্যাসের আঙ্গিক-ভাবনায়।

বিভূতিভূষণের দিনলিপির আর কোন সাহিত্যিক উৎকর্ষের দাবী থাক বা না থাক, এর অনেক পৃষ্ঠাই যে আধুনিক ভ্রমণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট সংযোজন, তাতে বোধকরি সন্দেহ নেই। দেশবিদেশের খ্যাত অখ্যাত নানা স্থান—পাহাড়, নদী, অরণ্য এবং অসংখ্য নরনারীর বিচিত্র রূপচিত্র এইসব দিনলিপির পৃষ্ঠায় আশ্চর্য সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে আছে। লেখকের সঙ্গী হয়ে পাঠকরাও সেই দেশভ্রমণের গূঢ় আনন্দরস প্রাণভরে পান করেন সন্দেহ নেই। নিছক ভ্রমণের বিবরণ ত' এগুলি নয়, এর মধ্যে লেখকের কল্পনাপ্রবণ পথিক-সত্তা অচ্ছেদ্য ভাবে মিলে মিশে গিয়ে এর বর্ণনা-বিবরণকে আশ্চর্য প্রাণবন্ত ও রসাস্নিগ্ধ করে তুলেছে। 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপির ভ্রমণ-বৃত্তান্তই যে বহুল পরিমাণে 'আরণ্যক'-এর কথাবস্তু গঠন করেছে—এ থেকেই বোঝা যায় বিভূতিভূষণের দিনলিপির অন্তর্নিহিত রস-সম্ভাবনা কতখানি।

বিভূতিভূষণের এই দিনলিপিগুলির শিল্পমূল্যের প্রসঙ্গ আগেই উত্থাপন করেছি। দিনলিপির মধ্যকার একান্ত ব্যক্তিগত দিকটি এর আবেদনের সর্বজনীনতার পক্ষে যে একটি প্রধান অন্তরায়—একথা লেখক স্বয়ং বলেছেন; একথা আমরাও অস্বীকার করি না। কিন্তু সে ত' গেল যুক্তি-তর্কের কথা; যুক্তি-তর্কের বাইরে রসজ্ঞ পাঠকের হৃদয়ের কাছে এই দিনলিপিগুলির যে একটি অনিবার্য রসাবেদন আছে—এ-ও ত আদৌ মিথ্যা নয়। এই তথ্যকে কেমন করে উড়িয়ে দেব? বেশি কিছু বাগবিস্তার না করে স্বয়ং বিভূতিভূষণ এ সম্পর্কে যে প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন, সেটি উদ্ধৃত করলেই বোধহয় আমাদের বক্তব্য অনেকটা স্পষ্ট হবে। বিভূতিভূষণ বলেছেন,

"আমার জীবনের ও জগতের বিদেশে যাহারা অবস্থিত—তাহারা একটি

হইতে কি রস পাইবেন আমি জানি না। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে কৌতুক বা কৌতূহলের মধ্য দিয়া একটি নৈর্ব্যক্তিক আনন্দের অনুভূতি জীবনের সকল দর্শকের পক্ষেই স্বাভাবিক—কারণ ইহার মূলে রহিয়াছে মানবের মূলগত ঐক্য।”

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ঔপন্যাসিক বা গল্পকার বিভূতিভূষণের পাশে শিল্প-সুন্দর দিনলিপির সার্থক স্রষ্টা বিভূতিভূষণকেও যথাযোগ্য সম্মানিত আসন দিতে বোধহয় পাঠকের মনে কোন দ্বিধা বা সংশয় থাকবে না।

বিভূতিভূষণ : ছোটগল্পের দর্পণে

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের অনুষঙ্গে গোড়াতেই মনে আসে তাঁর বিশিষ্ট উপন্যাসগুলির কথা,—সেই সব গ্রন্থের পরিপ্রেক্ষিত ও তাদের মধ্যে অন্তর্বাহী লেখকের মানস প্রবণতার কথা। ছোটগল্প ও উপন্যাস—বিভূতিভূষণের এই দুই 'স্বতন্ত্র' সৃষ্টি প্রবাহের কথা মনে এলে প্রথমে একটি মৌল প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই হয়: (এই দুই প্রবাহের মধ্যে যথার্থই কোন স্বাতন্ত্র্য বা প্রভেদ আছে কিনা।) পথের পাঁচালী-অপরাজিত-দৃষ্টিপ্রদীপ-আরণ্যক-অনুবর্তন ইত্যাদি উপন্যাসে লেখকের যে-দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা অভিজ্ঞতার যে-জগৎ উন্মোচিত, তাঁর দুই শতাধিক ছোটগল্পে কি তার চেয়ে বিস্তৃততর বা নূতনতর কোন জগৎ কিংবা গূঢ়তর কোন জীবন-চেতনা আত্মপ্রকাশ করেছে?

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের কথা মনে আসে। রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণের মধ্যে কেবল নিসর্গচেতনার দিক্ থেকেই নয়, সামগ্রিক জীবনবোধের ক্ষেত্রেও দুজনের মানস-সাদৃশ্য বর্তমান। এঁরা দুজনেই সারাজীবনে বহু ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু একথা এক রকম অসংশয়িত সত্য যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাসের জগৎ এক নয়। তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাস—এই দুয়ের মধ্যকার জীবনগত অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকরণ সবই আলাদা ধরণের। বিশেষত প্রথমদিকের ছোটগল্পে তিনি যে গ্রামীণ জীবনের ছক বিন্যস্ত করেছেন, উপন্যাসে তা কোনদিনই করেন নি। বস্তুত জীবন সম্পর্কে, জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর দু'ধরণের বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করার জন্যই তিনি ছোটগল্প ও উপন্যাসের স্বতন্ত্র মাধ্যম বেছে নিয়েছিলেন।)

কিন্তু বিভূতিভূষণ সম্পর্কে একথা অকুণ্ঠ চিত্তে বলা চলে কি? শুধু বিভূতিভূষণ ন'ন, তাঁর সমকালীন দু'জন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী, তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যকার ভেদরেখাটিও খুব স্পষ্ট নয়। একথা কি মনে হয় না যে, প্রায় একই ধরণের জীবনগত অভিজ্ঞতা কিংবা দৃষ্টিভঙ্গি এঁদের ছোটগল্প ও উপন্যাস উভয়ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করেছে? তবু বোধহয় বিভূতিভূষণের তুলনায় তাঁদের সাহিত্যে ছোটগল্প ও উপন্যাসের স্বকীয়তা স্ফুটতর। বহু-বিচিত্র এই বিশাল জটিল জীবনের কঠিন বাস্তবতা

সম্পর্কে তার অজস্র বলিষ্ঠ-তির্যক পথ ও প্রবাহ সম্পর্কে, তার আদিম জৈব কিংবা আলো-আঁধারি সর্পিল রূপ সম্পর্কে একান্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে সচেতন এবং ছোটগল্প ও উপন্যাসের প্রকরণগত স্বকীয়তা সম্পর্কে বহুল পরিমাণে অবহিত বলে তাঁদের রচনায় উপন্যাস ও ছোটগল্প একেবারে একাকার হয়ে যায় নি। তাঁদের উপন্যাস ও ছোটগল্পের অনেক উপকরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মিল থাকলেও এই দুই ভিন্ন প্রকরণে বিধৃত জীবনরসের স্বাদের বৈচিত্র্য বেশ অনুভব করা যায়।

তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকাংশে বস্তুনিষ্ঠ বলে জীবনের নানামুখী বৈচিত্র্য তাঁদের আকর্ষণ করে, তাঁদের শিল্পী-সত্তার মূলে গিয়ে ধাক্কা দেয় এই নিদারুণ বাস্তব-জীবন, এই একাধারে কঠিন-কোমল, সুন্দর-কুৎসিত প্রচণ্ড জৈব জান্তব জীবন। আর বাস্তব জীবনের সেই বহু-বিচিত্র রূপ-প্রকাশের দুর্মর প্রেরণায় তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ফুটে উঠতে দেন তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর ফলে উপন্যাস ও ছোটগল্পের স্বতন্ত্র আধারে জীবনের ছোট বড় মাপের নানা অভিজ্ঞতা রূপ পায় বিচিত্র সৌন্দর্যে।

এঁদের সঙ্গে তুলনায় কিন্তু বিভূতিভূষণ অনেকখানি স্বতন্ত্র। বিভূতিভূষণ যেন সহজ আত্মনিষ্ঠ এক পথিক-সত্তা। সব কিছুকেই দেখেন জটিলতামুক্ত সরল অনাবিল এক দৃষ্টি দিয়ে, দেখেন নিজেরই পথ চলা স্মৃতিভারাতুর 'নস্ট্যালজিক' মনের আলোয় মেদুর করে। তাঁর ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব স্পষ্টই অনুভূত হয় কোন না কোন সূত্রে। হয় কাহিনীর অন্তর্গত প্রত্যক্ষ শরীরী কোন চরিত্ররূপে অথবা কাহিনীর সর্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত স্বীয় ব্যক্তিত্বের অন্তর্লীন চেতনারূপে। তাঁর স্বীয় জীবনগত অভিজ্ঞতা যত কঠিন নিদারুণ বাস্তবই হোক না কেন, তাঁর স্বকীয় চেতনার স্পর্শে তা সহজেই আমূল রূপান্তরিত হয়ে যায় যেন। এর ফলে দুঃখ-দারিদ্র্য-জর্জরিত বর্তমান স্মৃতিরসের করুণ মাধুর্যে কিংবা অনাগত দূরকালের স্বপ্ন-সুষমায় ভরে উঠে সহজেই রূপান্তর লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের আধুনিক লেখক হওয়া সত্ত্বেও শারীর চেতনা, যৌনবোধ কিংবা তথাকথিত 'পাপ'-চেতনা ইত্যাদি জটিল মানসকূট তাঁর গল্পে-উপন্যাসে বিস্ময়করভাবে বর্জিত।

তাই বিভূতিভূষণের উপন্যাস-গল্পে এমনকি 'ডায়েরী'তে বা ভ্রমণবৃত্তান্তে মূলত একই দৃষ্টিভঙ্গি, একধরণেরই জীবনগত উপলব্ধি সামগ্রিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে পাঠকের মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। পাঠকের

একথাও মনে হতে পারে যে, তাঁর সব রচনা মিলে শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র অখণ্ড 'পথের পাঁচালী'-ই রচিত হয়েছে—যার মধ্যে গল্প ও উপন্যাসের কোন সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র জগৎ নেই; ভাব, দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রকরণ কোনদিক থেকেই নয়। বস্তুত ভেবে দেখতে গেলে বিভূতিভূষণের প্রধান উপন্যাসগুলিকে সূত্রবদ্ধ কতকগুলি গল্পের এক একটি মালা বলে মনে হয়। পথের পাঁচালী, আরণ্যক, অনুবর্তন, দেবযান, ইছামতী ইত্যাদি গ্রন্থগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এধরণের মন্তব্যের অর্থ নিশ্চয় এই নয় যে, এই সব গ্রন্থে উপন্যাসের মৌল ঐক্যধর্ম নেই। অবশ্যই আছে। কোথাও নায়কের (বা স্বয়ং লেখকের) দৃষ্টিকোণ, কোথাও বা কালের পরিবর্তমান স্রোত এই ঐক্য-সূত্র রচনা করেছে। আগেই বলেছি, কী গল্পে, কী উপন্যাসে আসলে সর্বত্রই বিভূতিভূষণের দৃষ্টি জীবনের প্রতি অসীম মমতায় পূর্ণ পথ-চলা এক পথিকের দৃষ্টি। এই বিচিত্র পথিকের জীবনের বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির অজস্র ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে ও গল্পে। অভিজ্ঞতা স্বল্প হলেও তাকে অবলম্বন করে এক একটি ছোটগল্প লেখা কঠিন নয়, কিন্তু উপন্যাসের জন্য ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার উৎস থাকা প্রয়োজন। এর ফলে, একদিকে গল্পের সংখ্যা যেমন উপন্যাসের চেয়ে স্বভাবতই বেশি হয়েছে, অন্যদিকে ছোটগল্পের বিষয়গত বৈচিত্র্য উপন্যাসের চেয়ে অধিকতর পরিস্ফুট বলে মনে হওয়াও স্বাভাবিক।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে নিছক বিষয়ের মূল্য কখনই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই গূঢ় আত্মনিষ্ঠ লেখকের অন্তশ্চেতনা তথা জীবনদৃষ্টির বৈশিষ্ট্যই তাঁর রচনাকে স্বকীয়তায় অর্থবহ করে তোলে, কেবল বিষয়ের গৌরব বা বৈচিত্র্য নয়। সেদিক থেকে তাঁর গল্প ও উপন্যাসের মধ্যকার স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম কতখানি পরিস্ফুট? আর এইজন্যই দেখা যায় যে, বিষয়ের দিক্ থেকে অনেকাংশে অভিনব হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অনেক গল্পই তেমন রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি—কারণ, লেখকের মনোযোগ সেখানে বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আপন শিল্পিসত্তার গভীর চেতনার স্পর্শে লেখক সেখানে বিষযের উত্তরণ ঘটাতে পারেন নি। অতএব তাঁর অধিকাংশ সার্থক রসোত্তীর্ণ গল্পের ও বিশিষ্ট উপন্যাসগুলির অন্তঃপ্রকৃতি ও তাদের মধ্যে প্রতিফলিত লেখকের চেতনা ও জীবনবোধের গভীর সাযুজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বারবার একটি প্রশ্নই মনে জেগে ওঠে: বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের কোন স্বকীয়তা আছে কি? থাকলে তা কী ধরণের?

এর উত্তরে বলা চলে, স্বকীয়তা অবশ্যই আছে। তবে তার প্রকাশ কিছুটা সীমিত। বিভূতিভূষণের উপন্যাস থেকে ছোটগল্প একেবারে স্বতন্ত্র ধরণের কোন সৃষ্টি না হলেও, তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য একটু লক্ষ্য করলেই অনুভব করা যায়।

সেই সব বৈশিষ্ট্যের একটি হ'ল, উপন্যাসের তুলনায় গল্পে মানুষেরই বেশি প্রাধান্য, প্রকৃতির নয়। প্রকৃতি-চেতনার যে অপার্থিব আলোয় তাঁর পথের পাঁচালী, আরণ্যকের মত শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি উদ্ভাসিত, ছোটগল্পে তার প্রকাশ নিতান্তই সীমাবদ্ধ। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে মানুষের পরিচয় নিশ্চয় নগণ্য নয়, সর্ববিধ রচনাতেই তাঁর মানুষের প্রতি অপরিমেয় মমত্ববোধের ছবিটি গাঢ় রঙে আঁকা। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কয়েকটি উপন্যাসে দেখি মানুষ ও প্রকৃতির মিলিত এক সামগ্রিক রূপ। কিন্তু ছোটগল্পে প্রকৃতি প্রায়শই অনুপস্থিত, সেখানে আছে কেবল মানুষ। প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নয়, মানুষের—একান্তভাবে মানুষেরই 'মানবিক' পরিচয়-সন্ধান সেখানে লেখকের অম্বিষ্ট। উপন্যাসে প্রকৃতির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা প্রসঙ্গে আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা স্বতঃই মনে আসে। সেটি দূর-বিসর্পিত দেশকালের চেতনা। আর এরই স্পর্শে গ্রামীণ জীবনের নিতান্ত শাদামাটা ঘরোয়া কাহিনী নিত্যকালের এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে। ছোটগল্পগুলিতে দেশকালের পটভূমি অতটা দূর-প্রসারিত হবার অবকাশ পায়নি। এর জন্য অবশ্যই ছোটগল্পের আয়তনগত সীমাবদ্ধতা বহুলাংশে দায়ী, সন্দেহ নেই। বিভূতি-ভূষণের ছোটগল্পে পরিবর্তমান কাল-চেতনার ছবি অবশ্য দুর্লভ নয়, কিন্তু তার স্বরূপ উপন্যাসের কালচেতনা থেকে কিছুটা পৃথক্ বলে মনে হয়। এ সম্পর্কে পরে যথাস্থানে আলোচনা করবো।

বস্তুত প্রকৃতি বা বিস্তৃত Space-এর ব্যঞ্জনা নয়, বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনপটে মুখ্যত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সহজ আনন্দ-বেদনার কথা বলেছেন বিভূতিভূষণ তাঁর গল্প-সাহিত্যে। পরিপ্রেক্ষিত বা 'perspective' এর ঈষৎ হেরফেরের ফলে উপন্যাসের সঙ্গে তাঁর গল্পের কিছুটা রসগত পার্থক্য অবশ্যই ঘটেছে, স্বাদের বৈচিত্র্য নিশ্চয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ; তবে এও স্বীকার করতে হবে যে, আসলে একই ধরণের চেতনার আলো, যা উপন্যাসের নানা উপকরণের মধ্য দিয়ে বিকীর্ণ হয়েছে, তা-ই দ্বিশতাধিক গল্পের বিচিত্র অভিজ্ঞতার দর্পণে নানা বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়েছে। জীবনকে

দেখার মৌল দৃষ্টিভঙ্গিতে কিন্তু কোন প্রভেদ নেই। তবে জীবনকে দেখার মধ্য দিয়ে বিপুল বিস্ময়-ভরা বিচিত্র গভীর সৌন্দর্য-সম্ভোগে অক্লান্ত এই পথিক উপন্যাসের মত গল্পের আধারেও জীবন-রস-সম্ভোগের নিবিড় আনন্দটুকু ভরে দিয়ে গেছেন।

গল্পের প্রকরণগত সীমা-সংহতি সম্পর্কে সব সময় বিভূতিভূষণ খুব বেশি অবহিত হয়ত ন'ন, হয়ত স্বেচ্ছায় সচেতনভাবেই ন'ন,—তবু মাঝে মাঝে ছোটগল্পের সীমিত অবয়বে বিভূতিভূষণের জীবনগত অভিজ্ঞতা ও জীবনদৃষ্টি এক বিশেষ তাৎপর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর অনেক সার্থক ছোটগল্পেই দেখতে পাই যে, ঘটনা চরিত্র বা অনুভূতি একটি মুহূর্তের অনুবিশ্বে সংহত হয়ে জীবন-উপলব্ধির এক বিশাল গভীর ব্যঞ্জনা বহন করে এনেছে। আর সেখানেই তাঁর ছোটগল্পের যথার্থ স্বকীয়তা।

দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে বিভূতিভূষণ (উনিশটি গল্প সঙ্কলনে প্রকাশিত) যে দ্বিশতাধিক গল্প লিখে গেছেন, তাদের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্বয়ংস্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা সহজ নয়। বিভূতিভূষণের গল্পের ক্ষেত্রে একাজ আরও কঠিন। তাঁর গল্পের ঘটনা বা বিষয়গত শ্রেণীবিন্যাস সম্ভব নয়। কারণ তাঁর এমন অনেক বিশিষ্ট গল্প আছে যেগুলি নিতান্তই ঘটনাবিরল। বিষয়গত কোন সুস্পষ্ট পরিচয় তাদের নেই।

তবু আলোচনার সুবিধার জন্য গল্পের এই বিপুল সম্ভারকে কয়েকটি পৃথক্ গুচ্ছে বেঁধে নিতেই হবে। বলা বাহুল্য বিভূতিভূষণের মতো গল্পকারের রচনাকে—যাঁর বহু শ্রেষ্ঠ গল্পই নিতান্ত ঘটনাবিরল, নিছক স্থূল ঘটনা বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে শ্রেণীবদ্ধ করা যাবে না। বরং তাঁর মনোধর্মের দিক থেকে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রবণতার দিক থেকে গল্পগুলিকে বিভক্ত করা যেতে পারে। কথাটা বরং একটু ঘুরিয়ে বলি। আমাদের প্রকৃত অন্বিষ্ট হবে গল্পগুলিকে শ্রেণীবিন্যস্ত করা নয়. বরং গল্প-সাহিত্যের দর্পণে প্রতিফলিত বিভূতিভূষণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রবণতার তাৎপর্য-অন্বেষণ। হয়ত এই অন্বেষণের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণের শিল্পিব্যক্তিত্বের কোন নূতন পরিচয় বা কোন নূতনতর মাত্রা—যা তাঁর উপন্যাসে পরিস্ফুট নয়, উন্মোচিত হতেও পারে।

বিভূতিভূষণের বিশিষ্ট গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে জীবন জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত তাঁর গল্প-জগৎ তাঁর অন্তর্লোকের সেই সব চেতনা-প্রবণতার প্রত্যয়সিদ্ধ বাস্তব রূপায়ণের আকাঙ্ক্ষা থেকেই জন্ম নিয়েছে। প্রসঙ্গত বলি যে, এই সব চেতনা-প্রবণতার কোনটিই স্বয়ংস্বতন্ত্র নয়। অনেকক্ষেত্রেই দেখি, একটি প্রবণতা থেকে আর একটি জন্ম নিয়েছে, এদের পরস্পরের মধ্যে আছে গূঢ় গভীর যোগ। আর এই সব চেতনা-প্রবণতার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বিভূতিভূষণের অখণ্ড শিল্পিসত্তা। এবারে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি বা চেতনা-প্রবণতার উল্লেখ করবো—

ক. আপাত-তুচ্ছ জীবনের তাৎপর্য সন্ধান : সাধারণ মানুষের বেদনা-বঞ্চনা এবং তা থেকে উত্তরণ প্রবণতা

খ. স্নেহ-মমতা : মৃত্তিকা-তৃষ্ণা (নস্ট্যালজিয়া)

গ. প্রেম ও রোম্যান্স চেতনা : সমকালীন ও প্রাচীন পটভূমিতে।

ঘ. কালপ্রবাহের চেতনা

ঙ. মৃত্যুর পটভূমি : জীবনের চেতনা

চ. অতিপ্রাকৃত চেতনা

ছ. অধ্যাত্ম-প্রবণতা

জ. প্রকৃতি-চেতনা ও অন্যান্য।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে কিংবা তারপরে—কল্লোলগোষ্ঠীভুক্ত 'কল্লোল' চেতনায় উদ্বেজিত তরুণ কথাশিল্পীরা যখন মুখ্যত নগর-জীবন বা নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গল্প লিখছিলেন, আর তা-ও বহুলাংশে পশ্চিমী সাহিত্যের অনুসরণে, চারপাশের সজীব দেশজ উপকরণ নিয়ে নয়,—সেই সময় এলেন বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর মাটি-ঘেঁষা জীবনের সহজ প্রাণোজ্জ্বল অজস্র অভিজ্ঞতার অফুরন্ত সঞ্চয় নিয়ে। দু'জনেই বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের চিরকালীন রূপটিকে ফুটিয়ে তুললেন তাঁদের রচনায়। কিন্তু এই দুজনের দৃষ্টির আলোয় যে অসংখ্য নরনারীর জীবন ও চরিত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, তাদের মধ্যে একটা মৌল প্রভেদ কারোরই নজর এড়াল না। তারাশঙ্করের মানুষগুলি অকৃত্রিম সন্দেহ নেই, কিন্তু জৈব চেতনার তীব্রতায়, আদিম কামনা বাসনা লোভ ক্রোধ হিংসা ইত্যাদি প্রবৃত্তির আত্যন্তিকতায় তারা একটু বেশি যেন বর্ণোজ্জ্বল—কিছুটা গাঢ় রঙে যেন চিত্রিত। কিন্তু বিভূতিভূষণ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর সৃষ্ট নরনারী অতি

সাধারণ—অনেক সময়েই তারা এত নগণ্য, এত অকিঞ্চিৎকর তাদের জীবনযাত্রা যে, তা নিয়ে যে সাহিত্যের শাশ্বত লোক রচিত হতে পারে তা অকল্পনীয় মনে হয়। কিন্তু বস্তুত তা-ই ঘটেছে। 'যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখদুঃখকে রূপ দিতে হবে' (সাহিত্যের কথা)—এই উক্তির মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ সেই আপাত-তুচ্ছ নগণ্য মানুষের জীবন-ভিত্তিক সাহিত্য-সৃষ্টির অঙ্গীকার করেছেন। বিভূতিভূষণের গল্প নিয়ে আলোচনায় এই প্রসঙ্গটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ উপন্যাসের চেয়েও ছোটগল্পে এই সাধারণ নগণ্য মানুষের সমাবেশ হয়েছে অনেক বেশি। অজস্র তুচ্ছ গ্রামীণ মানুষের তুচ্ছতর সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার অসংখ্য ছবি চোখে পড়েছে এক ভ্রাম্যমান পথিকের চলার পথের দু'পাশে। সেই সব বর্ণবিরল নিতান্ত অনভিজাত ছবিগুলিই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে এক একটি ছোটগল্পের রূপ নিয়ে। প্রতিদিনের পথের ধুলোয় যে-জীবন ছড়িয়ে আছে, তা শত আপাত তুচ্ছতা সত্ত্বেও যে আশ্চর্যভাবে সজীব ও বাস্তব, কারণ তা অকৃত্রিম, আর এই অকৃত্রিমতাই যে এদের মধ্যকার নিহিত শক্তি—একথা বিভূতিভূষণের মতো খুব কম লেখকই উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর গল্পগুলি পড়লে অনেক সময়েই এদের আদৌ কোন সচেতন শিল্পসৃষ্টি বলে মনে হয় না। এরা যেন তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ বর্ণবিরল অভিজ্ঞতায়-পূর্ণ দিনলিপির অংশবিশেষ। মনে হয়, জগৎ ও জীবনের কিছু উপেক্ষিত বর্ণহীন উপকরণ একপাশে পড়েছিল, কোন লেখকের চোখ পড়েনি সেদিকে,—সবাই কিছু না কিছু বর্ণ ও বৈচিত্র্যের সন্ধান করেছেন; কিন্তু বিভূতিভূষণের দৃষ্টি সেই বর্ণিল জীবনের দিকে নয়,—তিনি এই উপেক্ষিত বিবর্ণ গ্রামীণ উপকরণগুলিকেই যেন কতকটা 'নির্বিচারে' তাঁর গল্পের বিষয় ও চরিত্ররূপে গ্রহণ করেছেন। এভাবে গ্রহণ করার মধ্যে তথাকথিত কোন গণসাহিত্যসৃষ্টির ভঙ্গি তাঁর নেই, সমকালীন অতি-আধুনিকপন্থী লেখকদের অনেকের মত 'দারিদ্র্য' তথা বঞ্চনা-বিড়ম্বনা নিয়ে গল্প লেখার সাড়ম্বর আস্ফালন নেই কিংবা কোন সমাজবোধকে লেখায় প্রতিফলিত করার সচেতন প্রয়াসও নেই। তাঁর গল্প নিতান্তই কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর নরনারীর কাহিনী—'Short simple annals of the poor';—তারা গ্রামের অধিবাসী বটে, কিন্তু তাদের গল্পের মধ্যে গ্রামীণ সমাজের কোন সুসংবদ্ধ পটভূমি বা সমস্যা ফুটে ওঠে না, তারা

সংখ্যায় অনেক, কিন্তু সবাই মিলে তারা কোন বিশেষ সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ নয়। বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে গ্রামীণ সাধারণ মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যার ছবি আদৌ মুখ্য নয়—তাদের জীবনের ভিন্নতর মাত্রা বা 'ডাইমেনশন' প্রকাশ করেছেন বিভূতিভূষণ।

আগেই বলেছি, তাঁর গল্পের মানুষগুলি সকলে মিলে কোন সমষ্টিবদ্ধ সমাজ নয়, তারা দারিদ্র্য দুঃখ ও তুচ্ছতার আবরণে ঢাকা এমন কতকগুলি সত্তা, যাদের জীবন—জীবনের গভীরসঞ্চারী এক পরিচয়ের ইশারা জানায়। অবশ্য বলা বাহুল্য, এই ইশারার আলো জ্বলে উঠেছে লেখকেরই স্বকীয় জীবনদৃষ্টির শিখা থেকে। তবে সেই দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট হয়েছে নবনারীব বাস্তব-জীবন-সমস্যার সামাজিক-পারিবারিক-অর্থনৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই। এখানেই বিভূতিভূষণের গল্পের শিল্পশরীরেব শক্তি ও সামর্থ্যের প্রকৃত রহস্য। তাঁর সার্থক গল্পগুলি জীবনের যে গূঢ় পরিচয় বা রসসৌন্দর্যের সংকেতই বহন করুক না কেন, তাদের বাস্তবতা ঘটনায়, চরিত্রে, সংলাপ-পরিবেশে পাঠকের পুরোপুরি প্রত্যয়সিদ্ধ। পুঁইমাচা, মৌরীফুল, আহ্বান, ভণ্ডুলমামার বাড়ী ইত্যাদি গল্প প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

বিভূতিভূষণেব এই নিখুঁত বাস্তবতাবোধের বৈশিষ্ট্য ও সীমা সম্পর্কে আমাদের অবহিত থাকা প্রয়োজন। বিভূতিভূষণের বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টি বৃহৎ পটভূমিকায় নানা বর্ণাঢ্য ঘটনা ও জটিল চরিত্রের সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমাবেশে যথার্থ স্ফূর্তিলাভ করে না। অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ পরিসবে নিতান্ত সহজ সরল ঘটনা ও 'তুচ্ছ' শাদামাটা মানুষের রূপায়ণে তাঁর বাস্তবতাবোধ সাফল্যের শিখর স্পর্শ কবে। আব সাফল্যের সেই স্তবে অবশ্য, বলা বাহুল্য, তাঁর গল্পগুলি নিছক 'বাস্তবনিষ্ঠ' বলে প্রতিভাত হয় না, তারা মানুষের তুচ্ছ লৌকিক দুঃখসুখের অলৌকিক রসনিবিড ছবি হয়ে যায়। নগণ্য তুচ্ছ নরনারীর জীবনের বাস্তবতা অপরূপ এক তাৎপর্যে ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। গ্রামবাংলার এই সব তুচ্ছ অবহেলিত মানুষের কাহিনী বলতে গিয়ে বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে বারবার ভেসে উঠেছে এদের জীবনের ব্যর্থতা-বেদনা ও বঞ্চনার ছবি। সে ছবি বহুবর্ণ না হতে পারে কিন্তু লেখকের বর্ণবিরল তুলির অনায়াস টানে—অল্প কয়েকটি নিপুণ আঁচড়ে তা নিঃসন্দেহে জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী। 'মৌরীফুল' গল্পের স্বামিপ্রেমবঞ্চিতা সুশীলা, 'পুঁইমাচা'-র অকালমৃতা ভাগ্যহীনা মেয়েটি, 'সংসার' গল্পের নিতান্ত গরীব ঘরের অসহায় বধূ তারা,

'ডাকগাড়ী' গল্পের দুঃখিনী বালবিধবা রাধা, 'বিপদ' গল্পের পতিতা হাজু— এরকম অসংখ্য নারী চরিত্র বিভূতিভূষণের গল্পের জগতে স্থান পেয়েছে—যাদের জীবনের একটি দিকই লেখককে বিশেষভাবে নাড়া দিয়ে গেছে। সেটি তাদের বেদনা ও বঞ্চনার দিক্। সাংসারিক জীবনে ব্যর্থতা ও দুঃখ-যন্ত্রণায় বিড়ম্বিতা অসহায় গ্রাম্য নারী চরিত্র-ই বিভূতিভূষণের গল্পের একটি প্রধান অংশ জুড়ে আছে। তাঁর রচিত প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা'-তেই একটি অতি-সাধারণ গ্রাম্য নারীর করুণ মুখচ্ছবি সর্বপ্রথম পাঠকের চিত্তকে অভিভূত করে। প্রথম যৌবনের নারী সম্পর্কে একধরণের রোম্যান্টিক অনুভূতি উত্তরকালের ব্যাপক গ্রামীণ জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিযে নারীজীবনের দুঃখ-বিডম্বনার বাস্তব উপলব্ধিতে ক্রমশ রূপান্তরিত হয। সেই সংবেদনশীল বাস্তব উপলব্ধি থেকেই তাঁর অনেক গল্পের জন্ম। নারীকে দেখেছন তিনি গ্রামীণ জীবনের নানাস্তরে—নানারূপে। বালিকা, অবিবাহিতা তরুণী, গৃহস্থ বধূ, প্রবীণা গৃহিণী, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধা, কন্যা, জননী, পতিতা,—নানাধরণের নারীর দুঃখ-ব্যথায ভারাক্রান্ত অসহায রূপের একান্ত বাস্তব প্রতিলিপি ফুটে উঠেছে বিভূতিভূষণের রচনায়। কেবল দরিদ্র মধ্যবিত্ত সংসারের নারী-ই নয়, সমাজের অনাদৃত অন্ত্যজ শ্রেণীর নারী চরিত্রও তাঁর গল্পে মানবিক মমতায় অভিষিক্ত হযেছে। এই প্রসঙ্গে 'মুক্তি' গল্পের যুগী-বৌ নিস্তারিণী, 'বরো বাগদিনী' গল্পের বাগদিনী চরিত্র, 'অসাধারণ' গল্পের হাঁড়ি-বৌ, 'সই' গল্পের 'দুলে কি বাগদীদের মেযে' প্রভৃতি চরিত্র স্মরণীয। নারীজীবনের দুঃখ-বেদনার কাহিনী বিভূতিভূষণ অনেক গল্পেই বাস্তব ভঙ্গিতে বিবৃত করেছেন। এদের মধ্যে কযেকটি গল্পে নারীজীবনের বঞ্চনার দিকৃটি বিশেষভাবে চিত্তস্পর্শী হযে উঠেছে লেখকের কথনরীতির বৈশিষ্ট্যে। এই সব গল্পে বিড়ম্বিত নারীজীবনের ছবিটি দেখানো হযেছে অতীত দিনের স্মৃতিচারণের মধ্য দিযে। স্মৃতির আলোয় বঞ্চনা বা ব্যর্থতার কঠিন স্থূল আবরণ মুছে গিযে জীবনের এক আশ্চর্য করুণ লাবণ্যময রূপ ফুটে উঠেছে। 'পুরনো কথা' গল্পে কথকের দিদিমার হাতে মায়ের অনাদর ও বিড়ম্বনার করুণ ছবি, 'একটি দিনের কথা' গল্পে শ্মশানঘাটে সদ্যোবিধবা রাণীর প্রতি তার শ্বশুরবাড়ীর লোকজনের অতি-নিষ্ঠুর আচরণের ঘটনা, কিংবা 'খোশগল্প'-এ বিবাহের মিথ্যা আশায প্রবঞ্চিত অরক্ষণীয়া গ্রাম্য তরুণীর নিরুপায় ছবি বিগতদিনের আলোছায়ায় ফুটে উঠে পাঠকচিত্তকে বিহ্বল করে।

শুধু নারীজীবনের মর্মস্পর্শী ছবি-ই নয়, গ্রামবাংলার অজস্র পুরুষচরিত্র সমাজের নানাস্তর থেকে এসে তাঁর গল্পের জগতে ভিড় করেছে—বিভিন্ন তাদের শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মবিশ্বাস, জীবিকা, আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা-ভূমি। এদের সকলকেই বিভূতিভূষণ ঐকান্তিক সংবেদনা ও বাস্তবনিষ্ঠা নিয়ে চিত্রিত করেছেন। এদের মধ্যে আছে মুসলমান জনমজুর (ফকির), হাটের জুয়াড়ী (ফড় খেলা), দরিদ্র হাতুড়ে চিকিৎসক (মনি ডাক্তার) বৃদ্ধ পুরোহিত (সংসার), পাঠশালার পণ্ডিত ও কবি (শাবলতলার মাঠ), কাপড়ের গুদামের দরিদ্র কেরাণী ও যাত্রার পালাকার (কবি কুণ্ডু মশায়), ব্রাহ্মণ রাঁধুনি (বায়ুরোগ), যাত্রাদলের অভিনেতা (যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ), দরিদ্র শিল্পী-স্বভাব চাষী (বারিক অপেরা পার্টি) প্রভৃতি অতি নগণ্য মানুষের দল। এরা সকলেই কোন-না-কোনভাবে বঞ্চিত-ব্যর্থ। এদের অধিকাংশেরই আর্থিক দুর্গতির অন্ত নেই, সামাজিক কোন প্রতিষ্ঠা বা স্বীকৃতি নেই, অদৃষ্টের প্রহারে এরা ক্লিষ্ট জর্জরিত। গ্রাম জীবনের নিরুত্তাপ বৈচিত্র্যহীন পরিবেশেও এদের কেউ কেউ আপন সৃজনধর্মী মনের দীপটিকে জ্বালিয়ে রাখার করুণ, কিছুটা হাস্যকর চেষ্টা করেছে— শাবলতলার মাঠ' 'কবি কুণ্ডু মশায', 'বারিক অপেরা পার্টি'—ইত্যাদি গল্পে তারই সজীব ছবি ফুটেছে।

শুধু গ্রাম্য-পরিবেশেই নয, নগরজীবনের পটভূমিতেও বিভূতিভূষণ এই সব নগণ্য-অবহেলিত মানুষের গল্প বলেছেন। বলা বাহুল্য, নগরের চেয়ে গ্রামের প্রতিই বিভূতিভূষণের আকর্ষণ অনেক বেশি, তবুও কর্মসূত্রে কলকাতা ও অন্যান্য শহরে তাঁকে দীর্ঘদিন থাকতে হযেছে, যাওয়া-আসা করতে হযেছে সারাজীবন। এরই মধ্য দিযে নগর–জীবনের অভিজ্ঞতার আধারটি তাঁর ভরে উঠেছে একটু একটু করে। কিন্তু সে পাত্রে নগরের আলোকিত ঐশ্বর্যের চোখ-ঝলসানো ছবি স্থান পাযনি, সেখানকার জটিল জীবন-যাত্রার কিংবা মানসিকতার পরিচয়ও সেখানে মেলে না—বস্তুত নাগরিকতার প্রতি বিভূতিভূষণের কোনদিন কোন মোহ ছিল না, তাঁর শিল্পিমনের অমৃতভাণ্ড ভরে গিযেছিল শহরের বিড়ম্বিত যন্ত্রণাক্লিষ্ট দরিদ্র মানুষের প্রতি নিবিড় মমতায। এইসব মানুষের ছবিই তাঁর নগর-জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিয়েছে। এদের মধ্যে আছে ক্যানভাসার ('ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল'), শিক্ষক ('বিধুমাস্টার'), ফিরিওয়ালা (ফিরিওয়ালা), ভিখারী ('পার্থক্য'), বারবণিতা ('হিঙের কচুরি') ইত্যাদি।

গ্রামে-শহরে অতি সাধারণ নারী ও পুরুষের জীবনের জন্য যে ছবি তাঁর অসংখ্য গল্পে ফুটে উঠেছে, বলাবাহুল্য এসব ছবির অনেকখানিই বিভূতিভূষণের একেবারে নিজের চোখে-দেখা। তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত দিনলিপি, নোট-বই, সমকালীন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণ এই সত্যের সাক্ষ্য বহন করছে। 'বিভূতি রচনাবলী'র (মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত) গ্রন্থ-পরিচয় অংশে এর বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে। বিভূতিভূষণের ঘনিষ্ঠ সুহৃৎ সজনীকান্ত দাস মহাশয় একবার লিখেছিলেন—'বিভূতিভূষণ তাঁর বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতা পরে সাহিত্যে রূপ দিতেন। তাঁর ভবঘুরে জীবনে যেখানে যেতেন সেখানকার প্রকৃতিকে শুধু সাহিত্যে রূপ দিতেন না, মানুষকেও ধরে রাখার চেষ্টা করতেন। স্থানীয় প্রচলিত গল্পগুলি মন দিয়ে শুনতেন। বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র জীবনের কাহিনী তাঁর নোট-বইয়ে টুকে রাখতেন। তাঁর সর্বপ্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' এইরকম অভিজ্ঞতার ফল।' [অভিষেক—দেবসাহিত্য কুটির—পৃঃ ১০০] সেই প্রথম গল্প থেকে শুরু করে সারা জীবন তুচ্ছ সাধারণ মানুষের জীবনের বাস্তব আলেখ্য রচনা করে গেছেন বিভূতিভূষণ। কিন্তু তাঁর গল্প কেবল এই বহিরঙ্গ আপাত-বাস্তবতার চিত্র-রূপেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর গল্প কেবল সাধারণ মানুষের দুঃখ-বঞ্চনা-ব্যর্থতার নির্মম বাস্তব প্রতিলিপি নয়—তার অতিরিক্ত আরও কিছু। এই অতিরিক্তের স্বরূপটি বুঝে নেওয়া দরকার। 'সাহিত্যের কথা' নিবন্ধে বিভূতিভূষণ বলেছেন, 'সাহিত্যিক বাস্তব জগতের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তার চিত্র আঁকবেন। কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যথেষ্ট পরিষ্কার হ'লে তিনি দেখবেন যে বাইরের জগতে যা ঘটে, তার চেয়ে লেখকের মনের জগতে আর এক মহত্তর ব্যঞ্জনাময় বাস্তব আছে।' [বিভূতি রচনাবলী (১ম খণ্ড) পৃঃ ৪৩৭] বিভূতিভূষণের অনেক গল্পেই সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনা-বিড়ম্বিত জীবনের একান্ত বাস্তবনিষ্ঠ গল্পে—বাইরের হতাশা-ব্যর্থতা ভরা বাস্তব ঘটনাকে অতক্রম করে এক ধরণের 'মহত্তর ব্যঞ্জনাময় বাস্তব'-এর আভাস জেগে ওঠে। গল্পের মধ্যে চরিত্রকে ঘিরে সেই 'মহত্তর ব্যঞ্জনা' বা উত্তরণের যে সঙ্কেত তা বলা বাহুল্য, অনেক সময়েই স্বয়ং লেখকেরই চিত্তের প্রক্ষেপ। এর ফলে দু-একটি গল্পে অবশ্য ইচ্ছাপূরণমূলক রূপকথাধর্মী সুলভ আশাবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। অসহায় নারীর দুঃখ-বঞ্চনা এক মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়েছে সুখ-সমৃদ্ধিতে। এধরণের একটি গল্প 'ননীবালা' (রূপহলুদ)।

কিন্তু এরকম দু'একটি গল্প ব্যতিক্রম বিশেষ। বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে 'মহত্তর ব্যঞ্জনাময় বাস্তব'তা বা উত্তরণের প্রকৃত তাৎপর্য অনেক গূঢ়-সঞ্চারী। মানুষের জীবন তা যত অকিঞ্চিৎকরই হ'ক তার উপর প্রগাঢ় আস্থা এর মূলে। নিতান্ত নগণ্য মানুষের দুঃখ-বেদনা-ক্লিষ্ট অতি সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে আশ্চর্য দ্যুতি ফুটে ওঠে, বিভূতিভূষণ সম্ভবত তাকেই 'ব্যঞ্জনাময় বাস্তবতা' বলেছেন। সমস্ত 'বাস্তবনিষ্ঠ' রচনার মধ্য দিয়ে তিনি সারা জীবন এরই অন্বেষণ করেছেন। দুঃখ-যন্ত্রণাবিদ্ধ কিংবা রূঢ় কঠিন বাস্তবতাই জীবনের চূড়ান্ত বা শেষ সত্য নয়, এই উপলব্ধিতে স্থির-প্রত্যয় হয়ে তুচ্ছতা-হীনতার পঙ্কস্তর থেকে জীবনকে উত্তীর্ণ করে দিতে চেয়েছেন হৃদয়ের গূঢ় অনুভূতি-ভরা সৌন্দর্যময় এক 'মহত্তর বাস্তবতা'র জগতে। এ জগৎ কোন অলীক কল্পলোক বা অধ্যাত্ম-জগৎ নয়। বাস্তবের মলিন ধূসর পরিবেশের সমস্ত বাস্তবতাটুকু বজায় রেখেই হয়ত কেবল এক মুহূর্তের জন্য গল্পের কোন চরিত্রের কিংবা পাঠকের মনের আকাশ বিদ্যুচ্চমকের মতো এক সৌন্দর্যময় চেতনার ক্ষণিক উদ্ভাসন ঘটে যায়। গল্পের স্বরূপ সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে যায়। গল্পগুলি তথাকথিত নিছক 'বাস্তবতা'র অতিরিক্ত একটি অর্থবহ তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। গ্রাম্য অশিক্ষিত নরনারীর হীন ইতর পরিবেশে অর্থহীনভাবে বেঁচে থাকার মধ্যে হঠাৎ সুন্দরতর সার্থকতর এক জীবনের ছবি ভেসে ওঠে, অচরিতার্থ এক গূঢ় প্রত্যাশার করুণ-মধুর সুর জেগে ওঠে ওইসব বঞ্চিত ব্যর্থ নর-নারীর মর্মলোকে। 'মৌরীফুল' গল্পের মৃত্যুপথযাত্রিনী গ্রাম্য বধূ সুশীলার অবচেতনলোকের অস্ফুট স্বপ্ন-কামনায়, 'কিন্নর দলে' শ্রীপতির মৃতা স্ত্রীর রেকর্ডের গান শুনে পাড়াগাঁর অশিক্ষিত মেয়ে শান্তির মনের বিহ্বল বিভ্রমে কিংবা 'ডাকগাড়ী' (জন্ম ও মৃত্যু) গল্পে বালবিধবা রাধা—এক অতি-দরিদ্র সংকীর্ণ হৃদয়হীন পরিবেশে যে সারা জীবন কাটায়, হঠাৎ একদিন স্টেশনে গিয়ে চলমান দার্জিলিং মেল ও তার সুসজ্জিত ঝকমকে কামরাগুলি দেখে তার মনের অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ায়—পূর্বোক্ত ওই উত্তরণের চেতনার আভাস ফুটে উঠেছে। দূর জগতের এক গতিশীল সমৃদ্ধ জীবনের প্রতীক ওই ডাকগাড়ী দেখার পর রাধার মনের অবস্থার বর্ণনা করেছেন লেখক এইভাবে: 'রাধা কি বুঝিল, কি পাইল জানি না—কিন্তু এ কথা খুবই সত্য যে, মেল গাড়িখানা ছাড়িয়ে গেলে রাধা দেখিল যে, সে যেন নতুন মানুষ হইয়া গিয়াছে। মনে নতুন উৎসাহ, হাতে

পায়ে নতুন বল, চোখে নতুন ধরণের দৃষ্টি। সে যেন রাধা নয়—যে সংসারে অসহায় অনাহূত, উপেক্ষিত, অবলম্বনহীন—।' 'সংসার' (জ্যোতিরিঙ্গন) গল্পে এই উত্তরণের আভাস ঠিক নেই। বধূ তারার জীবনে দুঃখের একটানা অন্ধকার রাত্রির অবসান সেখানে হয় নি কিংবা তার আভাসও নেই। কিন্তু জীবন সম্পর্কে বিভূতিভূষণ কোনদিনই পরম হতাশাবাদী কিংবা অবিশ্বাসী ন'ন। তাই বাস্তবের অন্ধকারকে সত্য ও অন্তহীন জেনেও, তার মধ্যে অন্তত একটি উজ্জ্বল দিনকেও উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। শত দুঃখ-দারিদ্র্য ও অর্থহীনতা সত্ত্বেও জীবনের নিহিত রসমাধুর্যে বিভূতিভূষণের যে পরম বিশ্বাস, সেই চেতনাটির এক অপরূপ ব্যঞ্জনা আছে এই গল্পে।

মানুষের বাস্তব জীবনকে কেবলই যে বিভূতিভূষণ ব্যথা-বঞ্চনায় বিড়ম্বিত-রূপে দেখেছেন তা নয়, বেদনায় মলিন না হলেও একথা সত্য যে, সাধারণ মানুষের জীবন নিতান্তই একঘেয়ে বিবর্ণ। তবু জীবন সম্পর্কে বিভূতিভূষণ চিরদিনই পরম আস্থাশীল। তাই তাঁর দৃষ্টিতে জীবন সমস্ত আপাত-তুচ্ছতা, সত্ত্বেও কখনই অর্থহীন নয়, বরং অপরূপ সুন্দর, অর্থবহ। সেই আপাত-তুচ্ছ জীবনের অর্থবহতা ফুটে উঠেছে মনের পিপাসায়—দূরের তৃষ্ণায়। সে দূরত্ব সর্বদাই ভৌগোলিক দূরত্ব নয়, তা বস্তুত ভ্রমনেচ্ছুর মনে, তার মানসিকতায়। লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা দুটি সুন্দর গল্প : 'সিঁদুর চরণ' (ক্ষণভঙ্গুর) ও 'একটি ভ্রমণ কাহিনী' (উপলখণ্ড)। এই আপাত-তুচ্ছ জীবনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য-সন্ধান নিয়ে আরেকটি সার্থক রচনা 'একটি দিন' (যাত্রাবদল), যার অন্য নাম 'অকারণ' (জন্ম ও মৃত্যু)। শিশুর অকারণ হাসির অপার্থিব সৌন্দর্যে খোলার ঘরের বিবর্ণ পরিবেশ অপরূপ হয়ে উঠেছে।

ব্যর্থ-বিড়ম্বিত জীবনের যে উত্তরণ-প্রবণতা বা গূঢ় আশাবাদের ইঙ্গিত মেলে বিভূতিভূষণের গল্পে, তার মূলে আছে বঞ্চিত হতভাগ্য মানুষের জন্য অন্তহীন মমত্ববোধ। নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলির প্রতি এক গভীর স্নেহ ও বাৎ-সল্য রস-চেতনা ফুটে উঠেছে কাহিনীর স্তরে স্তরে। এদের প্রতি লেখকের চিত্ত যেন অপার ক্ষমাশীলতা, অগাধ বিশ্বাস ও গভীর উদারতায় পরিপূর্ণ। আর এর ফলেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি মূলত ভালোমানুষ। শত প্রলোভন সত্ত্বেও এইসব মানুষ আশ্চর্য রকম সৎ ও বিবেকী হত্তা। 'দৈবাৎ' (উপলখণ্ড) 'হাজারি খুঁড়ির টাকা' (আচার্য কৃপালনী কলোনী) ইত্যাদি গল্প এর দৃষ্টান্ত।

এইসব সৎ ভালোমানুষ লেখকের আপন সত্তারই যেন প্রক্ষেপ বিশেষ। এরাই বর্তমান কালের মানবিক মূল্যবোধের শোচনীয় অবক্ষয়ের পরিবেশে মনুষ্যত্বের যথার্থ মহিমাকে অব্যাহত, সমুন্নত রেখেছে। 'গল্প নয়' (জ্যোতিরিঙ্গন), 'ভিড়' (নবাগত) ইত্যাদি গল্পের কথা প্রসঙ্গত মনে পড়ে। কিন্তু এদের চরিত্রে কোন জটিলতা নেই। দিনের আলোর মতো স্পষ্ট স্বচ্ছ এদের চরিত্র। আর সেজন্য এই মানুষগুলি সজীব হয় বটে, কিন্তু মানব-চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় দ্বন্দ্ব-জটিল রূপটিকে প্রকাশ করতে পারে না। চরিত্রগুলিকে কতকটা একরঙা ছবির মতো মনে হয়। এরা বহুমুখী চেতনার আলোছায়ায় বিচিত্র নয়, রহস্যময় নয়। বৈচিত্র্যের পরিবর্তে এদের মধ্যে প্রায়ই কতকগুলি সহজ সরল মানবিক বৃত্তির বাস্তব ও মর্মস্পর্শী রূপায়ণ চোখে পড়ে। এইসব বৃত্তির মধ্যে স্নেহ মমতা অন্যতম।

ভবঘুরে এক পথিক-সত্তা হয়েও সাধারণ মানুষের ঘরোয়া জীবনের মায়া-মমতায় জড়ানো রূপের প্রতি বিভূতিভূষণ কোনদিনই উদাসীন ন'ন, বরং পরম আগ্রহী। তাঁর সেই মমত্ববোধ গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের পরস্পরের প্রতি স্নেহ বা বাৎসল্যের ঐকান্তিকতার মধ্য দিয়ে অপরূপ রস-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। এদের মধ্যে ভ্রাতৃস্নেহ নিয়ে লেখা গল্প তিনটিই 'মেঘমল্লার'-এ সঙ্কলিত: উপেক্ষিতা, উমারানী ও ঠেলাগাড়ি। প্রথম দুটিতে ভাইয়ের প্রতি বোনের এবং তৃতীয়টিতে ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের নিবিড় স্নেহ মমতার প্রকাশ ঘটেছে। এখানে লক্ষণীয় যে, তিনটি গল্পে যে-ভাইবোনের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক নেই। স্নেহ এখানে তির্যক পথ ধরে আবির্ভূত ও উৎসারিত হয়েছে, বোধহয় সেই কারণেই তা' এত মর্মস্পর্শী। বাৎসল্যরসাশ্রিত কয়েকটি গল্পের মধ্যে দুটি গল্প আছে পিতৃস্নেহসিক্ত—'অন্নপ্রাশন' ও 'সীতানাথের বাড়ি ফেরা' (কুশল পাহাড়ী)। মাতৃস্নেহ নিয়ে লেখা গল্পগুলি হ'ল—'ডাইনি' (কিন্নর দল), 'আহ্বান' (বিধু মাষ্টার), 'হিংয়ের কচুরি' (জ্যোতিরিঙ্গন) ও 'জাল' (কুশল পাহাড়ী)।

'জাল' গল্পে এক জায়গায় আছে—'মেয়েরা হচ্ছে আসলে মা, তারপরে অন্য কিছু।' পূর্বোক্ত গল্পগুলিতে নারীর সেই পরম 'স্নেহময়ী করুণাময়ী' রূপের বিচিত্র পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'ডাইনি' গল্পের সন্তানহীনা বধূ কমলার সুতীব্র অস্বাভাবিক স্নেহ-ক্ষুধায়, 'হিংয়ের কচুরি' গল্পে পতিতা নারী কুসুমের করুণ-স্নিগ্ধ বাৎসল্য চেতনার স্মৃতিমন্থনে, 'জাল' গল্পে নির্জন আরণ্য পরিবেশে

নিঃসম্পর্কিত অচেনা মহিলার অনাবিল স্নেহের সহজ মাধুর্যে তারই নানামুখী চিত্ররূপ ব্যক্ত হয়েছে।

এই পর্যায়ের একটি অনন্যসাধারণ গল্প 'আহ্বান'। জাতি-ধর্ম-সমাজের ঊর্ধ্বে যে উদারমুক্ত মানবধর্ম, যে অমেয় অপার মাতৃস্নেহ, তাই যেন গল্পের কথকের হৃদয়ের বাধা-বন্ধন অতিক্রম করে শত ধারায় ছড়িয়ে পড়েছে। গল্পের কথককে উদ্দেশ করে মৃত মুসলমান করাতীর অসহায় বৃদ্ধা স্ত্রীর কণ্ঠে—'অ মোর গোপাল' ডাক অকৃত্রিম বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত এক পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের মতো অনুরণিত হযেছে। গল্পের কথক বারবার ওই গ্রাম্য বৃদ্ধাকে অনাদরে অবহেলায় দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন। পরম বিরক্তিতে নিজেও তার কাছ থেকে সরে থাকতে চেয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক অন্ধ গূঢ় অমোঘ আকর্ষণে বৃদ্ধাকে কবর দেওয়ার মুহূর্তে তিনি আকস্মিকভাবে গ্রামে ফিরে এসেছেন। শুধু তাই নয়, বৃদ্ধার 'প্রার্থিত' কাফনের কাপড়ও কিনে দিয়েছেন। 'সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো—অ মোর গোপাল।' গল্পের এই শেষ পর্যায়ে লেখক যেন মাতৃস্নেহ ও মৃত্তিকা-তৃষ্ণাকে একাকার করে দিয়েছেন। বৃদ্ধা তখন যেন আর নিছক মানবী নয়, কথকের প্রতি তার মাতৃহৃদয়ের আহ্বান যেন মৃত্তিকা-জননীরই অন্ধ আকুল আকর্ষণ।

বিভূতিভূষণের গল্পে মানবজীবনের প্রতি ভালবাসা সুগভীর মৃত্তিকা-তৃষ্ণার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত। 'নাস্তিক' (মেঘমল্লার) গল্পে তত্ত্বজিজ্ঞাসু দার্শনিক লোকনাথের মরণাহত দৃষ্টির সামনে যে কিশোরীর কান্না-ভরা মুখের ছবি স্মৃতির আলোয় বারবার ভেসে উঠছিল—সে এই মাটির পৃথিবীর নিবিড় আকর্ষণের-ই মূর্তিমতী প্রতিমা। 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' গল্পে আত্মীয়-পরিজনের কাছে অনাদৃতা বৃদ্ধা দ্রবময়ী ধর্মচর্যার আশায় গ্রাম ছেড়ে দূর বারাণসীধামে গেলেন। কিন্তু তাঁর মন পড়েছিল বন-জঙ্গল-ভরা নিজের গ্রাম গোপীনাথপুরের পুরনো ভিটেতে। ধর্মকথা শুনতে শুনতে তাঁর মনে বারবার জেগে ওঠে বাগানের খয়েরখাগী কাঁঠাল, আম, শশা, লেবু গাছের স্মৃতি, অতি-প্রিয় মুংলী গাইয়ের জন্য নিবিড় বেদনাবোধ। তাই শেষ অবধি কাশীধাম ছেড়ে দ্রবময়ী আবার ফিরে আসেন আপন স্বামী-শ্বশুরের ভিটায়।—"কাশী পেরাপ্তিতে দরকার নেই—এই ভিটেই আমার গয়াকাশী। তিনি এই উঠানের মৃত্তিকেতে শুয়েছিলেন ওই তুলসী তলায়—আমাকেও তোমরা ওখানে—।

আঁচলের খুঁট দিয়ে ব্রবঠাকরুণ চোখের জল মুছলেন।...এগারো বছরের নববধূ এই বাড়ীর উঠানে পা দিয়েছিলেন, এখন তাঁর বয়েস তিনকুড়ি ছয়।"

এই নিবিড় মৃত্তিকা-তৃষ্ণার সঙ্গে জড়িয়ে আছে লেখকের আরেক ধরণের প্রবণতা—সেটি হলো উৎসের দিকে নিগূঢ় আকর্ষণ—এক ধরণের স্মৃতিবাহিত 'নস্ট্যালজিয়া'। পিছনে ফেলে-আসা জীবনের রস-মাধুর্যকে পুনরায় আস্বাদ করার জন্য বর্তমান মুহূর্তটিতে দাঁড়িয়ে গল্পের মানুষগুলি ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। স্মৃতির আবেশে তাদের চিত্ত আবিষ্ট, অতীত দিনগুলির জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে তাদের মনে বর্তমান জীবনে লব্ধ সাফল্য-সার্থকতা সম্পর্কে সংশয়-হতাশা জেগেছে।

উৎসের প্রতি গভীর আকর্ষণ ও 'নস্ট্যালজিক' রসচেতনার গল্প হিসাবে 'বংশলতিকার সন্ধানে' (অসাধারণ), 'ভুবন বোষ্টমী' (উপলখণ্ড), 'অরন্ধনের নিমন্ত্রণ' (জন্ম ও মৃত্যু), 'ডানপিটে' (যাত্রাবদল) ইত্যাদি বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রথমোক্ত গল্পটিতে উত্তর ভারতে 'মানুষ' ধনীপুত্র নীরেন দীর্ঘদিন পরে এসেছে জন্মভূমি বাংলাদেশে। এসেছে অখ্যাত মেটিরি-রামচন্দ্রপুরে—যেখানে তার জন্ম। সেই গ্রামের প্রতিটি তৃণগুল্মের জন্য তার মনে এক অন্ধ প্রবল আকর্ষণ। হারানো মায়ের স্মৃতির সঙ্গে এই গ্রামের গাছ মাটি ফুল লতাপাতা মিলেমিশে এক বিচিত্র অনুভূতি সঞ্চার করেছে নায়কের মনে—'ঐ মুচুকুন্দ চাঁপার ফুল যেন কতকাল পূর্বের কোন বিস্মৃত অতীত শৈশবদিনে তাহার অজ্ঞাতসারে একদা সৌরভ বিতরণ করিয়াছিল—মায়ের মুখের সঙ্গে ঐ দিনটির ছন্দ একই তারে গাঁথা হইয়া আছে তার মনের বীণায়।' অনুরূপ ভাবে শান্ত সুশ্রী স্নেহময়ী 'ভুবন বোষ্টমী'কে ঘিরে লেখকের মধুর স্মৃতি, 'অরন্ধনের নিমন্ত্রণে' গ্রাম্য সরল মেয়ে কুমী'র সঙ্গে যাপিত মধুর দিনগুলির জন্য ধনী ব্যবসায়ী হীরুর মনের বেদনাবোধ কিংবা 'ডানপিটে'তে শৈশবের কাশীর উজ্জ্বল সজীব দিনগুলির জন্য প্রৌঢ় নিঃসঙ্গ সতীশের ব্যাকুলতা—সবই বিভূতিভূষণের স্মৃতিভারাতুর 'নস্ট্যালজিক' চেতনার স্বকীয়তায় চিহ্নিত।

অতীতের দিনগুলিতে ফিরে যাবার জন্য গল্পের নায়কদের যে ব্যাকুলতা, তা নিতান্তই এক সৌখিন স্মৃতিবিলাস মাত্র নয়,—বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে আসলে তা জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পর্কে নিগূঢ় জিজ্ঞাসা—একধরণের গভীর আত্মানুসন্ধান। বিভূতিভূষণের কাছে "জীবনের সার্থকতা অর্থ উপার্জনে নয়, খ্যাতি প্রতিপত্তিতে নয়...ভোগে নয়—সে সার্থকতা শুধু

আছে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ভেতরে..."।— (তৃণাঙ্কুর)
এই 'গভীর জীবন-উপলব্ধি'-র প্রগাঢ় আকর্ষণেই 'সার্থকতা' গল্পে (যাত্রাবদল) প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ননী ফিরে এসেছে নিজের গ্রাম রূপগঞ্জে। সেই করুণ-মধুর নানা অতীত স্মৃতি-ভারাক্রান্ত পরিবেশে জীবনের এক নূতন মাত্রা ও তাৎপর্যের উদ্ভাসন ঘটেছে তার মনে। 'জন্মদিন' (অসাধারণ) গল্পেও রায়বাহাদুর কেশব তাঁর জীবনের প্রান্তে পৌছে অনুভব করেছেন জীবনের স্থূল বহিরঙ্গ সাফল্যের অন্তঃসারশূন্যতা। এর সঙ্গে তুলনায় সেই প্রথম যৌবনে রাতুলপুর গ্রামে শিক্ষকতা ও প্রথম প্রেমের স্মৃতির মধ্যে জীবনের যথার্থ সার্থকতাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন তিনি।

বিচিত্র মানবিক সম্পর্কের রস ও রহস্য নিয়ে গড়ে ওঠে গল্প-উপন্যাসের জগৎ। মানবিক সম্পর্কের সেই নানামুখী প্রবণতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত নরনারীর প্রেম-সম্পর্ক। প্রেমের বিচিত্র বর্ণরাগ ফুটে ওঠে কথাশিল্পীর লেখনী-মুখে। বিভূতিভূষণের গল্পেও নরনারীর প্রেমের আনন্দ-বেদনা লেখকের আপন ব্যক্তিত্বের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিত্বের সেই বিশিষ্ট দিক্‌টি হ'ল দেহচেতনা ও যৌনতার বর্জন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বিভূতিভূষণের সমকালীন বাঙালী তরুণ কথাসাহিত্যিকদের রচনায় আধুনিক য়ুরোপীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাবে যে যৌনচেতনাশ্রিত প্রেমের একান্ত 'বাস্তব' রূপ আত্মপ্রকাশ করল, বিভূতিভূষণের প্রেমের কাহিনীগুলি তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। তাঁর গল্পে নরনারীর দৈহিক আকর্ষণজাত যৌন প্রবণতার প্রকাশ নেই। তাঁর নায়ক-নায়িকার প্রেমানুভূতি রোম্যান্টিক ধরণের, সংবেদনশীল হৃদয়ের স্নিগ্ধ কোমল আবেগ তার উৎসভূমি। তাঁর সৃষ্ট প্রেমিকা নারী কামনাময়ী নয়, নায়কচিত্তে সে দেহতৃষ্ণা জাগায় না—সে মমতাময়ী কল্যাণ-প্রতিমা। ভোগ বা আত্মসুখ নয়, ত্যাগের প্রবণতাই বিভূতিভূষণের গল্পের প্রেমিক-প্রেমিকার জীবনকে এক স্নিগ্ধ পবিত্র সৌন্দর্য দান করেছে। তাঁর প্রেমের কাহিনীতে যৌবনের দাহ, মিলনের জন্য নরনারীর তীব্র ব্যাকুলতা বা চাঞ্চল্য-বিক্ষোভ কিছুই চোখে পড়ে না, প্রেমের অন্তর্গূঢ় দ্বন্দ্ব রহস্য বা জটিলতার বহুবর্ণ বিকাশ ঘটেনি তাঁর গল্পে—গল্পগুলির কাহিনীগত বিভিন্নতা থাকলেও লেখকের মানসপ্রবণতা সেখানে প্রায় সর্বত্রই এক। তাঁর নায়ক-নায়িকার প্রেমানুভূতির বহিঃপ্রকাশ তেমন নেই—তা সঙ্কুচিত, অন্তর্মুখী ; ব্যর্থ

নায়ক-নায়িকা স্মৃতিচারণজাত বিচ্ছেদ বেদনাকে কেবল অন্তরের নিভৃতে বহন করে। 'সুলোচনার কাহিনী' (বিধুমাষ্টার), 'বিড়ম্বনা' (উপলখণ্ড), 'বোতাম' (মুখোশ ও মুখশ্রী), 'মরফোলজি' (ছায়াছবি) ইত্যাদি গল্প এর সাক্ষ্য দেবে।

বিভূতিভূষণের অধ্যাত্মমুখী মন কোন কোন গল্পে নারীর ব্যর্থ প্রেমকে মহত্তর দিব্য সাধনার পথে উত্তীর্ণ করে দিতে চেয়েছে—'অভিমানী' (কুশল পাহাড়ী) গল্পের রাখনি চরিত্র এদিকে থেকে একটি অনুপম সৃষ্টি। 'নসুমামা ও আমি' (উপলখণ্ড) গল্পেও লেখকের এই প্রবণতার পরিচয় আছে।

দাম্পত্য প্রেমমূলক গল্পগুলিতে-ও বিভূতিভূষণের একই ধরণের মানস প্রবণতার ছবি আছে। দাম্পত্য প্রেমও মুখ্যত দুটি নরনারীকে—দু'জন ব্যক্তিকে আশ্রয় করেই রূপলাভ করেছে। সেই প্রেমের সঙ্গে পারিবারিক বা সামাজিক জীবনের অন্যতর সমস্যাকে জড়িত করেননি লেখক। কেবল ব্যক্তিহৃদয়ের বিচিত্র ঐকান্তিক অনুভূতি—ব্যর্থতা বিষণ্ণতা ও আত্মত্যাগের নিঃশব্দ ব্যঞ্জনা গল্পের মধ্যে মর্মরিত হয়ে উঠেছে। 'ঝগড়া' (কুশল পাহাড়ী) গল্পে বিড়ম্বিত প্রবীণ স্বামী কেশব গাঙ্গুলির হতভাগ্য জীবনে বিগত যৌবনের মধুর দাম্পত্য স্মৃতি ই একমাত্র আশ্রয়, 'বাঁশি' (বেনীগির ফুলবাড়ী) গল্পে বিধবা সুলেখার সমস্ত অনুভূতি মৃত স্বামীর বাঁশির মধ্যে যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। এদিক থেকে 'চিঠি' (আচার্য কৃপালনী) গল্পটি অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়। ত্রিশ বছর আগে মৃতা স্ত্রীর যৌবন-দিনের অনুরাগ-ভরা একখানি পত্র অকস্মাৎ এসে পৌঁছল গল্পের প্রৌঢ় কথকের কাছে। হারানো যৌবনের জন্য এক বিষণ্ণ মধুর তৃষ্ণায় কথকের চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল—'চমৎকার শরৎ দুপুরটিতে শুধু বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম চিঠিখানা হাতে করে। দূর আকাশের কোণে যেন বেলপুকুর গ্রামটিতে আমার প্রথম শ্বশুরবাড়ীর চিলেকোঠার ঘরে আমার প্রথম পরিণয়ের নববধূ আজও যেন আমার পত্রের উত্তরের প্রতীক্ষায় বসে আছে।'

দাম্পত্য-প্রেমের লাবণ্য ও মাধুর্য কেবল অতীত স্মৃতিকে আশ্রয় করেই রূপায়িত হয়নি। 'অসাধারণ' (অসাধারণ) গল্পটি প্রসঙ্গত স্মরণীয়। নিদারুণ বাস্তব পরিবেশে স্বামীর দুঃসহ দারিদ্র্য ও দুরারোগ্য ব্যাধির কঠিনতম অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়েও উত্তরণ ঘটেছে নগণ্য এক নারীর অসামান্য প্রেমের। কেবল সমকালীন জীবনের প্রাত্যহিকতার পটে নয়, দূর অতীতের স্বপ্ন-কল্পনাময় পরিবেশেও প্রেম ও রোম্যান্সের বর্ণোজ্জ্বল ছবি এঁকেছেন বিভূতিভূষণ

নিপুণ হাতে। রোম্যান্টিক বিভূতিভূষণের সেই দূরযানী কল্পনাদৃষ্টির পরিচয় ফুটে উঠেছে 'মেঘমল্লার' 'স্বপ্ন বাসুদেব' 'শেষ লেখা'য়। মেঘমল্লার কিংবা শেষ লেখা ঠিক প্রেমভিত্তিক কাহিনী নয়, তবু এদের, বিশেষত মেঘমল্লার-এর উৎসমূলে প্রেমের একটি বিষণ্ণ মধুর ধারা বয়ে গেছে। স্বপ্ন বাসুদেব ত' পুরোপুরি রোম্যান্টিক প্রণয় কাহিনী। এ ধরণের অতীতদিনের রোম্যান্টিক পটভূমিতে লেখা সব ক'টি গল্পের প্রেমভাবনাই বিভূতিভূষণের স্বকীয় মানস বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত—এখানে প্রেমের মূর্তি সেই আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণের স্রোতোধারায় স্নাত শুদ্ধ-দীপ্ত ও অপরূপ।

জগতের সব কিছুই বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে অপরিসীম মূল্য ও মর্যাদা পেয়েছে কেবল তাদের প্রতি স্রষ্টার নিবিড় স্নেহ-মমতা-ভালবাসার জোরে। মানুষের সঙ্গে মানুষ বাঁধা পড়ে আছে মায়া-মমতার বন্ধনে। বিভূতিভূষণ মানব-সংসারের এই অপরূপ স্নেহ-প্রেম-পিপাসার সৌন্দর্য-মাধুর্য নিরীক্ষণ করেছেন অসীম স্নেহে। এই মানবিক স্নেহ-ভালবাসা তাঁর রচনায় এত মর্মস্পর্শী হয়েছে আরো একটি কারণে, আর একটি প্রেক্ষাপটে। সেটি চলমান কালপ্রবাহের।

বিভূতিভূষণের গল্পে-উপন্যাসে সমকালীন কল্লোলপন্থীদের মতো মূল্যবোধের ভাঙন বা ক্ষয়জনিত বেদনা-যন্ত্রণার ছবি নেই। তাঁর সাহিত্যে জীবনের স্বীকৃত মূল্যবোধগুলি স্থায়ী অবিচল। জীবন সম্পর্কে তাঁর বেদনাবোধের উৎস অন্যত্র। তার জন্ম এই সদাচঞ্চল কালপ্রবাহের চেতনার মধ্যে, যে প্রবাহ এক দুর্মর অপ্রতিরোধ্য শক্তির মতো—যার টানে মানুষের স্নেহ-মায়া-মমতা দিয়ে গড়ে-তোলা এই জীবন কোথায় ভেসে চলে যায়।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে-গল্পে এই পরিবর্তমান সময়ের চেতনা নানা আকারে মূর্তি পেয়েছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' থেকে শুরু করে শেষ উপন্যাস 'ইছামতী'তে পর্যন্ত এবং প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' থেকে শেষ গল্প-সঙ্কলন 'কুশল পাহাড়ী'-র বিভিন্ন গল্পে এই চেতনা ধ্রুবপদের মতো বেজে উঠেছে। উপন্যাসগুলি পড়ার সময় উপন্যাসের বৃহৎ পরিসরে বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার নানামুখী রূপায়ণের মধ্যে সময়ের স্রোতকে সব সময় হয়ত আলাদাভাবে স্পষ্ট করে চোখে পড়ে না (যদিও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, 'পথের পাঁচালী' বা 'ইছামতী' পড়া শেষ হলে এই কালপ্রবাহের চেতনা সামগ্রিকভাবে পাঠকচিত্তকে অভিভূত করে)। কিন্তু ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে,

তার বিষযবস্তুর একমুখী গতির টানে সময-চেতনার রূপটি সংহত, সুনির্দিষ্ট আকারে পাঠক-হৃদযে সংবেদনা জাগায।

চলমান সমযের পথ বেযে চলেছেন গল্পের নাযক বা কথক। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মাঝে মাঝে তিনি কিছুকালের ব্যবধানে কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাচ্ছেন। সমযের এই অতিক্রান্তির মধ্য দিযে সেই ব্যক্তিব দেহমন বা তার জীবনযাত্রার পরিবর্তন বা বিবর্তনের ছবিটাকে লেখক জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী করে তোলেন। দেখাতে চান জীবনের ক্রমপরিবর্তমান রূপটিকে। এ ধরণের গল্পের মধ্যে 'যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ' (জন্ম ও মৃত্যু), 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' (যাত্রাবদল), 'একটি কোঠাবাড়ির ইতিহাস' (ক্ষণভঙ্গুর) উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে প্রথম গল্পটিতে একদা-খ্যাত এক তরুণ যাত্রাভিনেতা সমযেব নিষ্ঠুর প্রহারে জর্জরিত হযে কেমন করে নিঃসঙ্গ বার্ধক্যে এক নিরুপায অবহেলিত জীবনযাপন করছে, তারই সংবেদনশীল ছবি। শেষোক্ত গল্পটির অবলম্বন কোন বিশেষ ব্যক্তি নয, একটি বাড়ি। এখানে কোন ব্যক্তির জীবনের পরিবর্তমান রূপ নয, একটি কোঠাবাড়ি তৈরী হওযা ও ক্রমশ ভেঙে পড়ার ছবির মধ্য দিযে সমযের দুর্মব প্রবাহের রূপটিকে লেখক ব্যক্ত করতে চেযেছেন। 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পেরও বিষযবস্তু একটি বাড়ি। সেই বাড়ি তৈরি করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টার করুণ কাহিনীর সঙ্গে জড়িযে আছে ভণ্ডুলমামার যুবা বযস থেকে বৃদ্ধ অবস্থায নিঃসঙ্গ অসহায মৃত্যুবরণ পর্যন্ত এক চিত্তস্পর্শী কাহিনী। আর এই ভণ্ডুলমামার বাড়ি গড়ে-ওঠাকে অবলম্বন করে গল্পের কথকের মনে জেগে উঠেছে চলমান সমযের এক বিচিত্র ভাবগভীর অনুভূতি : "আমার মনে হল ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠেছে আজ থেকে নয, জীবনের পিছন ফিরে চেযে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধরে...যেন অনন্তকাল, অনন্তযুগ ধরে ভণ্ডুলমামার বাড়ির ইট একখানির পর আর একখানি উঠছে—শিশু থেকে কবে বালক হযেছিলুম, বালক থেকে কিশোর, কৈশোর কেটে গিযে এখন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেযে কত শত জন্ম মৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্তনের মধ্য দিযে ভণ্ডুলমামার বাড়ি হযেই চলেছে।"

এই পর্যাযের আরেকটি গল্প 'দুইদিন' (জ্যোতিরিঙ্গন)-এ লেখক কাল-প্রবাহের একেবারে দুই প্রত্যন্তের—আটষট্টি বছরের ব্যবধানে দুটি দিনের ছবি তুলে ধরে যৌবন ও জরা, জীবন ও মৃত্যুর অন্তর্বর্তী সমযের দুর্বার খরস্রোতের

দার্শনিক উপলব্ধি পাঠক-হৃদয়ে সঞ্চার করতে চেয়েছেন। বস্তুত এ ধরণের গল্পে বিভূতিভূষণের দৃষ্টি কবি ও দার্শনিকের মিলিত দৃষ্টি। দার্শনিকের নির্লিপ্ত সত্য দৃষ্টির সঙ্গে কবিহৃদয়ের সংবেদনশীলতার সংযোগে গল্পগুলি গভীর ভাবরসে ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে।

কালপ্রবাহের চেতনা যেমন বিভূতিভূষণের বিভিন্ন গল্পে আত্মপ্রকাশ করেছে, তেমনি বিগতকাল কিংবা সেই কালের প্রাচীন মানুষের কাহিনী এই স্মৃতিচারী লেখকের গভীর মমতায় অভিষিক্ত হয়ে তাঁর সৃষ্টির প্রেরণাকে উদ্রিক্ত করেছে। রামতারণ চাটুজ্জে—অথর (ক্ষণভঙ্গুর) দাদু (জ্যোতিরিঙ্গন), রূপো বাঙাল (অসাধারণ), ঠাকুরদা'র গল্প (নবাগত), হাজারি খুঁড়ির টাকা (আচার্য কৃপালনী কলোনী), বড়দিদিমা (কুশল পাহাড়ী) ইত্যাদি গল্প লেখকের এই নিবিড় অতীত প্রবণতার সাক্ষ্য বহন করেছে।

চলমান কাল ও বিলুপ্ত বিস্মৃত সময়ের ভাবনা থেকে লেখকের মনে স্বতঃই আরেকটি গভীর উপলব্ধি জীবনের নানা অবস্থায় ঘুরে ঘুরে এসেছে—সেটি মৃত্যুর চেতনা। 'পথের পাঁচালী'তে অপুর দিদি দুর্গার মৃত্যু কিংবা 'অপরাজিত'তে স্ত্রী অপর্ণা বা সর্বজয়ার মৃত্যুর যে ছবিকে বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় করে রেখে গেছেন, তার মধ্য দিয়েই মৃত্যু সম্পর্কে বিভূতিভূষণের উপলব্ধির গভীরতা ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তার পরিচয় মেলে। বস্তুত, মৃত্যুর বিষণ্ণ ধূসর পটভূমিতে অসহায় অথচ প্রগাঢ় জীবনপ্রীতির হৃদয়স্পর্শী চেতনাকেই পরিস্ফুট করে তুলতে চেয়েছেন লেখক। উপন্যাস-গল্পে সর্বত্র সেই একই বোধির প্রকাশ। 'যাত্রাবদল' (যাত্রাবদল) গল্পে নতুন ঘর-বাঁধার স্বপ্ন যার চরিতার্থ হ'ল না, সেই তরুণী নববধূর পথিমধ্যে আকস্মিক করুণ মৃত্যু ও শীতের রাতে গঙ্গাতীরে কোনোক্রমে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখকের সেই নিগূঢ় জীবনপ্রীতি গভীর সংবেদনায় আত্মপ্রকাশ করেছে—"মনে হল ও এখানে কেন? এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গঙ্গার উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গ এই হিমবর্ষী নক্ষত্র বিরল বিরাট আকাশ, এই অমঙ্গলময়ী মহানিশার মৃত্যু অভিযান...ছোট্ট একটি গৃহস্থ বাড়ির দাওয়ায় মেয়েটি খোকাকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে, সবে সে নদীর ঘাট থেকে গা ধুয়ে এসেচে, পায়ে আলতা, কপালে টিপ, খোঁপাটি বাঁধা—ওকে মানায় জীবনের সেই শান্ত পটভূমিতে।"

'জন্ম ও মৃত্যু' (জন্ম ও মৃত্যু) গল্পে এক গ্রাম্য বৃদ্ধার, 'অন্নপ্রাশন' গল্পে

এক শিশু সন্তানের ও 'মৌরীফুল' গল্পে এক গ্রাম্য বধূর মৃত্যুর বিষণ্ণ করুণ পটভূমিতেও লেখকের সেই মমতা-জড়ানো জীবনমুখী অনুভূতিরই অনুরণন! তবে মৃত্যুর হতাশা-ম্লান প্রেক্ষাপটে-ও জীবনের প্রতি প্রগাঢ় আস্থার ব্যঞ্জনা বোধহয় সবচেয়ে অপরূপ হয়ে ফুটেছে বিভূতিভূষণের প্রথম জীবনের লেখা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'পুঁইমাচা'র (মেঘমল্লার) শেষ কয়েকটি পংক্তিতে। অসহায়ভাবে অকালে ক্ষেন্তি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় কিন্তু তার জীবনের অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি মৃত্যুহীন। তারই রোপিত ক্রমবর্ধমান পুঁইগাছটি তার সেই মৃত্যুহীন জীবনতৃষ্ণারই প্রতীক:

"সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায় পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে...বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচিকচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে ...সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্য ভরপুর।"

অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত বিষয়বস্তু নিয়ে বিভূতিভূষণ বহু গল্প লিখেছেন। এদের মধ্যে ছোটদের জন্যে লেখা গল্পের সংখ্যাও অল্প নয়। এই সব গল্পের বিষয়গত বৈচিত্র্যও যথেষ্ট। গল্পের সংখ্যাগত প্রাচুর্য ও বিষয়-বৈচিত্র্য থেকে অতিপ্রাকৃত কাহিনী সম্পর্কে বিভূতিভূষণের বিশেষ আগ্রহ ও প্রবণতার পরিচয় অবশ্যই মেলে।

কালপ্রবাহ ও মৃত্যুচেতনার সঙ্গে বিভূতিভূষণের শিল্পিহৃদয়ের এক গূঢ় সংযোগ ছিল এ কথা আগেই বলেছি। তাঁর অন্তর্মুখী মনে এই মৃত্যু-চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল অতিপ্রাকৃত ভাবনা। মৃত্যুর শিহরণ জাগানো ভীতি-উদ্রেককারী অপার্থিব জগতের যে আভাস অতিপ্রাকৃত গল্পে ফুটে ওঠে, যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে তার হদিশ মেলে না, কেবল অনুভবের জগতে তার আবির্ভাব। তালনবমী-গ্রন্থের 'রুক্মিনীদেবীর খড়্গ' গল্পের প্রারম্ভে লেখক তারই ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন—"জীবনে অনেক জিনিষ ঘটে যাহার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাহাকে আমরা অতিপ্রাকৃত বলিয়া অভিহিত করি।"

এই অতিপ্রাকৃত জগৎ বিভূতিভূষণের কাছে নিছক শিল্পসৃষ্টির বৈচিত্র্যময় উপকরণমাত্র ছিল না কোনদিন। এটি তাঁর চিত্তের একান্ত অনুভবের বিষয়, তাঁর হৃদয়ের সরল বিশ্বাস দিয়ে একে তিনি গভীরভাবে গ্রহণ করে-

ছিলেন। প্রেতলোক ও পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে তাঁর চিত্তের সেই দৃঢ়-মূল প্রবণতা ও প্রত্যয় জীবনের পরিণত পর্যায়ে তাঁকে 'দেবযান' নামক বৃহৎ উপন্যাস রচনায় প্রাণিত করেছিল।

অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে গল্প লেখার প্রবণতা তাঁর লেখক-জীবনের প্রথম অধ্যায়েই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। প্রথম দুটি গল্প-সঙ্কলন 'মেঘমল্লার' ও 'মৌরীফুল'-এ এ ধরণের অনেকগুলি গল্প প্রকাশিত হয়—অভিশপ্ত, বউচণ্ডীর মাঠ, হাসি, প্রত্নতত্ত্ব, খুঁটি দেবতা।

অতিপ্রাকৃত গল্পকে বিভূতিভূষণ দু'একটি ক্ষেত্রে ইতিহাস বা প্রাচীন কালের প্রেক্ষাপটে বিন্যস্ত করেছেন। 'অভিশপ্ত' গল্পটিই এদিক থেকে বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। তিনশো বছর আগে পর্তুগীজ জলদস্যু-অধ্যুষিত বাংলাদেশে দুই প্রাচীন জমিদার বংশের প্রবল বিরোধকে পটভূমিতে রেখে এই গল্পের অলৌকিক রস-পরিণাম সঞ্চার করেছেন। বিগতকালের ধূসর পরিবেশের সঙ্গে অতিপ্রাকৃতের ভীতিদায়ক মায়াবী রহস্য-চেতনা অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যে সংযুক্ত হয়েছে।

বিভূতিভূষণের এধরণের অনেক গল্পই একেবারে বর্তমানের পরিচিত ঘরোয়া পরিবেশে উপস্থাপিত হয়েছে। পেয়ালা, কাশী কবিরাজের গল্প, মেডেল ইত্যাদির নাম এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। এগুলি পড়লে মনে হয়, বিভূতিভূষণের কাছে অতিপ্রাকৃত শক্তির আবির্ভাব নিতান্ত সহজ প্রত্যাশিত ঘটনা! আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেই সেই রহস্যময় শক্তি আত্মগোপন করে আছে—যে কোন মুহূর্তেই তা কঠিন বাস্তবতার আবরণটুকু সরিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। মড়ক-লাগা মেলা থেকে নিয়ে-আসা সামান্য একটি চায়ের পেয়ালা অবলম্বন করে যে কতখানি অলৌকিক রহস্য ও ভীতি সঞ্চার করা যেতে পারে, 'পেয়ালা' গল্পে লেখকের লিপিকৌশলে তা প্রতিপন্ন হয়েছে।

বিভূতিভূষণের অলৌকিক গল্পগুলি মুখ্যত ঘটনানির্ভর। সেই ঘটনার ভিত্তি সাধারণত কোন গভীর মনস্তত্ত্ব নয়, যেমন দেখেছি রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথের' মত গল্পে। বরং এগুলি গড়ে উঠেছে ওই অলৌকিক জগৎ বা শক্তি সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব প্রবণতা বা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। কিন্তু লেখকের সেই বিশেষ প্রবণতাকে চারপাশের নরনারী ও তাদের পরি-পার্শ্ব ও জীবনযাত্রার সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে

গল্পগুলিকে গড়ে তোলা হয়েছে যে, গল্পগুলি অত্যন্ত সহজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠকের চিত্তে ভীতি-শিহরণ বা অলৌকিক অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। 'পেয়ালা' ও 'খুঁটিদেবতা' এদিক থেকে নিঃসন্দেহে সার্থক কাহিনী।

অবশ্য সব অতিপ্রাকৃত গল্পই যে ঘটনার উপর নির্ভরশীল এমন নয়, পরিবেশ-প্রধান গল্পও আছে। 'হাসি' গল্পের যা কিছু শিহরণ বা ভয়-ধরানো অনুভূতি তার প্রায় সবটুকুরই মূলে আছে এক রহস্যময় অন্ধকার রাত্রির পরিবেশে এক অপার্থিব অদ্ভুত ভয়ঙ্কর হাসির আবহ। জমাট রহস্যময় কাহিনীর সঙ্গে অতিপ্রাকৃত পট-ভূমির মিশ্রণে অনেকগুলি সার্থক গল্প রচিত হয়েছে। এদের মধ্যে তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প, অভিশপ্ত ও আরক গল্প স্মরণীয়। এইসব লেখায় নিছক কাহিনী বা পরিবেশ কোনটাই অতিরিক্ত প্রাধান্য পায় নি—দুয়ের মধ্যে এক সুন্দর সামঞ্জস্য, যা অধিকাংশ অতিপ্রাকৃত গল্পের সার্থকতার মূলে, এই গল্পগুলির রসসৃষ্টিতে আনুকূল্য করেছে।

আর একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করি। বিভূতিভূষণের গল্পে অনেক ক্ষেত্রেই অতিপ্রাকৃত এক বিশেষ প্রভাব-সঞ্চারী শক্তি রূপে দেখা দিয়েছে। সে শক্তি কোথাও শুভঙ্করী, কোথাও বা ভীষণা। বিভূতিভূষণের স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনে অলৌকিক শক্তি যে সব গল্পে কল্যাণ-মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে সেগুলির মধ্যে আছে—বউচণ্ডীর মাঠ, খুঁটিদেবতা, পৈতৃক-ভিটা, কাশী কবিরাজের গল্প ইত্যাদি। অন্যদিকে অপার্থিব অশুভ শক্তির প্রকাশ ঘটেছে পেয়ালা, মেডেল ইত্যাদি গল্পে। একমাত্র তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্পে এই শক্তি একাধারে দুই-ই—ভয়ঙ্করী ও বরাভয়দাত্রী।

আগেই বলেছি, মৃত্যুচেতনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অতিপ্রাকৃত চেতনা। মৃত্যুর ভীতিবিহ্বল শিহরণ জাগানো দিকটি ফুটে ওঠে অতিপ্রাকৃত কাহিনীর মধ্যে। আবার এই মৃত্যুচেতনা থেকে জন্ম নেয় অধ্যাত্মপ্রবণতা। মৃত্যুর বেদনায় বিশুদ্ধ হয়ে জীবন উত্তীর্ণ হয় অধ্যাত্মবোধের স্তরে। 'কুশলপাহাড়ী'র অন্তর্গত একটি গল্পে লেখকের এই অনুভূতি রূপ লাভ করেছে। গল্পটির নাম 'অভিমানী'। পিতামাতা আত্মীয় পরিজন সকলের শোচনীয় মৃত্যুর করুণ অভিজ্ঞতা কিশোরী রাখনির মনে এক দিব্য রূপান্তর ঘটাল। অবশ্য বিভূতিভূষণের অধ্যাত্ম-চেতনাশ্রিত সব গল্পই প্রত্যক্ষভাবে মৃত্যুর অনুভূতিতে অভিষিক্ত এমন নয়। অন্য ধরণের কাহিনীও আছে। আর সে সব কাহিনীর

মধ্য দিয়ে যে চেতনার প্রকাশ ঘটেছে, সেই অধ্যাত্ম-চেতনা বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্বের একেবারে মর্মমূলে অধিষ্ঠিত। তাঁর শিল্পস্বভাবে অধ্যাত্ম-চেতনার সৌরভ নিবিড়ভাবে মিশে আছে। সেই চেতনা বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্বের স্বকীয়তা থেকেই জন্ম নিয়েছে। বিভূতিভূষণের শিল্পিচরিত্রের একটি প্রধান ধর্ম এক ধরণের **transcendentalism** বা উত্তরণ-প্রবণতা। নগণ্য মানুষের যে-আপাত-তুচ্ছ জীবন, তাদের যে দুঃখ-বেদনা-বঞ্চনা—এর সবটুকুকে স্বীকার করে নিয়েও বিভূতিভূষণ কখনোই একে জীবনের শেষ চূড়ান্ত সীমা বলে মেনে নে'ন নি—এই জীবন-পরিবেশ থেকে উত্তরণে তাঁর পরম প্রত্যয়। সেই উত্তরণ, জীবন সম্পর্কে সেই গভীর আশাবাদ—যাকে তিনি 'মহত্তর ব্যঞ্জনা-ময় বাস্তব' বলেছেন, তা কেবল মর্তজীবনের সীমাতেই আবদ্ধ থাকে নি, তা শেষ পর্যন্ত অধ্যাত্ম-চেতনার দূর নক্ষত্রলোককে স্পর্শ করেছে। লেখকের এই অধ্যাত্ম-প্রবণতার পরিচয় উপন্যাস গল্প উভয়ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। উপন্যাসের জগতে প্রথম রচনা 'পথের পাঁচালী' থেকে শেষ গ্রন্থ 'ইছামতী' পর্যন্ত দীর্ঘপথ অনুসরণ করলে এটি স্পষ্ট হয়। প্রথম উপন্যাসে অপুর ক্রম-স্ফুটমান চেতনায় যা মৃদু আভাসমাত্র, শেষ উপন্যাসটিতে ভবানী বন্দ্যো-পাধ্যায়ের পরিণত উপলব্ধিতে তা পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত। গল্পের জগতেও তাই। প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা'র পরিত্যক্ত অংশের (দ্রঃ প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৮) অধ্যাত্ম-অনুভূতির আভাস শেষ গল্প-সংগ্রহ 'কুশল পাহাড়ী'তে স্পষ্ট পরিণতি পেয়েছে। 'কুশল পাহাড়ী'র একাধিক গল্পে এই অধ্যাত্মবোধের স্বাক্ষর আছে, যেমন—কুশল পাহাড়ী, অভিমানী, গল্প নয়, হরিকাকা, শেষ লেখা ইত্যাদি। এছাড়া পিদিমের নীচে (অসাধারণ), মড়িঘাটের মেলা, (আচার্য কৃপালনী কলোনী) ইত্যাদি গল্পেও লেখকের এই অনুভূতি সঞ্চারিত হয়ে আছে।

বিভূতিভূষণের এই অধ্যাত্ম-অনুভূতি জীবন-বর্জিত নয়। আসলে এ এক শুদ্ধতর জীবনবোধ—যার মধ্যে একদিকে আছে দয়া-মায়া-সেবাধর্ম, অন্যদিকে প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্যচেতনা। শেষোক্তটির অনুপম প্রকাশ আছে 'কুশল পাহাড়ী' গল্পে। গল্পটির কাহিনী-অংশ অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু এর রস-সংবেদনার মূল কারণ হ'ল, গল্পের ভাববস্তুর সঙ্গে পরিবেশের অচ্ছেদ্য সংগতি ও সাযুজ্য। সেই সঙ্গতি-সাধন করেছে প্রকৃতি। সেই আরণ্য পার্বত্য ভূমির অপরূপ নিসর্গ-শোভা ভৈরব থানের নিঃসঙ্গ সাধুর অধ্যাত্ম মহিমার যেন

একটি জ্যোতির্বলয রচনা করে রেখেছে। আর কেবল সেই নিসর্গ-সৌন্দর্যের অন্তর থেকেই যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে এক লোকোত্তর জ্যোতির্ময় অস্তিত্বের আভা। —"কবিই তিনি বটেন বাবা। এখানে বসে বসে দেখি। এই শালগাছটাতে ফুল ফোটে, বর্ষাকালে পাহাড়ে ময়ূব ডাকে, ঝর্ণা দিযে জল বযে যায, তখন ভাবি, কবিই বটেন তিনি। ...তাঁর এই কবিরূপ দেখে ধন্য হযেছি।"

প্রকৃতির প্রেক্ষাপট আছে 'পিদিমের নীচে' কিংবা মডিঘাটের মেলা' গল্পেও। অবশ্য তা' গ্রামবাংলার নিতান্ত সহজ অনাড়ম্বর প্রকৃতি-চিত্র—সরাটির চর, কাশবন, ঝিঙেফুলের হলুদ ক্ষেত, নদীতীরে বৃহৎ বটগাছ. প্রথম বসন্তেব মাঠে মাঠে ফুটে-ওঠা ঘেঁটুফুল, শিমুল, স্থবাসভরা লেবু ফুল, কশাড়ের ঝোপ...। শুধু গল্পেই নয, বিভূতিভূষণ ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার পটভূমিরূপে এই ধরণের সহজ নিসর্গ পটকেই বেছে নিযেছিলেন। 'তৃণাঙ্কুব'–এ (৩য সং, ১১৯ পৃঃ) এক জাযগায তিনি লিখেছেন: "তাঁকে (ভগবানকে) আজ বিকেলে খুঁজবো স্থন্দবপুরের কিংবা নতিডাঙ্গার বাঁওড়ের ধারের মাঠে, নীল আকাশের তলায, অস্তবেলাব পাখীদের কলকাকলির মধ্যে।"

বিভূতিভূষণের গল্পে অধ্যাত্মচেতনা শুধু সহজ নিসর্গপ্রীতিকে আশ্রয করেই ব্যক্ত হযনি, তার প্রকাশ ঘটেছে মানবপ্রীতির মধ্য দিযেও। মানুষের প্রতি মানুষের সহজ দযা-মাযা-সেবাধর্মের পথেও। তারই পরিচয আছে 'পিঁদিমের নীচে' ও 'মডিঘাটের মেলা' গল্পে। বৃদ্ধ পাগল ঠাকুর একের পব এক কলেরা রোগীব সেবাশুশ্রূষায নিজেকে উৎসর্গ করে দিযেছে। সেই মুমূর্ষু রোগীদের মধ্যে পাগল ঠাকুব দেখে ঈশ্বরকে: "যারা রুগী...তাদেব মধ্যে জনায জনায তিনি। তিনি উঁকি মারেন ওদের চোখের মধ্যে থেকে।... খেলা, সব তাঁর খেলা।" 'মডিঘাটের মেলা'তে দেখি বৃদ্ধ সাধু গরীব মানুষের তীর্থস্নানের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য মিথ্যা রটনার আশ্রয নিতে দ্বিধা করেন না। এব পিছনে অন্য কোন স্বার্থবুদ্ধি নেই—আছে কেবল দরিদ্র মানুষের জন্য অপরিসীম দযা ও মমতা।

প্রসঙ্গত এধরণের গল্পেব আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলি। এই বৈশিষ্ট্য হলো, আপাত-তুচ্ছতার আবরণে ঢাকা অতি সরল জীবনের মধ্যে লেখক কর্তৃক ভাবগভীরতার অন্বেষণ ও উপলব্ধি। বিভূতিভূষণের কয়েকটি গল্পে

দেখি অধ্যাত্ম অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে অবহেলিত অন্ত্যজ শ্রেণীর গ্রাম্য বুনো মানুষের মধ্যে—'সমাজের নিম্নস্তরের শেষ ধাপে' যাদের স্থান। উপরের দু'টি গল্পের 'সাধু'-ই ওই শ্রেণীভুক্ত। 'গল্প নয়' গল্পেও যে-মানুষটির অধ্যাত্মিক উত্তরণ ঘটেছে সে জাতে অন্ত্যজ বাগ্‌দী।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে প্রকৃতি যে ব্যাপক ও বিশিষ্ট ভূমিকা পেয়েছে, গল্পসাহিত্যে প্রকৃতির সেই অনন্যতা নেই, সেখানে মুখ্য ভূমিকা মানুষের। কিন্তু তবু নানাভাবে প্রকৃতি তাঁর গল্পে কিছুটা স্থান করে নিয়েছে ঠিকই। মানুষের ক্লান্ত ক্লিষ্ট জীবনে প্রকৃতির উদার স্নিগ্ধরূপ বিশল্যকরণীর কাজ করে—অবসন্ন দেহে মনে এনে দেয় শান্তির প্রলেপ—এই প্রত্যয় বা প্রবণতা থেকে দু'একটি গল্প লিখেছেন বিভূতিভূষণ, যেমন, নদীর ধারের বাড়ি (অসাধারণ), প্রত্যাবর্তন (আচার্য কৃপালনী কলোনী) শাবলতলার মাঠ (উপলখণ্ড) ইত্যাদি। এছাড়া 'কনেদেখা' (যাত্রাবদল) গল্পটিতেও লেখকের গভীর নিসর্গ প্রীতির স্বাক্ষর আছে সন্দেহ নেই—কিন্তু আতিশয্যের ফলে গল্পের রস অনেকাংশে বিনষ্ট হয়েছে। এছাড়া আরও কয়েকটি প্রকৃতি–বিষয়ক রচনা আছে, যেগুলিকে কোনক্রমে যথার্থ গল্প বলা চলে না। সেগুলিতে কেবল নির্জন পরিবেশে লেখকের নিসর্গ সৌন্দর্য-নিরীক্ষণের অনন্য দৃষ্টির নিভু্ল পরিচয় আছে। লেখকের প্রগাঢ় প্রকৃতি-প্রেম সেখানে তুচ্ছ অবহেলিত নিসর্গ-উপকরণগুলিকে অসামান্যতা দান করেছে। এগুলিকে লেখকের ডায়েরী বা ভ্রমণকাহিনীর অংশ বিশেষ বলেও অভিহিত করা চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মাকাল লতার কাহিনী (অসাধারণ), প্রভাতী (আচার্য কৃপালনী কলোনী) দিবাবসান (জ্যোতিরিঙ্গন), মনতালাও (কুশল পাহাড়ী) ইত্যাদির নাম করা চলে। প্রকৃতির ভাবগভীর অনির্বচনীয় রূপের মধ্যে অধ্যাত্মসত্তার উপলব্ধির প্রকাশ-প্রসঙ্গে যে দু'একটি কাহিনীর নাম আগে করেছি, তাদের সঙ্গে 'মাকাল লতার কাহিনী' ও 'প্রভাতী'কেও যুক্ত করা চলে।

প্রসঙ্গত হাসির গল্পের কথাও এসে পড়ে। বিভূতিভূষণের হাসির গল্পের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য নয়। জীবনের বিভিন্ন সময়ে লব্ধ নানান অভিজ্ঞতা অবলম্বন করে ব্যঙ্গ বা কৌতুক রসাশ্রিত গল্প লিখেছেন তিনি। গল্পগুলির সহজ সাবলীল ভঙ্গি উপভোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই ধরণের ব্যঙ্গ বা কৌতুক-প্রবণতা বিভূতিভূষণের শিল্পিস্বভাবের অন্তরঙ্গ লক্ষণ

নয়—তাঁর মনের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ নেই যেন এই ধরণের সৃষ্টির প্রতি। এই ধরণের গল্পের উপযোগী উজ্জ্বল তীক্ষ্ণধারালো ভাষা ও ভঙ্গিও তাঁর মতো অতীতস্মৃতিচারী গভীর-গম্ভীর ব্যক্তিত্বের আয়ত্তাধীন নয়। এর ফলে বিচ্ছিন্নভাবে দু'একটি ব্যঙ্গাত্মক গল্প মোটামুটি উপভোগ্য হলেও (উডুম্বর, জওহরলাল ও গড ইত্যাদি)—এদের মধ্যদিয়ে বিভূতিভূষণের শিল্পিব্যক্তিত্বের কোন স্বকীয় প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করেনি। আর সেজন্য এদের নিয়ে বিশদ আলোচনার বোধহয় কোন প্রয়োজন নেই।

ছোটগল্পের দর্পণে প্রতিফলিত বিভূতিভূষণের শিল্পিব্যক্তিত্বের রূপ আমাদের অন্বিষ্ট। এতক্ষণ বিভিন্ন ধরণের গল্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তাঁর ব্যক্তিত্বের নানামুখী চেতনা-প্রবণতা নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি। এবারে গল্পপ্রবাহ অনুসরণ করে তার দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে চাই। সেই প্রসঙ্গে তাঁর গল্পের প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের কথাও অনিবার্যভাবে এসে পড়বে।

ছোটগল্প দিয়েই বিভূতিভূষণের সারস্বত জীবনের সূচনা। প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র সাময়িকপত্রে আত্মপ্রকাশের আগে অন্তত ন'টি গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান আলোচনায় এই তথ্যটি তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। হয়ত কিছুটা এই কারণেই প্রথম দিক্‌কার গল্পগুলিতে দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তা থাকলেও কোন কোন দিক্ থেকে তিনি তখনও কিছুটা প্রথানুসারী, একেবারে নিরঙ্কুশভাবে আত্মপ্রত্যয়ী ন'ন—বিশেষত ছোটগল্পের প্রচলিত শিল্পরীতিকে অনেকটা সচেতনভাবে অনুসরণ করছেন। 'মেঘমল্লার' (১৯৩১) ও 'মৌরীফুল' (১৯৩২) গ্রন্থের অনেক গল্প এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই পর্যায়ে তাঁর দৃষ্টি যথেষ্ট রোম্যান্টিক। একদিকে সাধারণ বিবর্ণ জীবনের অন্তর্লীন গূঢ় রহস্য ও রস আবিষ্কারে তদ্‌গতচিত্ত, অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত বর্ণিল বিষয় ও চরিত্র নিয়ে তিনি একটির পর একটি গল্প লিখে চলেছেন। অতিপ্রাকৃত, অতীতদিনের পরিবেশ-নির্ভর ও রোম্যান্স-রসসিক্ত যতগুলি গল্প পূর্বোক্ত দুটি গ্রন্থে আছে, এমন বোধহয় পরবর্তীকালের কোন গল্পসঙ্কলনে নেই। দৃষ্টান্ত—অভিশপ্ত, বউ চণ্ডীর মাঠ, হাসি, খুঁটি দেবতা, প্রত্নতত্ত্ব, নাস্তিক, নববৃন্দাবন, মেঘমল্লার, রোম্যান্স, গ্রহের ফের ইত্যাদি।

প্রকরণের দিক থেকেও এই পর্বের অনেক গল্পেই ছোটগল্পের কেন্দ্রীয়

সংহতি, বিষয় ও ভাবের একমুখীনতা, অবয়বের দৃঢ়বদ্ধতা ইত্যাদি লক্ষণ যথেষ্ট পরিস্ফুট। এদিক থেকে অভিশপ্ত, পুঁইমাচা, জলসত্র, খুঁটি দেবতা ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়

কিন্তু এই পর্বের পরবর্তী গল্পসংগ্রহ 'যাত্রাবদল' (১৯৩৪) থেকে সত্যই বিভূতিভূষণের গল্পের জগতের একধরণের পালাবদলের সূচনা হয়েছে। এখানে দুটি কথা আগে বলে নেওয়া দরকার। প্রথমত, এই পালাবদলের অর্থ কখনোই বিভূতিভূষণের মৌলিক শিল্পিসত্তার সম্পূর্ণ রূপান্তর নয়। এ রূপান্তর কতকগুলি বিশেষ অর্থে, বিশেষ ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, একথাও স্পষ্ট করে বলা দরকার যে এরকম কোন সুনির্দিষ্ট পর্ব-ভাগ সম্ভব নয়, সঙ্গত-ও নয়। আগের পর্বের গল্পে পরবর্তী পর্বের লক্ষণ ও পরবর্তী পর্বের কোন কোন গল্প-রচনায় প্রথম পর্বের রীতি-পদ্ধতি অবশ্যই অনুসৃত হয়েছে। তাছাড়া, 'যাত্রাবদল'—গ্রন্থের সব ক'টি গল্পেই যে পরবর্তী পর্বের সব বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পেয়েছে, এমন নিশ্চয় নয়। তবে এটা ঠিক যে, এখান থেকেই মোটামুটি ভাবে একটা নূতন পর্যায়ের সূচনা হয়েছে। ক্রমে এর বিশিষ্ট লক্ষণগুলি স্ফুটতর হয়ে উঠেছে। বস্তুত এই পর্যায়ে এসেই বিভূতিভূষণ যেন তাঁর স্বকীয়তা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন। এখানে এসে তিনি ক্রমেই ছোটগল্পের প্রচলিত দৃঢ়বদ্ধ অবয়বের বন্ধন থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছেন। কাহিনী-বিন্যাসে কেন্দ্রীয় সংহতি থাকলেও তার গতি সর্বত্র সুনির্দিষ্টভাবে একমুখী নয়। প্রায়শই কিছুটা স্বচ্ছন্দ বিহারের প্রবণতা সেখানে লক্ষ্য করা যায়। গল্পের গতি অনেকস্থলেই মন্থর বিলম্বিত—'নসৃট্যালজিক' স্মৃতিচারণায় বা অতীত-মুখীনতায় তার চলনভঙ্গি কিছুটা ভারাক্রান্ত বা ইতস্ততঃ প্রসারিত। এর ফলে তাঁর এই পর্বের অবয়বের আংশিক শিথিলতা লক্ষণীয়।

'মেঘমল্লার-মৌরীফুলে'র পর্বে অনেকগুলি গল্পের বিষয় ও পরিবেশে যে বর্ণিলতা বা অলৌকিক রহস্যসৃষ্টির বিশেষ প্রবণতা চোখে পড়ে, পরবর্তী পর্বে সেটি ক্রমেই অপেক্ষাকৃত স্তিমিত হয়ে এসেছে। অতি-সাধারণ মাটি-ঘেঁষা গ্রাম্য নরনারীর তুচ্ছ বিবর্ণ জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ উপকরণ দিয়ে গল্পের ভাণ্ডার ক্রমশ পূর্ণ হতে লাগল। গল্পগুলি পড়লে প্রায়ই মনে হয় যেন সব ঘটনাই পুরোপুরি তাঁর অভিজ্ঞতা-প্রসূত। সব চরিত্রই যেন তাঁর অতি-চেনা। তার মধ্যে কিছুই যেন কল্পনাসৃষ্ট নয়। এরকম মনে হওয়ার আর একটি কারণ, এই পর্বের অধিকাংশ গল্পকে উত্তম পুরুষের

জবানীতে বিবৃত করা। 'মেঘমল্লার'-'মৌরীফুল'-পর্বের বেশীর ভাগ গল্পেই এই উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ নেই—'আমি' চরিত্র সেখানে প্রায়শই অনুপস্থিত। এই বিশেষ রীতিটিই বিভূতিভূষণের স্বকীয় ভঙ্গি। এই ভঙ্গির সাহায্যে তিনি যেন নিজের কাছে একান্ত সহজ হয়েছেন। পাঠকের সঙ্গে তাঁর সংযোগ আরও অকৃত্রিম অন্তরঙ্গ হতে পেরেছে। ছোটগল্প রচনার প্রচলিত সচেতন শিল্পসৃষ্টির দায় থেকে যেন তিনি ক্রমেই মুক্ত হয়ে উঠেছেন। স্রষ্টা হিসাবে তিনি দিনে দিনে আভরণ ও আড়ম্বর বর্জন করে নির্ভার হয়েছেন। গল্প রচনার নামে অনেকক্ষেত্রেই যেন তিনি আপন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে 'ডায়েরি'-র মতো সহজ দায়হীন ভঙ্গিতে বিবৃত করে চলেছেন। এই দায়হীন সহজ মনোভাবের ফলে গল্প রচনায় দু'ধরণের বৈশিষ্ট্য মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে—হয় ঘটনার অতিরিক্ত ভার অথবা ঘটনার অতি-বিরলতা। লেখক নিজের চোখে-দেখা বা কানে-শোনা ঘটনার বিবৃতি দিতে গিয়ে শিল্পের সংযম বা সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেছেন অনেক ক্ষেত্রে। ফলে নিছক ঘটনার ব্যঞ্জনাহীন বস্তুপিণ্ডের ভারে পাঠকচিত্ত শুধু ভারাক্রান্তই হয়েছে—ছোটগল্পের যথার্থ রস-সংবেদন লাভ করেনি। এ ধরণের গল্পের সঙ্গে বিভূতি-ভূষণের পাঠকমাত্রেরই যথেষ্ট পরিচয় আছে—তাই দৃষ্টান্ত দেওয়া থেকে বিরত থাকলাম।

অন্যদিকে ঘটনার অতি-বিরলতা বিভূতিভূষণের পরিণত জীবনের গল্পের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। বিভূতিভূষণ যে অতি-সাধারণ নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য জীবন-পরিবেশ থেকে গল্পের উপকরণ সংগ্রহ করতেন, সেখানে সব সময় বর্ণবহুল নাটকীয় ঘটনা ঘটে না, প্রাত্যহিক জীবনের বৈচিত্র্যহীনতাই সেই পরিবেশের নরনারীর একমাত্র অবলম্বন। তাদের জীবনের সেই অতি অকিঞ্চিৎকর উপকরণ এক বিশেষ মুহূর্তে লেখকের নিজস্ব এক 'মুড্' বা মানসিক অবস্থার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এক অর্থবহ গভীর ব্যঞ্জনা নিয়ে।

এধরণের গল্পে, বলা বাহুল্য, ঘটনার বিশেষ কোন আকর্ষণীয় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেই। অতি-সংক্ষিপ্ত ঘটনার শেষে একটি মুহূর্ত অপেক্ষা করে থাকে। লেখক যে ভাবেই হ'ক, শেষ পর্যন্ত সেই মুহূর্তের দর্পণে তাঁর চিরন্তন জীবনদৃষ্টিকে প্রতিফলিত করে তোলেন। মুহূর্তের সেই উদ্ভাসনই এই ধরণের গল্পের একমাত্র অন্বিষ্ট। বিভূতিভূষণ ছোটগল্প প্রসঙ্গে আলোচনায় এই 'মুহূর্ত'-সৃষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন—"মূল কৌশলটি হইল ছোট-

গল্পের মুহূর্ত বা moment। এই মুহূর্ত সৃষ্টিই ছোটগল্পের আর্টের প্রাণবস্তু।"
['রবি-প্রশস্তি'—বিভূতিভূষণ রচনাবলী, ১২শ খণ্ড; ৩৫০ পৃঃ]

এধরণের মুহূর্ত-নির্ভর ঘটনা-বিরল সার্থক গল্প হিসাবে তুচ্ছ (অসাধারণ), গল্প নয় (জ্যোতিরিঙ্গন), ভিড় (নবাগত) একটি দিন (যাত্রাবদল) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 'তুচ্ছ' গল্পে গরীব ঘরের একটি ছোট মেয়ের মাথায় সামান্য একটু গন্ধতেল মাখিয়ে দিয়েছেন। তাতে মেয়েটির ও গল্পের কথকের কী অসামান্য তৃপ্তি! এটুকুই গল্পের ঘটনা। কিন্তু গল্পের শেষে ওই আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তটি লেখক যেভাবে ধরে রেখেছেন স্মৃতির গভীরে, তারই মধ্যে এ গল্পের যথার্থ সার্থকতা: 'কি আনন্দ আমার স্নান করতে নেমে নদী জলে। উদার নীল আকাশে কিসের যেন সুস্পষ্ট সৌন্দর্যময় বাণী। অন্তরের ও বাইরের রেখায় রেখায় মিল।'

আবার এমন কিছু কিছু রচনা আছে, যেখানে ঘটনার অতিবিরলতা অথবা একান্ত অভাব রচনাগুলিকে যথার্থ ছোটগল্পের পূর্ণতা দান করেনি। এদের কয়েকটি নিছক প্রকৃতি-সমীক্ষা (মাকাললতার কাহিনী, দিবাবসান, প্রভাতী ইত্যাদি), আর কয়েকটি অনুভূতিমূলক স্মৃতিচারণ মাত্র হয়েছে, ঠিক ছোটগল্প হয়নি। এই শেষোক্ত শ্রেণীর রচনার মধ্যে বাইশ বছর (যাত্রাবদল) ভুবন বোষ্টমী (উপলখণ্ড) ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

সব মিলিয়ে বলা চলে যে, গল্প শরীর গঠনের দিক থেকে বিভূতিভূষণ ত্রুটিহীন নিশ্চয় ন'ন কিন্তু নিঃসন্দেহে তুলনাহীন। এ ধরণের গল্প লেখার 'দুঃসাহস' বোধ করি তাঁর আগে বা পরে আর কেউ করেন নি। গল্প রচনার প্রচলিত প্রকরণ-পদ্ধতি প্রায় সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে একেবারে নূতন পথে, নিজস্ব পথে চলেছেন তিনি। ঘটনার আড়ম্বর-নাটকীয়তা, দৃঢ় সংহতি এবং গল্পের শেষে চমক বা surprise দেবার রীতি সবই ক্রমে ক্রমে বর্জনই করেছেন তিনি। একটু আগে তাঁর কোন কোন গল্পে যে 'মুহূর্ত সৃষ্টির' অসাধারণ নৈপুণ্যের কথা বলেছি, তা আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা surprise-এর মতো মনে হলেও, আসলে তা' ওই অপেক্ষাকৃত 'স্থূল' বহিরঙ্গ রীতির এক মৌলিক অন্তর্মুখী রূপান্তর। বিভূতিভূষণের ওই শিল্পরীতি পাঠককে ঘটনার মধ্যে আবদ্ধ রাখে না, তা এক মুহূর্তে জীবনের গূঢ় অন্তর্লোকে উত্তীর্ণ করে দেয়। এই ব্যঞ্জনাধর্মের জন্যই তাঁর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ গল্পই কাহিনীরসের জোরালো-আকর্ষণ-বর্জিত হয়েও রসগ্রাহী পাঠক-চিত্তে এক অসামান্য আবেদন সৃষ্টি করে।

এই ব্যঞ্জনা-সৃষ্টির অন্যতম উপায় হিসাবে বিভূতিভূষণের প্রসাধনবর্জিত ভাষার বিশেষ তাৎপর্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। প্রসাধনহীনতা তাঁর ভাষার দারিদ্র্যের লক্ষণ নয়। বরং এখানেই তাঁর শিল্পবোধের সুপরিণত সমৃদ্ধির পরিচয়। তাঁর ভাষা এত সহজ ও ভারহীন বলেই যেন কঠিন বাস্তবতা থেকে চেতনার উত্তরণ এত স্বচ্ছন্দ ও অনিবার্য হতে পারে।

এই আশ্চর্য স্বচ্ছ ভাষা যেন স্ফটিক-স্বচ্ছ জলধারার মতো। এই ভাষার মধ্যদিয়ে লেখকের চিত্তকে অতি সহজেই যেন প্রত্যক্ষ করা যায়। লেখক-চিত্তের সঙ্গে পাঠক-মনের যোগ এর ফলেই একান্ত সহজ ও অবাধ হয়।

সামান্য একটা গ্রাম্য ঘটনা কি স্মৃতিকথা কিংবা একটা সূক্ষ্ম অনুভূতির এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু—এই নিয়ে সহজ প্রসাধনবর্জিত ভাষায় লেখা যে কয়েক পৃষ্ঠার বর্ণবিরল গল্প, সেখানে কাহিনীরসের চেয়ে সুরময় গীতিধর্মী এক গভীর সংবেদনই যে অধিকতর মর্মস্পর্শী, তাতে সন্দেহ নেই। সংবেদন-সঞ্চারের এই একান্ত মৌলিক ও অনন্য শিল্পদৃষ্টির সামর্থ্যেই গল্পকার বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়-রহিত।

———

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর ঃ জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্য ও ঐক্য

তারাশঙ্করের উপন্যাস-সাহিত্যের বিশাল পরিধির দিকে তাকালে প্রথমে যেন কিছুটা হতবুদ্ধি হতে হয়। একই লেখনীমুখে গণদেবতা ও মন্বন্তর, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা ও আরোগ্য নিকেতন, ধাত্রী দেবতা ও নাগিনীকন্যার কাহিনী—এ যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না। একই কলমের ডগায় তারাশঙ্কর ফুটিয়ে তুলেছেন আদিম গোষ্ঠী-জীবনের করুণ মধুর উপকথা, আবার যুদ্ধ-বিধ্বস্ত নাগরিক জীবনের বিপর্যয় ও বিকৃতির বাস্তব ছবি, বিস্তৃত সমাজ-বোধ ও রাজনৈতিক চেতনার অভ্যুত্থানের ইতিবৃত্ত এবং সহজিয়া বৈষ্ণব জীবনের মধুস্বাদী কাহিনী। বেদে বাউরী ডোম কাহার—সমাজের এই ব্রাত্যগোষ্ঠীর মর্মমূলটি যেমন তিনি উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন, তেমনি আবার ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত সামন্ততন্ত্রের বুকভাঙা করুণ হাহাকার ধ্বনিতে পাঠক-হৃদয়কে বিহ্বল করে তুলেছেন। সেই সঙ্গে আবার তাঁর দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয়েছে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত নাগরিক জীবন কিংবা গূঢ় গভীর অধ্যাত্ম জগৎ।

এমন অজস্র বিচিত্র কাহিনী, চিত্রপট ও চরিত্রের মিশ্রণে তারাশঙ্করের সাহিত্য-জগৎ গড়ে উঠেছে। এই জগতের সামনে দাড়িয়ে রস-সন্ধানী পাঠক বিস্মিত বিমুগ্ধ হন। কিন্তু বিচার-প্রবণ সমালোচক হন বিমূঢ়, কিছুটা বা বিভ্রান্ত। এই বিচিত্র রূপসৃষ্টির আড়ালে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের জীবন-দৃষ্টির মূল স্বরূপ কী, তা নির্ধারণ করা দুরূহ হয়ে ওঠে। তাঁর দীর্ঘ সারস্বত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে রচিত উপন্যাসে যে বিচিত্র ভিন্নমুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছে (কয়েকটিকে হয়ত বা স্ববিরোধীও মনে হতে পারে), তাদের ভিতরকার ঐক্য-সূত্রের অন্বেষণ রীতিমত বিভ্রান্তিকর ঠেকে।

সেই বিভ্রান্তি দূর করতে হলে তারাশঙ্করের আবির্ভাবের দেশ-কালগত পটভূমি ও তাঁর ব্যক্তিস্বরূপকে বুঝতে হবে।

আর এর আলোকেই তাঁর উপন্যাসের বহুমুখী প্রবণতার মধ্যেকার গূঢ় সঙ্গতি ও যোগসূত্র অনুধাবন করতে হবে। এই যোগসূত্র সন্ধান করতে

গেলে অনিবার্যভাবেই তাঁর উপন্যাস-সৃষ্টির বিবর্তন রেখাকেও অনুসরণ করা প্রয়োজন। সব মিলিয়ে এক বৃহৎ কর্মকাণ্ড। আমাদের এই নিবন্ধের নাতিদীর্ঘ পরিসরে এতদিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ নিশ্চয় সম্ভব নয়। তবু সাধ্যমত সংক্ষেপে আলোচনা করব।

২

গোড়াতেই তারাশঙ্করের জীবনের কয়েকটি সুপরিচিত তথ্যের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করতে চাই। প্রথমতঃ তারাশঙ্কর রাঢ় অঞ্চলের মানুষ। তাঁর ব্যক্তিসত্তা গঠনে এই রাঢ়ের বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের একটি মুখ্য ভূমিকা আছে। রাঢ়ের মাটিতে যে রুক্ষ কাঠিন্য, তারই প্রতিফলন ঘটেছে এর ধর্ম ও সংস্কৃতির উপব। বীর্য কঠিন তন্ত্রসাধনাব পীঠভূমি এই রাঢ় দেশ, আবার এরই পাশে পাশে চলেছে আর্যেতর মানবগোষ্ঠীব বিচিত্র লোকধর্ম ও লোকাযত সংস্কৃতিব আবহমান স্রোত। শুধু তাই নয়, বাঢ়ের 'রাঙামাটির পথে' স্তরে স্তরে অঙ্কিত হযে আছে অসংখ্য সহজিযা বৈষ্ণব বাউলের পদ-চিহ্ন। রাঢ়ের এই মিশ্র সাংস্কৃতিক আবহের মধ্যে তারাশঙ্কবের শিল্পি-ব্যক্তিত্বেব ক্রমবিকাশ ঘটেছে। পরবর্তীকালে তাঁব সৃজনশীল সত্তাকে গভীর-ভাবে প্রভাবিত ও আচ্ছন্ন বরে বেখেছে এই রাঢ়ের জীবন-পরিবেশ।

তদ্গতচিত্ত চারণকবির মতো এই অঞ্চলের বিচিত্র কিংবদন্তী, বা উপকথা ও বাস্তব সমস্যা-জটিল কাহিনীর মধ্য দিযে একে তিনি সাহিত্যের স্থাযী সম্পদে পরিণত করেছেন।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য, তারাশঙ্কবের ব্যক্তিত্বে বংশগত উত্তরাধি-কাব। তারাশঙ্কর বীরভূমের এক ক্ষযিষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান। তিনি জন্মেছিলেন উনিশ শতকেব একেবারে শেষ প্রহরে—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। তখন সমাজের এক যুগসন্ধি। একদিকে ক্ষযিষ্ণু সামন্ততন্ত্রেব আভিজাত্য ও মহিমা ক্রমেই ভেঙে পড়ছে, আবার অন্যদিকে সেই বিবাট ভগ্নস্তূপের উপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে আধুনিক পশ্চিমী নগরতন্ত্রের বনিযাদ, ব্যক্তিনির্ভর এক নূতন ধনতান্ত্রিক সমাজবোধ। এই ক্রান্তিকালের চেতনা তারাশঙ্কর পেযেছেন তাঁরই পারিবারিক জীবন-পরিবেশ থেকে। তিনি বলেছেন, 'সমাজতন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসাযীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরেদেখেছি, সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেযেছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদাব। সে দ্বন্দ্বে আমাদের অংশও ছিল।' (আমার কালের কথা)।

রক্তের মধ্যে তিনি এই দুই যুগের, এই দুটি বিপরীত কালস্রোতের নিগূঢ় আকর্ষণ অনুভব করেছেন। এর কোনটিকেই তিনি একেবারে চরম অবজ্ঞা-ভরে বর্জন করতে পারেন নি। রক্তে রক্তে টান দিয়েছে সামন্ততন্ত্রের সেই আশ্চর্য ঐশ্বর্যময় পৌরুষ-উদ্দীপ্ত দিনগুলি, তারাশঙ্করের চেতনাকে তারা উদ্ভাসিত করেছে অতীতচারী রোম্যান্টিক দৃষ্টির মেদুর আলোয়—সেই চেত-নার প্রতিচ্ছবি জেগেছে জলসাঘরে, কালিন্দীতে, ধাত্রীদেবতায়। আবার বিশ শতকে সমাজবাদী গণতান্ত্রিক চেতনার প্রভাবকেও তারাশঙ্কর এড়িয়ে যেতে পারে নি। তাঁর ফিউডাল রক্তস্রোতের উপর আছড়ে পড়েছে এই নূতন কালের দুর্বার তরঙ্গ।

রাঢ়ের বীর্য-কঠিন পৌরুষদীপ্ত সন্তান তারাশঙ্কর সামন্তযুগের ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে এসেছেন সমাজের বৃহত্তর পটভূমিতে। দেশের সমকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে দিয়েছেন তারাশঙ্করের জীবনের এই আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য। গান্ধীজীর মানবতা-বাদী অহিংস আন্দোলনের অন্তর্নিহিত সত্যটি তারাশঙ্করের জীবনবোধের উপর এক গভীর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে। ধাত্রীদেবতা,গণদেবতা ও পঞ্চগ্রামের মধ্যে নিষ্কাম জনসেবা ও বৃহত্তর গণজাগরণের যে সংকেত আছে তা অনেক পরিমাণে লেখকের জীবনে গান্ধীজীর ওই অভিনব 'মনুষ্যত্ব নির্ভর রাজনৈতিক আদর্শের অভিঘাতের ফল। উত্তরকালে তারাশঙ্কর সক্রিয় রাজ-নৈতিক আন্দোলন থেকে সরে এসেছেন, কিন্তু ওই আদর্শের নিগূঢ় মানবিক ও নৈতিক মূল্যগুলি তাঁর সাহিত্যের অন্তর্লোকে প্রবাহিত হয়েছে ফল্গুস্রোতের মত। 'একদিকে আদিম সহজিয়া স্বতঃস্ফূর্ত জৈব প্রাণধর্ম, অন্যদিকে আদর্শ-নিষ্ঠা, সামাজিক ও মানবীয় কল্যাণচিন্তা—তারাশঙ্করের উপন্যাসে একসঙ্গে অর্ধশরীশ্বরের মত যুক্তবেণী হয়ে আছে।'

তারাশঙ্করের উপন্যাসের মৌল প্রবণতার সন্ধানের ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়ো-জনীয় কয়েকটি তথ্য ও সূত্রের উল্লেখ করলাম। নিঃসন্দেহে এগুলি তাঁর উপন্যাস-সৃষ্টির কয়েকটি মূলসূত্র; আদিম বলিষ্ঠ ব্রাত্য মানুষের দুর্মর প্রাণ-রহস্য, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের অন্তিম দীর্ঘশ্বাস, আর দূরপ্রসারী সামাজিক রাষ্ট্রীক ও মানবিক আদর্শ-চেতনা।

এই আলোচনা থেকে সব মিলিয়ে একটা জিনিস নিশ্চয় কিছুটা স্পষ্ট

হয়ে উঠেছে যে তারাশঙ্করের জীবনে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ঈর্ষা করার মত। আর সে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে কুয়াশার লঘু আস্তরণের মত নিতান্ত ভাসাভাসা ধরণের নয়। সব রকম অভিজ্ঞতাই তিনি অর্জন করেছেন অস্তিত্বের কঠিন মূল্যে। তাঁর সত্তার সঙ্গে পাকেপাকে জড়িয়ে গেছে অতীতের দিনরাত্রির অসংখ্য ঘটনা, অজস্র নরনারীর মুখের মিছিল। মৃত্তিকালগ্ন কঠিন বাস্তব জীবনের প্রচণ্ড অভিঘাত তাঁর রক্তের মধ্যে যে বিপুল তরঙ্গবেগ জাগিয়েছে, তা-ই তাঁকে বাস্তব জীবনের সার্থক কথাকোবিদ ঔপন্যাসিক করে তুলেছে। মনে রাখতে হবে, ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের প্রতিষ্ঠার যে মূল বনিয়াদ, যে অন্তর্নিহিত শক্তি তা মুখ্যত এই অভিজ্ঞতার জোর থেকেই এসেছে। এই অভিজ্ঞতা নাগরিক জীবনের মধ্যবিত্ত মানসের ফাঁপানো ভাবাবেগের বাষ্পপুঞ্জমাত্র নয়, এ গ্রামে-গাঁথা বিস্তীর্ণ বাংলাদেশের ঋজু বলিষ্ঠ মানুষের অকৃত্রিম জীবনের অভিজ্ঞতা। আর এই একান্ত মাটি-ঘেঁষা জীবন-বাস্তবতার রূপচিত্রকে প্রত্যয়সিদ্ধভাবে উপস্থাপনের ফলেই সেদিন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর প্রথম আবির্ভাবের মুহূর্তেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে তারাশঙ্করের আবির্ভাব বাস্তবিক এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তিরিশের দশকে তারাশঙ্করের সেদিনকার অভ্যুদয় কিছুটা অপ্রত্যাশিত হলেও অস্বাভাবিক ছিল না। তার আবির্ভাবের সমকালীন প্রেক্ষাপটের উপর আলোকপাত করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। সেই সঙ্গে তারাশঙ্করের শিল্পিব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যও পাঠকের চোখে পরিস্ফুট হবে।

তারাশঙ্করের প্রথম গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোলে'। এই অর্থে 'কল্লোলে'ই তাঁর প্রথম আবির্ভাব। কিন্তু তারাশঙ্কর কোনদিনই 'কল্লোলগোষ্ঠী'ভুক্ত লেখক ছিলেন না। 'কল্লোল'-এর চেতনা বলতে যা-কিছু বুঝি, তাদের সঙ্গে তারাশঙ্করের শিল্পিস্বভাবের পার্থক্য ছিল প্রায় আমূল। শুধু তাই নয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে কুড়ি বা তিরিশের দশকে 'কল্লোল'পন্থী তরুণ লেখকগোষ্ঠী কথাসাহিত্যে যে নূতন তরঙ্গের উদ্দীপনা সঞ্চার করতে চাইলেন, তারাশঙ্কর সেখানে নিয়ে এলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ঢেউ, একেবারে অন্য আকাশ, অন্য মাটির স্পর্শ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে এক বিভ্রান্তিকর সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও অর্থ নৈতিক পটভূমিতে 'কল্লোলগোষ্ঠী'র তরুণ কথাশিল্পীরা যা কিছু লিখেছিলেন, তার প্রচ্ছন্ন ও অনেক ক্ষেত্রেই প্রকাশ্য সুর ছিল প্রথাবদ্ধ জীবনধারা সম্পর্কে এক-

ধরণের সংশয় ও অবিশ্বাসের। 'একদিকে স্বদেশের ও প্রচলিত সমাজের পুরনো ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান অনাস্থা ও অনীহা, অন্যদিকে পশ্চিমী সাহিত্য ও চিন্তা-ভাবনার ব্যাপক প্রভাবের অজস্র চিহ্ন—এই পর্বের গল্প-উপন্যাসের এই হল সাধারণ লক্ষণ।' অচিন্ত্যকুমার যাকে বলেছেন, 'প্রবল বিরুদ্ধবাদ' ও 'বিহ্বল ভাববিলাস'—সেই চেতনাকে আশ্রয় করে এই পর্বে রচিত হতে লাগল রোম্যান্টিক যৌবন-বৃত্ত সাহিত্য। তার প্রথম অভিঘাত যথেষ্ট উত্তেজক ও চমকপ্রদ হলেও ক্রমে তা পাঠকের কাছে বৈচিত্র্যহীন ও ক্লান্তিকর হয়ে উঠল। এর জন্য যেমন কতকাংশে দায়ী ছিল তরুণ লেখকদের জীবন সম্পর্কে ব্যর্থতাবোধ অস্থিরতা ও ক্রমবর্ধমান নেতিবাদী চেতনা, তেমনি অন্যদিকে আংশিক দায়িত্ব ছিল অধিকাংশ তরুণ কথাশিল্পীর কাহিনী পরিবেশ ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে 'শহুরে' ভাবের। এই সব লেখকদের অনেকেরই জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অল্পই ছিল। পাশ্চাত্য গল্প উপন্যাস, বিদেশী ভাবধারা এবং অনেকখানি তরুণ মনের রোম্যান্টিক কল্পনা দিয়ে তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। অনেকের হয়ত জীবন সম্পর্কে অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু তা বহুলাংশে নগর-জীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা মার্জিত বুদ্ধি-সচেতন নাগরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা জীবনের পরিচয়। এ পর্বের তরুণ লেখকদের অধিকাংশের বাংলার গ্রামজীবনের সঙ্গে, দেশের মাটির সঙ্গে তেমন ব্যাপক বা গভীর কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না বললেই চলে। ফলে, এই পর্বের কথাসাহিত্যে জীবন-জিজ্ঞাসা, জটিল জীবন রহস্যের সংকেত, তীব্র আবেগ এবং কথাসাহিত্যের অবয়বের সূক্ষ্ম শিল্পরূপ—এসব থাকা সত্ত্বেও এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জীবনের যথার্থ বাস্তব উপলব্ধি যেন ঘটছিল না। অথচ বাঙালী পাঠকের সহজ জীবনরসপিপাসু সত্তা ভিতরে ভিতরে যেন সেই জীবন-বাস্তবতার জন্য—সেই সহজ মাটিঘেঁষা জীবনের উপাদানে গড়া সাহিত্যের জন্যই সতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল। আধুনিক কথাসাহিত্যের এই 'সন্ধিপর্বে' বাঙালী প্রাণের সেই নিগূঢ় পিপাসার পরম চরিতার্থতারূপে দেখা দিয়েছিল তারাশঙ্করের (ও বিভূতিভূষণের) সাহিত্য। সমকালীন সাহিত্যের প্রবাহে এক ভিন্নমুখী স্রোত সঞ্চারের প্রবণতা নিশ্চয় এক অর্থে কিছুটা অপ্রত্যাশিত কিন্তু বাঙালী প্রাণের সহজ পিপাসার চরিতার্থতা সেদিন অবশ্যই অস্বাভাবিক ছিল না। শুধু তাই নয়, সেদিনের সেই সংশয়-জিজ্ঞাসা ও নেতিমূলক জীবনভাবনা-কেন্দ্রিক সাহিত্যের পটে তারাশঙ্করের মাটিঘেঁষা

সাহিত্যের সুস্থ বলিষ্ঠ জীবন-প্রত্যয়, মনুষ্যত্বের অমিয় মহিমায় প্রগাঢ় আস্থা ও গূঢ় অধ্যাত্ম-চেতনা বরং ভারতীয় ঐতিহ্যেরই বৃহত্তর সুরসঙ্গতি রচনা করেছিল। সমকালের তরুণ 'বিদ্রোহী' গোষ্ঠীর পটে আপন শিল্পব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা সম্পর্কে স্বীকারোক্তিতে তারাশঙ্কর নিজেই বলেছেন : 'আমি বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙে চুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনদিন হয় নি। ....,.আমার মনে ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্ন ছিল।' [আমার সাহিত্য জীবন]

তারাশঙ্করের এই 'অস্তি'বাদী মনের গঠনের নেপথ্যে অন্যান্য উপকরণের মধ্যে একটি হল তাঁর জন্মকাল। আগেই বলেছি, তিনি জন্মেছিলেন উনিশ শতকের একেবারে শেষ প্রহরে। তাঁর সত্তার গোপন মজ্জায় সেই উনিশ শতকী ঐতিহ্যনিষ্ঠা ও মানবনিষ্ঠ কল্যাণধর্মী আদর্শবোধ আমূল সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। তারাশঙ্কর লিখেছেন : 'আমার কালের কথা স্মরণ করতে গেলেই মনে পড়ে আমার কালের সেকালকে। ...সেকালকে আমি শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি, তার মহিমার কাছে আমি নত মস্তক।' .

'আমার সেকাল আর একালের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। চিরকল্যাণের একটি ধারা তার মধ্যে আমি দেখতে পাই।'

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে শিবনাথের স্বদেশ-জিজ্ঞাসায়, 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রামে' ন্যায়রত্ন মহাশয় ও দ্বারিকা চৌধুরীর কথায় ও চরিত্রে উনিশ শতকী জীবন-ভাবনা-পুষ্ট যে উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে, বস্তুত তা তারাশঙ্করেরই মনের নিহিত সত্তারই একাংশের প্রতিফলন। সেই সত্তা বিশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের পশ্চিমী-মনন-চিন্তাপুষ্ট বা নাগরিক প্রসাধনে পরিশীলিত নয়, তা আবহমান বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের ঐতিহ্যসম্মত মহৎ মানবিক মূল্যবোধে পরম আস্থাশীল।

৩

এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করলাম, তার পরিপ্রেক্ষিতে এবার তাঁর উপন্যাসের বিবর্তনের মূল পথরেখাটি দেখে নেওয়া প্রয়োজন। বস্তুত সেই পথে অগ্রসর হলেই তারাশঙ্করের উপন্যাসের প্রধান সূত্র বা মৌল প্রবণতাগুলি আরও স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত হবে।

তারাশঙ্করের সাহিত্য-জীবনের একেবারে গোড়ার দিকের উপন্যাসগুলি শিল্পের নিরিখে হয়ত তেমন উৎকৃষ্ট বলে মনে হয় না, তবু তাদের সমীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ওই সব উপন্যাসে তারাশঙ্করের মনের যেসব প্রবণতা ও প্রত্যয় দেখা দিয়েছে, উত্তরকালে তারই আলোয় তিনি দূরের দিকে যাত্রা করেছেন। বস্তুত সেই সব প্রবণতা ও প্রত্যয়কেই আরো ব্যাপকতর ও গভীরতর জীবনপটে সার্থক শিল্পরূপ দান করেছেন।

তারশঙ্করের লেখা প্রথম উপন্যাস 'রাইকমল'। কিন্তু সেটি প্রকাশিত হয় 'চৈতালী ঘূর্ণির' পরে। রাইকমলের দ্বিতীয় সংস্করণের (ভাদ্র, ১৩৫২) ভূমিকায় তারাশঙ্কর লিখেছিলেন—"চৈতালীঘূর্ণি" প্রথম প্রকাশিত হইলেও —রচনা হিসাবে 'রাইকমল'-ই আমার প্রথম উপন্যাস।" 'রাইকমল প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৪২-এ। (প্রথম উপন্যাসই শুধু নয়, তারাশঙ্করের প্রথম দুটি সার্থক গল্পও ('রসকলি' ও হারানো সুর') বৈষ্ণব রসাশ্রিত। গল্পকার ও ঔপন্যাসিক—তারাশঙ্করের এই দুই সত্তারই যুগপৎ প্রথম আত্মপ্রকাশ বৈষ্ণব রসচেতনার মধ্য দিয়ে।) আগেই বলেছি, তারাশঙ্কার যে রাঢ়ের সন্তান, তার রাঙা মাটির সঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণবদের সহজ জীবনের স্নিগ্ধ রঙ মিশে আছে। এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে আবাল্য পরিচয়ের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন তারাশঙ্কর। এই সহজিয়া বৈষ্ণব-বৈরাগীদের জীবন ও চরিত্রের মধ্যে তারাশঙ্করের শিল্পিসত্তা নানা আপাত-বিরোধী প্রবণতার সংমিশ্রণ ও সেই মিশ্রণের মধ্যে জীবনরসের এক বিচিত্র লীলামধুর প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। (জৈব কামনার সঙ্গে সূক্ষ্ম নির্লিপ্ত ও অধ্যাত্ম পিপাসার সমাহার, তুচ্ছতা-ভরা বাস্তব জীবনের পরিবেশে রোম্যান্টিক প্রণয়চেতনার স্ফুরণ—তারাশঙ্করের শিল্পিস্বভাবে এই বিচিত্র বিপরীতের প্রতি আকর্ষণ মজ্জাগত। এরই মধ্যে দিয়ে জীবনের মাধুর্য ও রহস্য তাঁর কাছে প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের কয়েকটি রচনায় বৈষ্ণব নরনারীর রোম্যান্টিক প্রেমমধুর আখ্যায়িকা নির্বাচন হয়তো কিছুটা বয়োধর্মের স্বাভাবিক প্রবণতারই নির্দেশ করে। বস্তুত এটা লক্ষণীয় যে, তারাশঙ্করের উপন্যাস (এবং ছোটগল্পও) রচনার একেবারে প্রাথমিক পর্বে যে রোম্যান্টিক কল্পনাপ্রবণ কবিদৃষ্টি ফুটে উঠেছে সেই দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর উত্তরকালের অনেক উপন্যাসেও অব্যাহত ছিল। (আসলে কল্পনাপ্রবণ কবিদৃষ্টিসঞ্জাত কয়েকখানি রোম্যান্টিক রসপুষ্ট উপন্যাস নিয়ে একটি ধারা রচিত হয়েছিল

তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনে। সেইসব উপন্যাসের মধ্যে 'রাইকমল', 'কবি', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'রাধা' ইত্যাদি স্মরণীয়। অবশ্য বলা বাহুল্য চরিত্র ও কাহিনী ছাড়াও পটভূমির স্বাতন্ত্র্যে ও বিস্তারে এবং পরিণত জীবনবোধ ও রসদৃষ্টিতে উত্তরকালের উপন্যাসগুলি 'রাইকমল'কে বহুদূর অতিক্রম করে গেছে। তবু 'রাইকমল' কিংবা 'কবি'র মত রোম্যান্টিক রসপুষ্ট উপন্যাসগুলির একটি 'সামান্যধর্ম' অবশ্যস্বীকার্য, সেটি এদের বাস্তব অভিজ্ঞতার বনিযাদ। (তারাশঙ্করের রোম্যান্টিক অনুভব বা কল্পনাপ্রবণতা কিছুই বাস্তবকে অস্বীকার করে না। আর এখানেই তাঁর দৃষ্টির যথার্থ 'আধুনিকতা'।)

'রাইকমলে'র পর 'চৈতালীঘূর্ণি'। রোম্যান্টিক রসলোক থেকে একেবারে খর বাস্তবের রুক্ষকঠিন ভূমি। 'চৈতালী ঘূর্ণি'র (১৯৩১) পরে বেরোয় 'নীলকণ্ঠ' (১৯৩৩)। গণজীবনের দুঃখ-দুর্গতির যে ছবি এই ক্ষুদ্রকায় উপন্যাস দুটিতে ফুটে উঠেছে, সে ছবি তাঁর কল্পনাসৃষ্ট নয়, তাঁর জীবনগত অভিজ্ঞতা থেকে তার জন্ম।) জমিদার বংশের সন্তান হিসাবে প্রজার উপর আর্থিক ও অন্যান্য কারণে অমানুষিক অত্যাচারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব তাঁর ছিল না। তা ছাড়া ১৯২১ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রেরণায় রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে জনসেবার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরবার সময় দরিদ্র কৃষকসমাজে দুর্গতির বাস্তব চেহারা তাঁর সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। 'চৈতালী ঘূর্ণি'-র শেষ দিকে আছে, কাহিনীর নায়ক গোষ্ঠী ঘটনার চাপে কৃষক-জীবন ত্যাগ করে গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে কারখানার শ্রমিকবৃত্তি গ্রহণ করল। এই শ্রমিক জীবনেরও নানান তথ্য তারাশঙ্কর জেনেছিলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। সে অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল ধনী শ্বশুরের 'কোলিয়ারী'তে কাজ শিখতে গিয়ে।

এইসব বাস্তব উপকরণের সঙ্গে মানবতাবাদী বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মিশ্রণে 'চৈতালী ঘূর্ণি' 'নীলকণ্ঠে'র সৃষ্টি। 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাস হিসাবে ক্ষুদ্রায়ত। কিন্তু এর বাস্তব প্রেক্ষাপটে বাংলার গণজীবনের এক বৃহৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত শ্রমিকই আসলে কৃষিক্ষেত্র থেকে উন্মূলিত ভূমিহীন নিঃসম্বল কৃষক। তারাশঙ্কর সেই রূপান্তরের করুণ অথচ বাস্তব আলেখ্যটিকে বিরল কয়েকটি রেখায় আঁকতে চেয়েছেন এই উপন্যাসে। শিল্পসৃষ্টি হিসাবে এটি আদৌ উৎকৃষ্ট নয়, স্বীকার করি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, 'চৈতালী ঘূর্ণি' থেকে যে সমাজ-সচেতন

বাস্তবনিষ্ঠ গণচেতনার ধারা প্রবাহিত হয়েছে, তারাশঙ্করের শিল্পিজীবনে তা বিচ্ছিন্ন আকস্মিক নয়। এই ধারাই 'ধাত্রীদেবতা'র মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দিগন্তবিস্তারী বিশাল জনসমুদ্রে গিয়ে মিশেছে 'গণদেবতা'য়, 'পঞ্চগ্রামে'। ('চৈতালী ঘূর্ণি' বা 'নীলকণ্ঠে'র দুঃখ-দুর্গতির চিত্রে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের কোন বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত নেই। 'ধাত্রীদেবতা'য় সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বিশাল প্রবাহের পটে দেখবার চেষ্টা করেছেন তারাশঙ্কর।) 'ধাত্রী দেবতা'য় শিবনাথের দৃষ্টিভঙ্গী মুখ্যত এক আবেগপ্রবণ তরুণের আদর্শবাদী দৃষ্টি হলেও তা' 'চৈতালী ঘূর্ণি'র মত স্বদেশচিন্তার একখণ্ড চিত্ররূপ মাত্র নয়, তা সমগ্র দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের বিস্তৃত পটে তরুণ শিবনাথের স্বদেশ ও জীবন-জিজ্ঞাসার আধার হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে স্বদেশের মূর্তি সেকাল ও একাল দুয়ে মিলে সম্পূর্ণ। তাঁর সামন্ত-চেতনায় সেকাল বেঁচে আছে, আর সমকালীন রাজনৈতিক গণআন্দোলনে একালে স্পর্শ। ('ধাত্রীদেবতা'র আগে তারাশঙ্কর লিখেছিলেন 'জলসাঘর' গল্পটি। সেই 'জলসাঘরে' প্রাধান্য পেয়েছে সেকালের ছবি, আর 'চৈতালী ঘূর্ণি' একালের কাহিনী। কিন্তু 'ধাত্রী দেবতা'—এই দুই কালের সমন্বয়-প্রয়াসের সৃষ্টি। বস্তুত তারাশঙ্করের শিল্পদৃষ্টিতে সেকাল ও একালের কোন দ্বন্দ্বই নেই।) দুই কালকে যুক্তবেণী করেছে চিরকালের মানবচেতনা। অবশ্য 'ধাত্রীদেবতা'য় এই দুই কালের বিরোধের ছবিটিই মুখ্য। উপন্যাসের ক্রমপরিণতির মধ্যে দেখি, নায়ক প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের নির্মোক ত্যাগ করে বৃহৎ জীবনাদর্শের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। কিন্তু তবু সে সামন্তচেতনা ও প্রাচীন জীবনবোধের প্রতীক তার পিসিমার উদ্দেশেই শেষ প্রণাম জানিয়ে বলেছে: 'তুমি তো আমায় বাস্তবকে চিনিয়েছ, তাতেই চিনেছি দেশকে। আশীর্বাদ কর, ধরিত্রীকে চিনে যেন তোমায় চেনা শেষ করতে পারি।'—এ মনোভাব কেবল শিবনাথের নয়, তারাশঙ্করেরও। (তাঁর দৃষ্টিতে বাস্ত দেশ ও ধরিত্রী, প্রাচীন ঐতিহ্য ও 'আধুনিক' যুগসংকট—সব মিলে এক অখণ্ড মানবমুখী চেতনা বিম্বিত হয়েছে। তবে এই চেতনা এখনও অনেকটাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাহিনীর পটেই বিধৃত। 'ধাত্রী-দেবতা' ও 'কালিন্দী'—দুখানা উপন্যাসেই তাই। শিবনাথ বা অহীনের মত ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-বংশের দু'একটি প্রগতিশীল তরুণই তখনও পর্যন্ত তারাশঙ্কর-এর মানবমুখী জীবনদৃষ্টির ধারক-বাহক।) কিন্তু ক্রমে এই দৃষ্টিকোণ বহুদূর প্রসারিত হয়েছে। পরিবার বা ব্যক্তিজীবনের সংকীর্ণ সীমা ভেঙে ফেলে

তারাশঙ্কর বিশাল জনপদের বহুস্তরে-বিন্যস্ত সমাজজীবনের বিরাট পট-ভূমিতে এনে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম-পদচিহ্ন ও হাঁসুলীবাঁকের উপকথায় তারাশঙ্করের মানবপ্রত্যয় ব্যাপকতর গণচেতনার সামগ্রিক প্রবাহে গিয়ে মিলেছে। বাংলা উপন্যাসে বিশাল গণজীবনের এই অদৃষ্টপূর্ব রূপায়ণ সেদিনের পাঠককে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করেছিল সন্দেহ নেই।

পল্লীবাংলার জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়েই তারাশঙ্কর বাংলা কথাসাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এতদিন তাঁর উপন্যাসে ও গল্পে সেই জীবনের খণ্ড খণ্ড রূপ আমরা দেখেছি গ্রামীণ কৃষকের অপরিসীম দুঃখ-দুর্গতি, সামন্ত-জীবনের ঐশ্বর্য ও দীর্ঘশ্বাস, গ্রাম্য বৈষ্ণবীর বেদনা ও মাধুর্য—এমনি নানা খণ্ডরূপের মধ্য দিয়ে গ্রাম-বাংলার সমাজজীবনের আংশিক পরিচয় আমরা পাচ্ছিলাম। কিন্তু গণদেবতা ও পঞ্চগ্রামে তারাশঙ্কর উন্মোচিত করলেন বাংলার গ্রামীণ সমাজের এক বিশাল সামগ্রিক রূপ। এখানে কোন ব্যক্তি-চরিত্র বা ব্যক্তির কাহিনী প্রধান নয়, গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সমাজ-চেতনার রূপটিই এখানে সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে। গ্রামীণ সমাজের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, নৈতিক চেতনা, ধর্মবোধ, উৎসব-অনুষ্ঠান-পার্বণ ও সেই সঙ্গে ওই সমাজভুক্ত মানুষের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র ছবির বিশাল শোভাযাত্রা। সব মিলিয়ে রাঢ়ের গ্রাম-সমাজের এক বিপুলায়ত 'ক্রনিক্‌ল'।

বাংলা উপন্যাসে বাংলার সমাজজীবনের এত বিশাল চিত্রপট এর আগে কখনও কেউ আঁকেননি। সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র-প্রদর্শিত পথকে আদৌ গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের দিশারী হলেন তারাশঙ্কর। উপন্যাসের বাঁধাধরা প্রচলিত কাঠামো নেই, নায়ক-নায়িকা-নির্ভর সুসংবদ্ধ কাহিনী-বৃত্ত সর্বত্র চোখে পড়ে না; তার বদলে উৎসব, পাল-পার্বণ ও পুরনো দিনের কাহিনী-কিংবদন্তীর মালা গেঁথে চারণ-কবির মতো লেখক গ্রাম-বাংলার চিরায়ত রূপটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। কিন্তু 'গণদেবতা' বা 'পঞ্চগ্রাম' কেবল পুরনো দিনের গ্রাম্য গাথা মাত্র নয়, সময়ের টানে এর মন্থর নিস্তরঙ্গ জীবনস্রোতের তলায় তলায় ঘূর্ণির মাতন লেগেছে, সমগ্র গ্রাম-সমাজ ক্রমে চঞ্চল উত্তাল হয়ে উঠেছে নূতন ও পুরাতন জীবনাদর্শের প্রবল দ্বন্দ্বে। আর সেই দ্বন্দ্বের প্রচণ্ড চাপে প্রাচীন ক্রমশ পিছু হটেছে। গণদেবতার 'চণ্ডীমণ্ডপ' ভেঙে পড়েছে, শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন চিরদিনের জন্য বাস্তুভিটা ছেড়ে চলে গেছেন।

'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম'-এ রাঢ়ের এক বিশেষ অঞ্চলের মাটি ও মানুষের ছবি আছে। এই অর্থে এদের বলা হয়ে থাকে 'আঞ্চলিক উপন্যাস'। আমরা জানি, বাংলা উপন্যাসে 'আঞ্চলিকতা'র লক্ষণ তারাশঙ্করের রচনাতেই সম্ভবত সর্বাধিক পরিস্ফুট। আঞ্চলিক সাহিত্যের সবচেয়ে যেটি আকর্ষণীয় উপকরণ, সেই পটভূমি বা পরিবেশ কেবল রচনার বহিরঙ্গ বৈচিত্র্যসাধন বা শোভাবর্ধনের জন্যই ব্যবহৃত হয় না, সেই অঞ্চলের বহিঃপ্রকৃতি সমাজ-সংস্কৃতি ধর্ম লোকাচার ইত্যাদির প্রভাব সেখানকার নরনারীর চরিত্র ও জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে কেমন করে নিগূঢ়ভাবে সক্রিয় ও সজীব হয়ে ওঠে, তারই সংহত সামগ্রিক আবেদন বস্তুত শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক সাহিত্যের ফলশ্রুতি। বলা বাহুল্য, তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' এই অর্থে নিশ্চয় আঞ্চলিক উপন্যাসের অর্থবহ নিদর্শন। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় এই আঞ্চলিকতার লক্ষণগুলি যেন আরও সুচিহ্নিত, আরও অনুপুঙ্খ বর্ণনার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। রাঢ়ের এক নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ আদিম মৃত্তিকাশ্রয়ী ব্রাত্য 'কাহার' নরনারীর একটি বিশাল গোষ্ঠীগত জীবনপট একই সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্যে এবং 'উপকথার মায়াবী সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

কিন্তু এহ বাহ্য। আঞ্চলিক উপন্যাস-শিল্পের শ্রেষ্ঠ রূপকার হওয়া সত্ত্বেও তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসের শেষ সামগ্রিক আবেদনে কিন্তু স্থান-কালের সীমাকে বারবার অতিক্রম করে গেছেন। আর এখানেই তাঁর শিল্পি-স্বরূপের স্বাতন্ত্র্য। ঔপন্যাসিক হিসাবেও এখানে তাঁর মহত্ত্ব। 'হাঁসুলী বাঁকে' শেষ পর্যন্ত বনোয়ারী ও করালীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত এমন একটি প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে, তারা একান্ত সজীব হয়েও এমন দুটি জীবনাদর্শের প্রতিভূরূপে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে—যা কোন সংকীর্ণ দেশে-কালে সীমিত হতে পারে না। হাঁসুলী বাঁকের কাহিনীর শেষ পর্যায়ে এসেছে বিশ্বযুদ্ধ, 'যে যুদ্ধে হাঁসুলী বাঁকের তন্দ্রা ভঙ্গ হয়, উপকথায় ছেদ পড়ে, এখানকার মানুষের জীবনস্রোত পৃথিবীর জীবনস্রোতের আকর্ষণে ইতিহাসের ধারায় মিশে যায়।"...বস্তুত 'হাঁসুলী বাঁকে'র শেষে দেখি নানা ঘটনার অনিবার্য টানে 'উপকথা'র পুরনো পরিবেশ ও পুরনো সময়ের সীমাবদ্ধতা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে নতুন পৃথিবী ও নতুনকালের প্রচণ্ড অভিঘাতে।

'পঞ্চগ্রামে'র শেষেও দেখি আইন অমান্য আন্দোলনকে উপলক্ষ করে স্বাদেশিকতার প্রবল জোয়ার এসে আঘাত করেছে পঞ্চগ্রামকে। আর সেই

বৃহত্তর ইতিহাসের বিস্তীর্ণ পটভূমির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে উপন্যা-সের সীমিত আঞ্চলিকতার খণ্ডরূপ। 'পঞ্চগ্রামে'র শেষে যে-মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও মুক্তির আশ্বাসবাণী উচ্চারিত হয়েছে, সে মানুষ কোন বিশেষ ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ নয়। সে চিরকালের মহৎ মূল্যবোধে উদ্দীপিত সংগ্রামী মানুষ।

৪

কেবল 'পঞ্চগ্রামে'ই নয়, তারাশঙ্কর তাঁর সমস্ত উপন্যাসের মধ্য দিয়ে একটি বিশাল সামগ্রিক 'ক্রনিকল' রচনা করতে চেয়েছেন। সে 'ক্রনিকল' সর্বা-ঙ্গীণ রূপে মানুষের। সেই মানুষ নিছক আদর্শনিষ্ঠ মহৎ মানুষ নয়, সে উত্তরঙ্গ জীবনের অলো-অন্ধকারের বর্ণসম্পাতে বিচিত্র বিস্ময়কর মানুষ। মানুষের ক্ষুদ্রতা-নীচতা, তার প্রচণ্ড জৈব সংস্কার, তার ঐশ্বর্য ও দুঃখ-দুর্গতি, নানা বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে তার প্রবল দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, আবার তারই মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের অম্লান মহিমার আত্মপ্রকাশ—সবকিছু নিয়েই মানুষের যে তীব্র গাঢ় জীবন-চেতনা, তারাশঙ্কর তার শিল্পী-জীবনের নানা পর্যায়ে বিচিত্র কাহিনী চরিত্র ও পরিবেশের অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব সংবেদনের মধ্য দিয়ে তাকেই আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। রাঢের আঞ্চলিক ভূখণ্ড কিংবা বেদে বাউরী ডোম কাহারের মতে লোকায়ত ব্রাত্য জনসমষ্টির অসংখ্য ছবি তাঁর উপন্যাসে যে বারবার দেখা দিয়েছে, তার কারণ তাঁর এই জীবনগত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। আশৈশব এই সব ছবিই তিনি দুচোখ ভরে দেখেছেন, আর এর মধ্য থেকেই মানুষের জীবনের অন্তর্লীন তাৎপর্যকে অন্বেষণ করে-ছেন। তাই বলছি, রাঢ় অঞ্চলকে তিনি পটভূমি হিসাবে নির্বাচন করেছেন নিছক আঞ্চলিক উপন্যাস সৃষ্টির জন্য নয়, তার কারণ আরও দূরস্পর্শী।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে মানুষের জীবনের বিচিত্রবর্ণ ছবি ফুটেছে, জৈবচেতনা তার একটি মুখ্য উপকরণ। দুর্মর জৈবসংস্কারের লীলা-রহস্যরূপ তারাশঙ্কর সারা জীবন মুগ্ধ বিস্ময়ে অবলোকন করেছেন। এই প্রবল জৈববৃত্তি জীবনের অন্তর্লীন দুর্বার প্রাণশক্তিকেই মূর্ত করে তোলে। জৈবপ্রবৃত্তি সমস্ত পাপ-পুণ্যবোধের সীমাকে অতিক্রম করে মানুষের জীবনে অলঙ্ঘ্য নিয়তিরূপে দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, তারাশঙ্কর সংকীর্ণ নীতিবাদীর দৃষ্টিতে এই প্রবৃত্তি বিচার না ক'রে শুধু জীবনরহস্যের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করেছেন। সেই প্রবৃত্তির

বিচিত্র রূপচিত্র অঙ্কনে তারাশঙ্কর আদৌ দ্বিধাগ্রস্ত ন'ন। জীবনরহস্যের বিচারমূলক সমীক্ষায় তারাশঙ্করের প্রবণতা তেমন গভীর নয়, আসলে তিনি পুরুষকারদীপ্ত প্রবৃত্তি-তাড়িত সহজিয়া জীবনের ও প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত অনিবার্য মানব-নিয়তির নির্নিমেষ দ্রষ্টা। রাঢ়ের আদিম লোকায়ত জীবনের মধ্যেই বিশেষভাবে তারাশঙ্কর এই প্রবল জৈবপ্রবৃত্তির বিস্ময়কর প্রকাশ দেখেছেন।

তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস 'রাইকমলে'ই এই জৈবসংস্কারের অনতিস্ফুট প্রকাশ ঘটেছে। বৈরাগী রসিকদাস ও বৈষ্ণবী রাইকমলের জীবনে জৈবপিপাসার যে অতল রহস্য, ধর্মচেতনার দ্বারা তা' কিছুটা পরিশীলিত হবার ফলে তেমন উদ্দাম ও প্রচণ্ড হতে পারেনি। কিন্তু এর পরে লেখা অজস্র গল্পে ও অনেক উপন্যাসে—আগুন, তামস তপস্যা, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, পঞ্চপুত্তলী ইত্যাদিতে এই 'এলিমেণ্টাল' অন্ধ প্রবৃত্তি তাড়িত মানুষের রহস্যময় দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ রূপটি আশ্চর্য নৈপুণ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে।)

তারাশঙ্করের সাহিত্যে এই সামাজিক সংস্কারমুক্ত আদিম জৈবচেতনার সঙ্গে 'কল্লোল গোষ্ঠী'র মানস প্রবণতার সাদৃশ্য কারো কারো চোখে পড়তে পারে। কিন্তু যৌন-চেতনার বর্ণনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে কুণ্ঠাহীন নিঃসঙ্কোচ মনোভাবের দ্বারা তরুণ 'কল্লোল'পন্থীরা চালিত হয়েছিলেন, তার সঙ্গে তারাশঙ্করের উপন্যাস-গল্পের লোকায়ত ব্রাত্য মানুষের আদিমতার সাধর্ম্য অনেক ক্ষেত্রেই বহিরঙ্গ ও আংশিক বলে মনে হয়। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের অর্থ নৈতিক ও ভাবসংকটজনিত যে-রূপ—যে-ব্যর্থতা ও অবক্ষয়-চেতনা বুদ্ধিজীবী সমাজে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, তারই প্রতিফলন ঘটে এই 'আধুনিক' কথাসাহিত্যের 'যৌন বিদ্রোহে'র মনোভাবে। কিন্তু তারাশঙ্করের শিল্পিসত্তা এধরণের দ্বিধা ভাবসংকট বা অবিশ্বাসের দ্বারা আদৌ স্পৃষ্ট বা লালিত নয়। তাঁর মানসলোক দ্বিধা-সংশয়-মুক্ত সহজ বলিষ্ঠ জীবন-অভিজ্ঞতার রসে কানায় কানায় ভরা। তাই তাঁর উপন্যাসে যে দুরন্ত জৈবপিপাসার ছবি ফুটেছে, তা একান্তভাবে আদিম লোকায়ত নরনারীর সহজাত প্রবৃত্তির ছবি। তার মধ্যে বুদ্ধিজীবীর ব্যর্থতা ভাবসংকট ও সংশয়ের প্রতিফলন নেই। বরং তা' কতকটা মহাকাব্য বা গাথাকাব্যের সহজ বলিষ্ঠ জীবনপটের সমধর্মী।

(তারাশঙ্কর যে জনজীবনের বিপুলায়ত 'ক্রনিক্‌ল' রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন, সেই 'মহাকাব্য'-ধর্মী রচনায় একদিকে যেমন 'আঞ্চলিক' পরিবেশের অনুপুঙ্খ বর্ণনা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি অন্যদিকে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-জনিত নাটকীয় উত্তেজনারও এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তারাশঙ্করের উপন্যাসে এই সংঘর্ষের রূপ বিচিত্র। 'রাইকমল' থেকে শুরু করে প্রতিটি উপন্যাসেই কয়েকটি সংঘাত-জটিল মুহূর্ত বা ঘটনা-সংস্থান উপন্যাসের মধ্যে অসামান্য গতিবেগ ও উত্তাপ সঞ্চার করেছে। 'কালিন্দী' থেকে তারাশঙ্করের উপন্যাসে এই নাটকীয় দ্বন্দ্ব ক্রমশ ব্যাপ্তি ও জটিলতা লাভ করেছে।

(তারাশঙ্করের মধ্যে যে নাট্যকার সত্তা পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করতে পারেনি, সেই সত্তাই যেন উপন্যাসে ও গল্পে অজস্র দ্বন্দ্ব জটিল পরিস্থিতি ও সমস্যা রচনা করে তৃপ্তি খুঁজেছে। বস্তুত তারাশঙ্করের প্রায় সব উপন্যাসেই যে প্রচণ্ড নাটকীয় আবর্তের ফেনিল রূপ দেখি, তার মূলে আছে লেখকের জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ মুহূর্ত ও ঘটনাসংস্থানকে বস্তুনিষ্ঠ তদ্গত দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণের অসামান্য ক্ষমতা।) মহাকাব্য ও নাটক—সাহিত্যের এই দুই মাধ্যমের মধ্যে একটি সাদৃশ্য সর্বজনবিদিত। সেটি হ'ল স্রষ্টার নিরপেক্ষ 'অবজেক্‌টিভ' দৃষ্টি। (তারাশঙ্করের কোন কোন রচনা যে একই সঙ্গে মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত ও অংশ-বিশেষে নাট্যগুণান্বিত হতে পেরেছে, তারও মূলে অন্যতম কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গিগত সাধর্ম্য। তারাশঙ্করের উপন্যাসে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের রূপ বিচিত্র অবয়ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কোথাও তা' দুই সামন্ত পরিবারের মধ্যেকার সংঘাত, কোথাও দুই বিরোধী পক্ষের একটি সামন্ততন্ত্র, অন্যটি যন্ত্র-শিল্প, কোথাও প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনা ও পারিবারিক সম্ভ্রম-ঐতিহ্যের দ্বন্দ্ব, কোথাও আবার দাম্পত্য সংঘাত, আবার অনেক ক্ষেত্রে তা গোষ্ঠীচেতনার সঙ্গে ব্যক্তিচেতনার কিংবা প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের অথবা জৈবসংস্কার ও নীতি-বিবেকের প্রচণ্ড সংগ্রামের বিক্ষুব্ধ জটিল কাহিনী। অবশ্য একথা মাঝে মাঝে মনে হয় যে, নাটকীয় দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তারাশঙ্করের যেন এক ধরণের বিশেষ আসক্তি আছে। এর ফলে তিনি মাঝে মাঝে যত জোরালো ভাবে 'নাটক' সৃষ্টি করেন, তত গভীরভাবে জীবনের নিহিত তাৎপর্যকে উন্মোচন করতে সক্ষম হন না।) (অবশ্য সর্বত্র তা' নয় নিশ্চয়। তারাশঙ্করের কাছে উপন্যাসে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সৃষ্টি অবশ্যই নিছক কাহিনীকে আকর্ষণীয় করে

তোলার জন্য নয়। ব্যক্তি-জীবনে এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-জনিত দুঃসহ আঘাত সৃষ্টি করে লেখক সেই সঙ্কটের বজ্র-আলোয় চরিত্রের যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে চান। আর এই শিল্পগত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই শিবনাথ, দেবু ঘোষ কিংবা বনোয়ারীর জীবনে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-জটিলতা সৃষ্টির তাৎপর্য যথেষ্ট।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে যত রকম দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ছবি আছে তাদের বেশীর ভাগই স্বরূপত প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষ। ইন্দ্র রায়ের সঙ্গে বিমল মুখুজ্জের যে বিরোধ, শিবনাথের সঙ্গে তার শ্বশুরের কিংবা বনোয়ারীর সঙ্গে করালীর বা জীবনমশায়ের সঙ্গে প্রদ্যোৎ ডাক্তারের যে সংঘর্ষ—তা আসলে প্রাচীন ও নবীনের, বিগতকাল ও বর্তমানের দ্বন্দ্বের রূপভেদ মাত্র।) এরকম দৃষ্টান্তের তালিকা এখানেই শেষ নয়। (বস্তুত এই কালচেতনা তারাশঙ্করের উপন্যাসের এক বিশিষ্ট লক্ষণ। তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে মানুষের যে মহাকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তার মধ্যে একদিকে যেমন জীবনের নিহিত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, অন্যদিকে তেমনি এই কালচেতনা, যা ইতিহাস-চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত,—এই দুটি উপকরণ মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। তারাশঙ্করের এই ইতিহাস-চেতনা তাঁকে সাহায্য করেছে সামাজিক রূপান্তর ও সামাজিক সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করতে এবং তার প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিজীবনের যথার্থ মূল্য ও তাৎপর্যকে অনুধাবন করতে। ফিউড্যালিজমের ক্ষয়িষ্ণু রূপ, নূতন যন্ত্র-নির্ভর শিল্পসভ্যতার উত্থান, দুর্বল কৃষি-নির্ভর জীবনের উপর তার অভিঘাত, এ সব ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের বিবর্তনের সঙ্গে তারাশঙ্কর যুক্ত করেছেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের বৃহৎ প্রেক্ষাপট। উপন্যাসের কাহিনীতে সন্ত্রাস-বাদ, গান্ধীবাদ ও পরবর্তী স্তরে সমাজবাদ ও সাম্যবাদের ভাবধারাপুষ্ট ক্রিয়া-কলাপ ও আন্দোলনের প্রতিফলন লেখকের সজীব ইতিহাস-চেতনার নিশ্চিত সাক্ষ্য বহন করে।)

তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক দৃষ্টির এই ঐতিহাসিক বিস্তার তাঁর চেতনাকে প্রগতিশীল করে তুলেছে। সামন্ততন্ত্রের প্রতি তার রক্তের গভীরে যতই 'নস্ট্যালজিক' মমতা থাক না কেন, তাঁর ইতিহাস-সচেতন গতিশীল মন সেই বন্ধনে নিজেকে সীমিত রাখেনি, সেই বন্ধন ছিঁড়ে তাঁর ব্যক্তিসত্তা 'ধাত্রী-দেবতা'র শিবনাথের মত কিম্বা 'কালিন্দী'র অহীনের মত দেশের বৃহত্তর গণজীবন ও প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চেয়েছে।

ব. ক প্র. —১১

তারাশঙ্কর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করতে গিয়ে এক জায়গায় প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন :

('জীবন—অন্তত মানুষের মত প্রাণশক্তি—বিপ্লবধর্মী প্রগতিশীল : প্রতি মুহূর্তে সে তার অতীতকে অতিক্রম ক'রে ভবিষ্যতের পানে নূতন উপলব্ধির পথে চলেছে, সে উপলব্ধি নূতন সত্যের উপলব্ধি। বৃহৎ থেকে বৃহত্তর, মহৎ থেকে মহত্তর সৎ-এর উপলব্ধি। সমাজগত জীবনে, জাতিগত জীবনে এই পথের প্রতিকূল অবস্থাগুলিকে ভেঙে চুরে অনুকূল ও সমতল করার মধ্যে তার অভিব্যক্তি। এক এক সময় এক একটা ক্ষেত্রের বাধা কঠিন এবং রূঢ় হ'য়ে ওঠে। তখন প্রাণশক্তির সকল বেগ একত্রিত হয়ে তাতে আঘাত করে। সমাজগত ও জাতিগত জীবনের মধ্যেই তখন ব্যক্তি জীবনযুদ্ধে সম্মিলিত হয়ে বৃহৎ ও মহত্তের সৃষ্টি করে।' [আমার সাহিত্য জীবন—পৃ ১৭৭-১৭৮]

তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে মানুষের এই প্রগতিশীল সংগ্রামমুখর রূপ উন্মোচন করে তার অন্তর্নিহিত মানবিক মহত্ত্বকে আবিষ্কার করেছেন। বস্তুত মানুষ তার দুর্বলতা জৈবপ্রবৃত্তি দুঃখ-বেদনা পাপ ও আত্মগ্লানি, পরাজয় ও অসম্মান—সব কিছু নিয়ে ও প্রতিকূল সব কিছুর সঙ্গে সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত মহিমময় ও মহৎ। তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যজীবন আরম্ভ করেছিলেন মানব-মহিমায় এই গভীর আস্থা নিয়ে। তিনি বলেছেন : ' . একটি মহিমার আভাস আমি অনুভব করেছিলাম এ-জীবনের প্রারম্ভে—এবং তারই মহিমা-কীর্তনের ও রূপের অপরূপ প্রকাশ-সৌন্দর্যের কথা বলবার একদা আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেছিলাম'।

(ঔপন্যাসিক জীবনের বিভিন্ন পর্বে মানবমহিমায় এই নিগূঢ় প্রত্যয় কখনও বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি তারাশঙ্করের। (মানুষ সম্পর্কে কোথাও তিনি 'সিনিক্' নন। বরং মনে হতে পারে একটু বেশী মাত্রায় আশাবাদী যেন। মানবতা-বিরোধী সব শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁর উপন্যাসের নায়কেরা নৈতিক অর্থে জয়যুক্ত হয়েছে, মনুষ্যত্বের মহিমা তাদের অম্লান থেকে গেছে। দেখতে পাই, প্রবল জৈবপিপাসা, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র, গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের অসংখ্য বিপত্তি ও সঙ্কট পার হয়ে তারাশঙ্করের দৃষ্টি সংহত হয়েছে অচঞ্চল মানবমহিমায়। এই অর্থে তারাশঙ্কর 'রিয়্যালিষ্ট' হয়েও নিগূঢ়ভাবে আদর্শবাদী। তাঁর উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত যে প্রশস্তি রচিত হয়েছে, তা 'ধনীর-নয়, দরিদ্রের নয়, জমিদারের নয়, প্রজার নয়, মহিমময় মানুষের।'

(আমার কালের কথা—১৬-শ পরিচ্ছেদ) এই সত্য 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর' ইত্যাদি উপন্যাসের পরিণতি বা ফলশ্রুতি পর্যালোচনা করলেই পরিস্ফুট হবে। বলা বাহুল্য, তারাশঙ্করের এই মানবীয় আদর্শচেতনা শেষ পর্যন্ত যতই দূরপ্রসারী ও সর্বজনীন হ'ক না কেন, এই চেতনা নিশ্চয় বৃন্তহীন পুষ্প নয়, এর প্রেরণামূলে ভারতীয় সংস্কার ও ঐতিহ্য-বোধের মৃত্তিকাস্পর্শটুকু সুনিশ্চিত।

পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবিত 'কল্লোলে'র কালে তারাশঙ্করের মন ভারতীয় মহাকাব্য ও প্রাচীন লোক-সাহিত্য-সংস্কৃতির জীবনভূমি থেকে শিল্পপ্রেরণা ও মূল্যবোধ সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হয়েছিল। দেশজ কাব্য-সাহিত্যের—পাঁচালী, গাথা-কাব্য, কবিগান ও রামায়ণ-মহাভারতের অন্তর্নিহিত সহজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণরস ও চিরায়ত জীবনাদর্শ তারাশঙ্করের রসদৃষ্টি ও জীবনবোধকে অনুপ্রাণিত করেছিল সেদিন। সেই ঐতিহ্যমূল আদর্শের আলোয় ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর দীর্ঘ পথ চলেছেন। সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে তাঁর উপন্যাসের নানা প্রবণতা ও পরিণাম। তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলিতে যে মর্মবিদারী ট্র্যাজিক পরিণাম নেই, জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টি যে শেষ পর্যন্ত দুঃখবাদীর নয়, বরং প্রবল আশাবাদীর, শিল্প-চেতনায় যে ত্যাগ সত্য প্রেম ও অহিংসার নিগূঢ় প্রতিফলন—এ সবেরই সঙ্গে অচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে জড়িয়ে আছে তারা-শঙ্করের গভীর ঐতিহ্যনিষ্ঠ ভারতচেতনা। 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথের ভাব-কল্পনায়, 'গণদেবতা'-'পঞ্চগ্রামে'র দেবু ঘোষের সহনশীল পরম আশাবাদীর প্রসারিত জীবনদৃষ্টিতে, 'সন্দীপন পাঠশালা'র পণ্ডিত সীতারামের ত্যাগনিষ্ঠ শান্ত সংযত জীবনসাধনায় কিংবা 'আরোগ্য নিকেতনে'র জীবন মশায়ের দার্শনিক-সুলভ নিরাসক্ত মৃত্যু-চেতনায় এই ভারতীয় সংস্কারেরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে তারাশঙ্করের এই ভারতীয় ঐতিহ্যনিষ্ঠা এক কঠিন সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছিল।

রাজনৈতিক আদর্শের বিবর্তনের পথে 'সাম্যবাদের' গুরুত্ব ইতিহাস-সচেতন তারাশঙ্করের মনে বিশেষ ভাবে দাগ কেটে ছিল। তাই বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে নূতন কালের কাহিনী আশ্রয় করে তিনি যে উপন্যাস রচনা করলেন—সেই 'মন্বন্তরে'র নায়ক-নায়িকারা ছিল 'সাম্যবাদী'। পাঠকমনে সংশয় জাগল, তারাশঙ্করের রাজনৈতিক আদর্শে ও জীবনবোধে পালাবদলের দিন এল নাকি। কিন্তু তারাশঙ্কর আপন মৌল বিশ্বাসে অটল। 'মন্বন্তরে'র

তথাকথিত 'সাম্যবাদ'-প্রবণতা শেষ পর্যন্ত তাঁর উপন্যাস সাহিত্যের বিবর্তন ধারায় একটি সাময়িক পর্যায়মাত্ররূপেই গণ্য হ'ল। 'মন্বন্তরে'র শেষ অধ্যায়ে গান্ধীজীর দীর্ঘদিনব্যাপী অনশন-ভঙ্গের পর সেই প্রসঙ্গে 'সাম্যবাদী' নেতা বিজয়বাবু তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন :

'পৃথিবী যাই বলুক, ভারতের চিরন্তন সাধনার ধারা জয়যুক্ত হয়েছে। ...ষ্ঠের পুণ্যফল আজও নিঃশেষিত হয় নাই। ...সত্য হল জয়যুক্ত। ... ...ব্যাপী যুদ্ধে মানুষের সমাজে মহামন্বন্তরে ওই পুণ্যফল আমাদের সর্বোত্তম ...সা। আমাদের কর্মশক্তি সঞ্জীবিত হবে ওই পুণ্যে। ...জীবনের প্রতি প্রেম, জীবকে শ্রদ্ধা, সত্যের প্রতি আগ্রহ, মোহমুক্ত কল্যাণদৃষ্টি, মিথ্যার প্রতিরোধে অহিংস অনমনীয় দৃঢ়তা—চিরন্তন ভারতের বাণী বিশ্বশাস্ত্রের সঙ্গে সমন্বিত হবে। অমৃতময় মানব-সমাজ-রচনা সার্থক হবে।'

বস্তুত তারাশঙ্করের ভারতীয় ঐতিহ্যনিষ্ঠা ও আদর্শের প্রেরণামূলে গান্ধীজীর জীবন ও সাধনার এক বিশেষ ভূমিকা। গান্ধীজীর অহিংসা ত্যাগ ও সত্যাগ্রহের আদর্শই শুধু নয়, তাঁর প্রচারিত অর্থনৈতিক সমাজবাদের ভাবনাও তারাশঙ্করের মনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। একথা আগেই বলেছি 'আমার সাহিত্য-জীবন'-এ তারাশঙ্করের উক্তি :

"আমার অহিংসা ও সত্যের উপর বিশ্বাস 'ধাত্রীদেবতা' থেকে 'মন্বন্তর' পর্যন্ত সর্বত্র সুস্পষ্ট। মন্বন্তরের অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হয় 'পঞ্চগ্রাম'। 'পঞ্চগ্রামে'র মধ্যে আমার ধ্যান-কল্পনা সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট।"— 'পঞ্চগ্রামে'র সচেতন পাঠকমাত্রই জানেন, দেবু ঘোষের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত সেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক 'ধ্যান-কল্পনা'র স্বরূপ কী।

৬

বর্তমান প্রবন্ধের গোড়ার দিকে তারাশঙ্করের শিল্পিব্যক্তিত্বের মৌলিক গঠন সম্পর্কে কয়েকটি তথ্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলাম। তারপর তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলির বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতা বিচার-প্রসঙ্গে সেই ব্যক্তিত্বের মৌল গঠন সম্পর্কিত তথ্যগুলিকে আরেকবার যাচাই করবার সুযোগ পেলাম। আমাদের সেই প্রাথমিক তথ্যবিচার তারাশঙ্করের জীবনে গান্ধীজীর প্রভাব ও তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সামাজিক ও মানবিক কল্যাণচিন্তাপ্রসঙ্গ পর্যন্ত এসে থেমে গিয়েছিল। 'মন্বন্তর' ও 'পঞ্চগ্রামে'র আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আবার সেই

বিন্দুতেই এসে পৌছেছি। কিন্তু জীবন-রহস্য-সন্ধানী তারাশঙ্করের যাত্রাপথ ওই মানবিক প্রত্যয়ের বিন্দুতেই শেষ হয়নি। (তাঁর উপন্যাসের সব চেতনা, সব প্রবাহ-প্রবণতা—স্বদেশ-চেতনা সমাজ-চেতনা গণচেতনা, সবই ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্তরশায়ী আস্তিকবুদ্ধি ও অধ্যাত্মচেতনার মহৎ মোহনায় গিয়ে মিশেছে।)

এই অধ্যাত্মচেতনা তারাশঙ্কর লাভ করেছিলেন তাঁর সমাজ, পরিবার ও 'সেকাল' থেকে। আর সেই সঙ্গে মিলেছিল গান্ধীবাদের অন্তর্গূঢ় আধ্যাত্মিকতা। তারাশঙ্করের এই অধ্যাত্মচেতনা বস্তুত তাঁর সনাতন ভারতচেতনা—ভারতীয় ঐতিহ্যের মর্মলোকে প্রবেশের এক পরোক্ষ ফলশ্রুতি। ভারতীয় ঐতিহ্য-সঞ্জাত এই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে স্নাত হয়ে তাঁর জীবননিষ্ঠ ভাবাদর্শগুলি বিশিষ্ট তাৎপর্য পেয়েছে। যেমন স্বদেশ তাঁর দৃষ্টিতে 'দেবতা'—ধাত্রীদেবতা। এই গ্রামভিত্তিক দেশের বিপুল জীবন-প্রবাহ তাঁর কাছে নিছক স্থূল 'গণশক্তি' নয়—'গণদেবতা'।

এই অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসায় লেখক প্রথম উদ্বেজিত হ'ন বোধহয় 'সন্ধ্যামণি' (ছলনাময়ী) গল্পের শ্মশান-ঘাটের স্তব্ধতায়। মৃত্যুর মধ্যে সেই গূঢ় গহন প্রশ্নের জন্ম; এবং পরে তা' ক্রমশ তাঁর শিল্পসত্তাকে অধিকার করেছে। 'আরোগ্য নিকেতন', 'সপ্তপদী', 'বিচারক' কিংবা 'যোগভ্রষ্টা'-এর নাম এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসাবে স্মরণ করা যেতে পারে। বস্তুত পরিণত পর্বের উপন্যাসে এই অধ্যাত্ম-অভীপ্সা, মৃত্যু-রহস্য জিজ্ঞাসা (আরোগ্য নিকেতন) কিংবা উদার বৈরাগ্য-চেতনা (সপ্তপদী) এক বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্কেত জানায়। সে সঙ্কেত তারাশঙ্করের উপন্যাসের তথা জীবনবোধের এক মহৎ বলয়িত পূর্ণতার—একটি জীবনবৃত্তের শান্ত সুস্থির সমাপ্তির।

আসলে তারাশঙ্করের উপন্যাসে সেইসব প্রবণতা বা উপকরণগুলিই শিল্প-অবয়বের সার্থকতা পেয়েছে, যেগুলি একান্তভাবে তাঁর অভিজ্ঞতা-লব্ধ। সেই অভিজ্ঞতা নানা ধরনের। তা একদিকে যেমন সামন্ত জীবনের বা প্রবল জৈবসংস্কারের কিংবা গণজীবনের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার, আবার অন্যদিকে তেমনি অন্তর্মুখী আত্মজিজ্ঞাসার—জীবনমৃত্যুর রহস্য-সন্ধানী গূঢ় অধ্যাত্মপিপাসার। আর এই অভিজ্ঞতার পরিধির বাইরে যখনই তারাশঙ্কর উপন্যাসের উপাদান খুঁজতে গেছেন তখনই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে শেষ পর্বের অনেক উপন্যাসের কথা, যেখানে তিনি

নাগরিক পরিবেশে মধ্যবিত্ত চরিত্র খুঁজতে গেছেন। তারাশঙ্কর এই পরিবেশ বা এ ধরনের নরনারীকে দেখেননি এমন হতেই পারে না। তবু এসব তাঁর মানস-পরিধির বাইরে। লেখকের শিল্পিসত্তা যা নিজে থেকে গ্রহণ করতে বা অনুভব করতে পারে, যার সঙ্গে সেই সত্তার অন্তরের সহজ যোগ—সেই পরিবেশ বা চরিত্র লেখকের খাঁটি শিল্পগত অভিজ্ঞতা। ইংরেজ সমালোচক লিডেল-এর সেই সুপরিচিত মন্তব্যটি প্রসঙ্গত স্মরণীয়—

'What is important to an artist, is not his experience but his range'.

আধুনিক মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন তারাশঙ্করের শিল্পিসত্তার এই 'range'-এর বাইরে। অথচ মধ্যবিত্ত জীবনের নাটকীয় দ্বন্দ্ব-জটিল ও চমকপ্রদ ঘটনা-বহুল উপন্যাস লেখার তাগিদে গ্রামজীবনের এই মহান্ কথাকোবিদ নিজের সীমার বাইরে পা বাড়িয়েছেন। বলা বাহুল্য, সেখানে তাঁর চলা সহজ স্বাভাবিক হয় নি। কৃত্রিমতার চিহ্ন এইসব দুর্বল রচনায় করুণভাবে পরিস্ফুট। আগেই বলেছি, এই পর্বের উপন্যাসের মধ্যে কেবল যেগুলিতে অধ্যাত্ম-পিপাসা বা ঐকান্তিক আত্মজিজ্ঞাসার অভিজ্ঞতালব্ধ শক্ত বনিয়াদ আছে, সেগুলিই, যেমন, 'সপ্তপদী' কিংবা 'বিচারক' অপেক্ষাকৃত সার্থক।

৭

বর্তমান প্রবন্ধের সূত্রপাত করেছিলাম যে প্রশ্ন নিয়ে, সেখানেই আবার ফিরে আসি। তারাশঙ্করের উপন্যাসে যে নানামুখী প্রবণতা, তাদের মধ্য দিয়ে লেখকের জীবনদৃষ্টির মূল স্বরূপের কিছু আভাস ফুটে ওঠে কিনা, তাঁর সৃষ্টি-প্রবাহের বিচিত্র তরঙ্গের অন্তর্লীন কোন ঐক্য-সূত্র আছে কিনা—এটাই ছিল প্রশ্ন। বস্তুত আর্টিষ্টের জীবনদৃষ্টির কোন গাণিতিক নির্দিষ্টতা থাকে না। তারাশঙ্করেরও সে রকম ছিল না। আসলে তারাশঙ্করের জীবনদৃষ্টির স্বরূপ তাঁর নিজের দেশ-কালের অনিবার্য টানেই গড়ে উঠেছিল। তাঁর সমকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে যে নেতিমূলক সংশয়ী জীবনবোধের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, তারাশঙ্করের চেতনায় সেখানে দেখা দিল কতকগুলি ঐতিহ্যনিষ্ঠ সুস্থ সহজ মূল্যবোধ। বিশাল গণজীবন বা আদিম জীবনের নানামুখী পিপাসা বা আদর্শবোধের কষ্টিপাথরে সেই মূল্যবোধগুলি বার বার তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন। আর তারই ভিতর দিয়ে তারাশঙ্কর খুঁজে

বেড়িয়েছেন মানুষের জীবনের গূঢ় রহস্যের উত্তর। শেষ পর্যন্ত সেই রহস্যের সঙ্কেত গিয়ে স্পর্শ করেছে লোকোত্তর জীবনের অধ্যাত্ম-চেতনাকে। উপন্যাসের নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্করের জীবনদৃষ্টি এই ধারা অনুসরণ করেই বিবর্তিত, বিকশিত হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গত আরেকটি কথা বলে বক্তব্য শেষ করি। বর্তমান নিবন্ধে তারাশঙ্করের জীবনদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের জন্য আমরা তাঁর ছোটগল্পগুলিকে একরকম বাদ দিয়ে কেবল তাঁর উপন্যাসগুলিকেই অবলম্বন করেছি। আমরা অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করি যে, শিল্পগত সংহতির দিক্ থেকে তাঁর উপন্যাসের চেয়ে বেশির ভাগ ছোটগল্পই সার্থকতর। সে হিসাবে হয়তো ছোটগল্পও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারতো। কথাটি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু তবু বলবো, তারাশঙ্করের প্রতিভা বা প্রবণতা মূলত ছোটগল্পকারের নয়, তা ঔপন্যাসিকের। তাঁর জীবনগত অভিজ্ঞতার যে বিস্তার, আপন দেশ-কালের যে পরিব্যাপ্ত চেতনা ও ঐতিহ্যের আলোয় তিনি স্বদেশের সমাজ রাজনীতি ও নূতন-পুরাতনের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে গণচেতনার অভ্যুত্থান ও ক্রমবিবর্তনকে উপলব্ধি করেন এবং সমকালের যুদ্ধোত্তর সংশয় ও অবক্ষয়ের পটভূমিতে জীবন সম্পর্কে তাঁর যে গভীর 'অস্তিবাদী' প্রত্যয়—জীবনের সেই বিশাল প্রেক্ষাপট, সেই ঐতিহাসিক ব্যাপ্তি ও গভীর জীবনপ্রত্যয়কে সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত করতে যথার্থ মাধ্যম ছোটগল্প নয়, উপন্যাস—বৃহৎ 'ক্রনিক্‌ল'ধর্মী উপন্যাস। 'রিজিওন্যাল' ও 'পিরিয়ড' নভেল-এর সংকীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে যে 'ক্রনিক্‌ল'-এর আবেদন সামগ্রিক ও চিরায়ত, প্রকরণগত শিথিলতা সত্ত্বেও যে ধরনের বিপুলায়ত সৃষ্টির সংবেদন অনিবার্য—তারাশঙ্করের শিল্পস্বভাবের মৌল প্রবণতা সেই মহৎ উপন্যাস রচনার দিকেই। প্রবণতা ও প্রয়াসের এই সমুন্নত মহিমায় তারাশঙ্কর একালের বাংলা উপন্যাসের অদ্বিতীয় স্রষ্টা সন্দেহ নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ জীবনরহস্য-চেতনার রূপকার

(বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টি-নির্ভর বাস্তবতার তন্নিষ্ঠ শিল্পীরূপেই বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিষ্ঠা।) 'আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞানের ছাত্র' বলেই কেবল নয়, তাঁর মননে প্রত্যয়ে এক কথায় তাঁর সমগ্র সত্তায় বৈজ্ঞানিক বিচারসহ বাস্তবতার চেতনা বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছিল সন্দেহ নেই। তাই অল্পবয়স থেকেই তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ জিজ্ঞাসু মন খুঁজতো পূর্বসূরিদের সাহিত্যে বিশেষত গল্প-উপন্যাসে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। আর সেখানে তা না পেয়ে তাঁর বিক্ষুব্ধ শিল্পিসত্তা মনে মনে প্রবল প্রতিবাদ করেছে সমকালীন সাহিত্যের বিরুদ্ধে। আর সেই থেকে এই ধারণাই স্পষ্ট জোরালো হয়ে উঠেছে তাঁর মনে যে, 'বিজ্ঞান-প্রভাবিত মন উপন্যাস লেখার জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন।' [লেখকের কথা, পৃঃ ৫৯]

কিন্তু এটাই তাঁর চূড়ান্ত কথা নয়। এই বিজ্ঞানমনস্ক লেখক সাহিত্যে বিজ্ঞান দৃষ্টি-সম্ভব বাস্তবতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে নিশ্চিত স্বীকৃতি দিয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মনে আরেক বিচিত্র অনুভবের উদ্ভাসন দেখা দিয়েছে। (তিনি বলেছেন ঃ 'উপন্যাসেও·· কল্পনা পার হয়ে যেতে পারে বাস্তবতার সীমা, গড়ে উঠতে পারে এমন এক মানস জগৎ যার অস্তিত্ব লেখকের মন ছাড়া কোথাও নেই'।) [লেখকের কথা, পৃঃ ৬২]

এই গভীর জীবনচেতনা যা' জীবন-রহস্যবোধেরই নামান্তর, তা সাধারণ-ভাবে আর্টিস্টমাত্রেই অবলম্বন বা অন্বিষ্ট, কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে একথা আরও বিশেষ অর্থে সত্য। সব সৃজনশীল শিল্পি-লেখকই তো তাঁদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জীবনের অনুদ্‌ঘাটিত তাৎপর্য ও রহস্য অন্বেষণ করেন। কিন্তু শুধু সেই সাধারণ অর্থেই নয়। (মানিকের এই জীবনচেতনা সত্যই জীবনের প্রচ্ছন্ন ও আলোছায়ায় অনতিস্পষ্ট রহস্যলোকের সৌন্দর্য ও সঙ্কেতকে নিবিড়ভাবে অনুভব করতে চেয়েছে।) একে এক অর্থে রোম্যান্টিক কবিদৃষ্টি নিঃসংশয়ে বলা চলে। কিন্তু তিনি কথাসাহিত্যে যখন এই অনুভব-রহস্যকে প্রকাশ করেন, তখন তাকে মানুষের জীবনের বাস্তব প্রতিষ্ঠাভূমিতে বিন্যস্ত

করেই প্রকাশ করেন। (বলতে পারি, এই জীবনরহস্য-চেতনা ও বিজ্ঞাননিষ্ঠ বাস্তবতাবোধের সমন্বয়সাধন বা সম্পর্ক-নির্ধারণের প্রয়াসেই যেন সারাজীবন আত্মনিয়োগ করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।) এই দুই প্রবণতা—জীবনের বাস্তবতা ও জীবনের রহস্য, তাঁর কাছে এ দু'টি আদৌ কোন বিপ্রতীপ উপলব্ধি ছিল কিনা তা প্রসঙ্গত পরে বিবেচ্য। কিন্তু এখানে এটুকু নিশ্চয় বলতে পারি যে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কখনও দেখি—জীবনের বিচিত্র বাস্তব উপকরণ ও অভিজ্ঞতা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এক আশ্চর্য রহস্যচেতনা, আবার কোথাও বা, রহস্য-অনুভবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে জীবনের কঠিন বাস্তবতা।

জীবনের এই দ্বিমুখী প্রকাশের দ্বৈততা থেকে তাঁর শিল্পিসত্তায় দেখা দিয়েছিল এক ধরণের ভাবসংঘাত বা ভাবসঙ্কট যার উদ্ভব একেবারে প্রথম যৌবন থেকেই, এবং যার ফলে কখনও তাঁর সৃষ্টি নানামুখী স্রোতের টানে গভীরসঞ্চারী হয়েছে, আবার কখনও বা (বিশেষভাবে, শেষ পর্যায়ের অনেক রচনায়) তাঁর শিল্প-সঙ্গতি বিপরীত প্রবণতার ঘূর্ণিবেগে বিপর্যস্ত হয়েছে অনেকখানি।

এই সব নানান ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যকে উপস্থাপিত করতে চাই। আর তারই মধ্যদিয়ে বিশেষভাবে বুঝে নিতে চাই, তাঁর কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত জীবনের বাস্তবতা ও জীবনের রহস্যচেতনার বিচিত্র সম্পর্কের রূপটিকে।

২

"ছেলেবেলা থেকে 'কেন?' নামক মানসিক রোগে ভুগছি, ছোট বড় সব বিষয়ের মর্মভেদ করার অদম্য আগ্রহ যে রোগের প্রধান লক্ষণ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানা চাই।"—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিসত্তায় বৈজ্ঞানিক চেতনার আবির্ভাবের মূলে ছিল এই প্রখর জিজ্ঞাসু মন। ('সব বিষয়ের মর্মভেদ করার', খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব জানার এই আবাল্য দুর্মর পিপাসা থেকেই ক্রমে জন্ম নিল তাঁর বিজ্ঞাননিষ্ঠ মন। বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনের একটি ধর্ম হলো ভাবপ্রবণতা বা ব্যক্তিগত আবেগ বর্জন করে বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে বস্তু বা ব্যক্তির যথার্থ রূপের সন্ধান করা।) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অল্প বয়স থেকেই এ'ধরণের 'সন্ধানে'র সংকল্প নিয়েছেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে কলেজে ভর্তি হয়েছেন। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের নানান্ জটিল সমস্যা এই তরুণ

ছাত্রের মনে ভিড় করে এসেছে সারাক্ষণ। আর এর-ই মধ্যে থেকে তাঁর গূঢ় সত্তায় সঙ্কেত জেগেছে এক রহস্যময় জগতের।

"ক্লাসে বসে মুগ্ধ হয়ে লেকচার শুনি, লেবরেটারীতে মশগুল হয়ে এক্স্‌পেরিমেণ্ট করি; নতুন এক রহস্যময় জগতের হাজার সঙ্কেত মনের মধ্যে ঝিকমিকিয়ে যায়।" [গল্প লেখার গল্প—লেখকের কথা পৃঃ ১]

অর্থাৎ মানিকের কাছে বিজ্ঞান কেবল ছাত্রপাঠ্য বিষয় নয়, তাকে তিনি জগৎ ও জীবনের তথা জীবন-দৃষ্টির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে রেখে দেখছেন, ভাবছেন। আর তাই বিজ্ঞান-দৃষ্টি তাঁর কাছে কোন খণ্ডিত দৃষ্টি নয়, তা' জীবনের সমগ্র রূপ-উপলব্ধিরই এক উপায় বিশেষ। আর এর ফলেই মানিকের কবিজনোচিত রোম্যাণ্টিক দৃষ্টি এবং বস্তু বা ব্যক্তির যথার্থ রূপসন্ধানী বিজ্ঞান-নির্ভর দৃষ্টির মধ্যে বিরোধের পরিবর্তে এক অচ্ছেদ্য সমন্বয় সাধিত হয়, এদের এক সমবায়ী রূপ ক্রমেই ফুটে ওঠে তাঁর শিল্পিসত্তাতে-ও।

বস্তুত বিজ্ঞানের এই যথার্থ রূপ-সন্ধান-প্রবণতার সঙ্গেই মিশে আছে রহস্যচেতনা। সেই প্রবণতা নিয়ে ব্যক্তি বা বস্তুর প্রকৃত রূপের অন্বেষণে অগ্রসর হয়ে তার অন্তর্লোকের গভীরে এসে অনুপ্রবিষ্ট হলেই চোখে পড়ে তার নানা অজ্ঞাতপূর্ব রহস্যময় রূপ। আর শিল্পীর বিস্ময়মুগ্ধ রোম্যাণ্টিক কল্পনা-দৃষ্টির স্পর্শে সেই রহস্যময়তাই ঋদ্ধ হয়ে ওঠে অনুপম সৌন্দর্যে। আর নিপুণ কথাশিল্পী তাকেই যখন জীবনের বাস্তবভূমিতে বিন্যস্ত করেন, তখন তা যথার্থ-ই উপন্যাস ও গল্পের শিল্পসামগ্রীরূপে প্রকাশ পায়। তখন তাকে আর আলাদাভাবে বিজ্ঞান-দৃষ্টিসম্ভব বলে মনে হয় না।

৩.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে জীবনরহস্য চেতনার যে প্রকাশ, তার বিভিন্ন উৎস বা উপকরণের সব ক'টিই হয়তো বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট নয়, কিন্তু এগুলি যখন তাঁর রচনায় শিল্পিত রূপ পেয়েছে, তখন এদের সম্পর্কে এই বিজ্ঞান-মনস্ক লেখকের প্রখর বাস্তব দৃষ্টি প্রায় সর্বদাই সজাগ থেকেছে। সার্থক রচনাগুলিতে বাস্তবের প্রেক্ষাপটেই এইসব বিচিত্র জীবনবোধের রহস্যময় দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়েছে।

এবারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে জীবনরহস্য-চেতনার উপকরণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত শ্রেণী-পরিচয় তুলে ধরা যেতে পারে।—

ক. মৃত্যু

খ. ধর্ম ও অতিলৌকিক শক্তি

গ. প্রেমযৌনতা ও আধুনিক মানুষের জটিল অন্তর্লোক

ঘ. রোম্যান্টিক স্বপ্ন-আদর্শ

পূর্বোক্ত উপকরণগুলিকে আশ্রয় করে জীবনরহস্য-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে বিশেষভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ের কথাসাহিত্যে। প্রথম পর্যায় অর্থে মোটামুটিভাবে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী প্রাক্-মার্ক্সিষ্ট যুগ। এই পর্যায়ে রোম্যান্টিক বিস্ময়প্রবণ মনের দর্পণে উপরি-উক্ত উপকরণগুলির প্রতিফলন গভীর রহস্যময় হয়ে ফুটে উঠেছে। প্রসঙ্গত বলা চলে যে, এই রহস্যচেতনা সৃষ্টির জন্য মানিক উপন্যাসে কথন-রীতির ক্ষেত্রে যে বিশেষ এক পদ্ধতি আশ্রয় করেছেন, তা অত্যন্ত কার্যকর হয়েছে। সেটি হ'ল—নায়কের দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনা ও অন্যান্য চরিত্রকে দেখা। প্রথম পর্যায়ের প্রধান তিনটি উপন্যাসেই এই রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। দিবারাত্রির কাব্য, পুতুল-নাচের ইতিকথা ও পদ্মানদীর মাঝি—এই তিনটি উপন্যাস আপাতদৃষ্টিতে প্রথম পুরুষের প্রচলিত দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। কিন্তু আসলে কোথাও লেখক সর্বজ্ঞ ন'ন। তিনটি উপন্যাসেই নায়কের সীমিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত রহস্যচেতনা প্রত্যয়সিদ্ধ হতে পেরেছে। তাদের দৃষ্টিকোণের সীমাবদ্ধতাই তাদের চোখে রহস্যময়তার মায়াঞ্জন বুলিয়ে দিয়েছে। দিবারাত্রির কাব্যে সুপ্রিয়া, আনন্দ, আনন্দের বাবা ও মা এদের জীবন ও চরিত্র, এদের অচরিতার্থ পিপাসা, ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা, বিড়ম্বিত বর্তমান সবই হেরম্বের মনের আয়নায়, প্রতিফলিত হয়েছে। অনুরূপভাবে 'পুতুল-নাচের ইতিকথা'-র কুসুমের কাহিনী, বিন্দু-নন্দলাল, সেনদিদি-গোপাল-যাদব পণ্ডিত কিংবা আংশিকভাবে কুমুদ-মতির কাহিনী সবই নায়ক শশীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত হয়েছে। এই বিশেষ একজনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে পূর্বোক্ত আখ্যান বা চরিত্র সমূহের বহিরঙ্গ বাস্তব প্রচ্ছদের মধ্য দিয়ে এদের অন্তরালবর্তী রূপক-আভাস বা জীবনের বিচিত্র রহস্য-সঙ্কেত ফুটে উঠেছে যেন—জীবন-মৃত্যু, যৌনতা ও প্রেম, আধুনিক মানুষের অনিকেত শূন্যতাবোধ ও নিঃসঙ্গতার রহস্য সঙ্কেত। 'পদ্মানদীর মাঝি'-র কুবেরের দৃষ্টির দর্পণেও কপিলা, হোসেন মিঞা ও মধ্যসমুদ্রের ময়নাদ্বীপ সবই কিছুটা রহস্যময়রূপে প্রতিবিম্বিত।

৪

সাধারণভাবে বাংলা-উপন্যাসে মৃত্যু সম্পর্কে পূর্বসূরি লেখকদের যে দৃষ্টিভঙ্গি, তা' থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসে প্রযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র। (বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মৃত্যুর প্রসঙ্গ নানাভাবেই এসেছে, কিন্তু প্রায় সর্বত্রই তা দেখা দিয়েছে উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার জীবনের সমাধানের উপায় হিসাবে। দুর্গেশনন্দিনী থেকে শুরু করে প্রায় সর্বত্র-ই এই গ্রন্থিমোচনের ভূমিকা মৃত্যুর। সেখানে জীবনরহস্যের কোন 'মায়াবী বাতায়ন' মুক্ত করে দেয়নি মৃত্যু। মৃত্যুর করুণ কিংবা নিষ্ঠুর ছবি নিপুণ শিল্পসৌন্দর্যে ফুটিয়ে তুলেছেন সব শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীই—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মৃত্যুর রোম্যান্টিক রহস্যময় রূপ দেখেছি, কিন্তু জীবনের বাস্তব প্রেক্ষিতে, সাধারণ নর-নারীর প্রাত্যহিক পরিচিত জীবনের পটে মৃত্যুর আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের চোখে তেমন রহস্যদ্যুতি ছড়ায়নি। তার তুলনায় মানিকের প্রথম দিকের উপন্যাসে মৃত্যু অনেক বেশি রহস্যময় তাৎপর্যে পূর্ণ। এমন যে হতে পেরেছে তার একটি কারণ হ'ল,—এই সব মৃত্যুকে দেখানো হয়েছে অন্তর্মুখী নিঃসঙ্গ স্বভাবের নায়কের দৃষ্টিবিন্দু থেকে। 'সাব্‌জেকটিভ্‌' জীবনদৃষ্টির আলোছায়ায় অংশত প্রচ্ছন্ন এই চেতনা-ভূমিতে যখন মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ফুটে ওঠে, তখন স্বভাবতই তা নিছক 'করুণ,' 'নিষ্ঠুর' বা ওই ধরণের কোন সুনির্দিষ্ট হৃদয়াবেগের অভিধায় চিহ্নিত হয় না, বরং তার চারদিকে জীবনের অজানা গূঢ় রহস্যের ঢেউ ফেনিয়ে ওঠে।

('দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসে দু'টি মৃত্যুই বিবৃত হয়েছে নায়ক হেরম্বের জীবন ও দৃষ্টিকোণকে আশ্রয় করে।) হেরম্বের মতো নিঃসঙ্গ অন্তর্মুখী মানুষ, আধুনিককালের দ্বিধা ও সংশয় যার অস্তিত্বের নিত্যসঙ্গী—তার জীবনে দুটি মৃত্যুই বস্তুত আত্মহনন হিসাবে দেখানো হয়েছে। একটি, স্ত্রীর আকস্মিক আত্মহত্যা ও অন্যটি, প্রেমিকা 'আনন্দে'র নৃত্যরত অবস্থায় চিতায় আত্ম-বিসর্জন। হেরম্বের মনের আলো-আঁধারি দর্পণে প্রতিফলিত এই দুটি আত্ম-হননের ছবিই পাঠকের কাছে জীবনের অতলান্ত রহস্যময়তার সঙ্কেত বয়ে এনেছে। রূপাইকুড়া নামে অনেক দূরের এক গ্রামের অর্ধ-পরিচিত অর্ধ-বাস্তব পরিবেশে উত্থাপিত হেরম্বের স্ত্রীর মৃত্যুর প্রসঙ্গ স্মৃতির আলোয় রহস্যময় হয়ে উঠেছে। মৃত্যুকে ঘিরে এই রহস্য নিবিড়তর হয়েছে অন্তিম নৃত্যের

ছন্দে কিশোরী আনন্দের আত্মহননে। আনন্দের এই মৃত্যুর নেপথ্যে তার জনক-জননীর অসুস্থ সম্পর্ক পারিবারিক জীবন ঘিরে চূড়ান্ত হতাশা কিংবা প্রেম সম্পর্কে এক অতি-রোম্যান্টিক ভাববাদী দৃষ্টি ঠিক কী নিহিত ছিল, তা উন্মোচিত হ'ল না,—সব মিলিয়ে শুধু এক রহস্য চেতনার সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনায় মেদুর হয়ে রইল উপন্যাসের অন্ত্যপর্ব।

পরবর্তী উপন্যাস, 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র প্রতিবেশ-পটভূমি 'দিবারাত্রির কাব্যে'র চেয়ে অনেকটা বাস্তব। সেখানকার নরনারীর চরিত্রকে নিছক 'রূপক কাহিনী'তে বর্ণিত ('মানুষের এক টুক্‌রো মানসিক অংশ') বলে নিশ্চয় মনে হয় না। গাওদিয়া গ্রামের মানুষগুলো কেবল মনোজগতের অধিবাসী নয়, তাদের বাস্তব ব্যবহারিক সত্তাও যথেষ্ট পরিস্ফুট। 'কিন্তু তবু বলবো, ওই গাওদিয়া গ্রাম শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের গ্রাম নয়, এমনকি 'পথের পাঁচালী'র নিশ্চিন্দিপুর-ও নয়। আমাদের গ্রাম-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বা ধারণার সঙ্গে এই সব গ্রামের ছবি বা 'ইম্প্রেশন' অনেকখানি মেলে, এরা আমাদের খুব চেনা পৃথিবীর অংশবিশেষ। কিন্তু গাওদিয়া ঠিক তা' নয়। উপন্যাসটির একেবারে গোড়া থেকেই সেই ভিন্নতর 'পারসপেক্‌টিভের' স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সেটি এসেছে মৃত্যুর রহস্য চেতনার পথ দিয়ে। উপন্যাসের একেবারে আরম্ভেই যখন একজন মানুষ নির্জন গ্রামপ্রান্তে খালের ধারে বজ্রাহত হয়ে হঠাৎ মারা যায়—সেই মুহূর্তে'ই ওই গ্রাম ও গ্রামীণ জীবনের সমগ্র পরিমণ্ডল এক রহস্যময় নিয়তির অন্ধ ক্রূর শক্তির খেলার সামগ্রীরূপে দেখা দেয়। তারপর একটু একটু করে যতই ওই গ্রাম্য জীবনের কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করি, ততই অনুভব করি যে, গাওদিয়া'র মানুষগুলি যেন ঠিক বাস্তবতার খর আলোয় যথেষ্ট উজ্জ্বল নয়, সবাই যেন কী এক রহস্যময়তায় কিছুটা অনতিস্পষ্ট, দূর-বিসর্পিত। এই রহস্যময়তার অন্যতম কারণ, মানুষের জীবনকে ঘিরে নিয়তির রহস্যলীলা, এক কথায়, জীবনের অসহায় অনিশ্চয়তা, আর সেই সঙ্গে নরনারীর অস্তিত্বকে ঘিরে মৃত্যুর নিঃশব্দ পদসঞ্চার। জীবনকে ঘিরে মৃত্যুর যে রহস্যময় সঞ্চরণ, তাকে প্রত্যক্ষ করেছে এই উপন্যাসের নায়ক শশী। শশী ডাক্তার। চিকিৎসক নায়কের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে জীবন-মৃত্যুর রহস্যচেতনা বেশি ফুটেছে যেন। মৃত্যুর শীতল স্পর্শ, আর জীবনতৃষ্ণার নিবিড় উত্তাপ—এ যেন একের পর এক ঘুরে ঘুরে এসেছে শশীর জীবনপটে। এই জীবন আর মৃত্যু, আলো আর ছায়ার জাফরি-কাটা

অভিজ্ঞতার আবর্তিত লীলারূপ উপন্যাসটিতে বাস্তবতা ও রহস্যচেতনার এক অপরূপ নক্সা রচনা করেছে। গ্রাম-প্রান্তে খালধারে হারাণের মৃত্যু থেকে শুরু করে শশী ডাক্তারের জীবনে আরো কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে: বাসুদেবের বালক পুত্র, বৃদ্ধ যাদব পণ্ডিত ও তাঁর সহধর্মিণী এবং যামিনী কবিরাজের স্ত্রী সেনদিদির মৃত্যু। শশীর সারা জীবনটাই যেন একদিকে এই সব মৃত্যুর বিচিত্র অভিজ্ঞতালাভ ও অন্য দিকে আবার মৃত্যুর বিরুদ্ধেই জীবনের জীবন-পিপাসার আশ্চর্য সংগ্রামের কাহিনী। উপন্যাসটিতে তাই চোখে পড়ে মৃত্যু-কাহিনীর পাশাপাশি বসন্ত রোগাক্রান্ত সেনদিদিকে প্রায়-নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য শশীর প্রাণপণ সংগ্রাম কিংবা মত্ত মুমূর্ষু বিন্দুকে রক্ষা করার জন্য শশীর কঠিন প্রয়াসের ছবি। এইসব অভিজ্ঞতা-ই শশীর মনে জীবনের বিস্ময়কর রহস্য-তাৎপর্য বহন করে এনেছে। আর তাই কোন মৃত্যুই শশীকে একেবারে আচ্ছন্ন, অসাড় করতে পারেনি, সে বারবার মৃত্যুর অভিজ্ঞতায় স্নান করে উঠে এসেছে জীবনের তীরভূমিতে। জীবনের প্রতি তার পিপাসা অনিঃশেষ।

কিন্তু কেবল একটি মৃত্যুই তার জীবনকে বিপর্যস্ত করে গেছে। সেটি দৈহিক মৃত্যু নয়। সে মৃত্যু প্রেমের—কুসুমের প্রেমের। শশীর জন্য যে প্রেমকে কুসুম দীর্ঘকাল ধরে ("অনেকগুলি সুদীর্ঘ বৎসর") মনে মনে লালন করে এসেছে পরম আগ্রহে, নিবিড় আকাঙ্ক্ষায়, শশীর কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে তা ক্রমেই শুকিয়ে প্রাণহীন হয়ে গেছে। কুসুম শশীকে বলেছে, "কাকে ডাকছেন ছোটবাবু কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।"—

জীবনের মধ্যেই আত্মিক মৃত্যুর এই অপরূপ লীলারহস্য ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক আশ্চর্য নৈপুণ্যে। উপন্যাসের একেবারে শেষে এইসব মৃত্যুর স্মৃতি-চিহ্নগুলি শশীর চোখে পড়ে, মনে পড়ে। বজ্রাহত বটগাছ, বিন্দুর ভঙ্গুর জীবন, যাদব পণ্ডিতের জীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ গৃহ, কুসুমের শূন্য বাড়ি—আর তার ওপাশে তার 'মৃত' প্রেমের স্মৃতিবহ তালবন—সবমিলিয়ে মৃত্যুর স্মৃতির নিষ্ঠুর-করুণ রহস্যে ঘেরা জীবনের ছায়াতল দিয়ে শশী পথ চলে।...

প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ের সাহিত্যে যে রহস্যময় মৃত্যু-চেতনার প্রতিফলন চোখে পড়ে, তার সঙ্গে তাঁর নিজের উত্তর-জীবনের মৃত্যুচেতনার ভীতি ও রহস্য-জনক অভিজ্ঞ-

তার কোথাও যেন একটা অলক্ষ্য অথচ নিয়তি-নির্দিষ্ট অনিবার্য যোগ ছিল। মানিক যখন তাঁর 'দিবারাত্রির কাব্যে' 'কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হেরম্বর নিজের স্ত্রীকে ঝুলিয়ে দেবার অতর্কিত স্মৃতি'র ছবি আঁকছেন, কিংবা 'পুতুল-নাচের ইতিকথা'য় বজ্রদগ্ধ হারু ঘোষের মূর্তির পাশাপাশি আরো কয়েকটি নিয়তি-নিহত নরনারীর মৃত্যু-শীতল অবয়ব বিন্যস্ত করেন, তখন কে জানতো এর অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যুর আতঙ্কজনক পদধ্বনি শুনতে হবে তাঁকে? আর তাঁর পক্ষে বাকী জীবনটাই হবে এক 'মৃত্যু-তাড়িত মানুষের' অসহায় জীবন? অনেকেই জ নেন এই ঘটনার কথা। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে, যখন সবে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি' লেখা শেষ হয়েছে, একদিন দুপুরে হঠাৎ মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে যান মানিক। সেই রোগ আর কোনদিন সারেনি। সারাজীবন ধরে বারবার ওই ভয়ঙ্কর রোগের শিকার হয়েছেন তিনি। আর সর্বক্ষণ এক অনিবার্য মৃত্যুচিন্তা ঘিরে রেখেছে তাঁর সত্তাকে। মাঝে মাঝে মনে হয়, তাঁর পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলিতে মৃত্যুরহস্যের যে ছবি ফুটে উঠেছে, তা' যেন তাঁর ব্যক্তিজীবনে লব্ধ উত্তরকালের মৃত্যু-চেতনারই পূর্বগামিনী ছায়া। তাঁর সূক্ষ্ম সংবেদনশীল শিল্পিসত্তায় এই ছায়ার প্রতিফলন ঘটেছে অনেক আগে থেকেই।

৫.

(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ের একাধিক গল্পে ও উপন্যাসে ধর্ম ও আশ্রম-জীবনের পরিবেশ ও তৎসংক্রান্ত কাহিনীর নিদর্শন মেলে। প্রথম-লেখা উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' থেকেই এই বিশেষ ক্ষেত্র সম্পর্কে মানিকের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়েছে। অবশ্য বলা বাহুল্য, ধর্ম বা সাধুদের জীবন যাত্রা বা আশ্রম পরিবেশ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব আদৌ তেমন সশ্রদ্ধ নয়। বরং তার বিপরীত-ই। (মানিকের সহজ বিজ্ঞানবোধ স্বাভাবিক কারণেই ধর্মের নামে ভণ্ডামি, কুসংস্কার, প্রথানুগত্য ইত্যাদিকে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যঙ্গে কটাক্ষে বিদ্ধ করেছে। উপন্যাসের মধ্যে 'দিবারাত্রির কাব্য', 'অহিংসা', 'তেইশ বছর আগে পরে' এবং 'সর্পিল', 'সাধু' (সমুদ্রের স্বাদ) ইত্যাদি গল্প এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন।)

কিন্তু প্রচলিত ধর্ম বা ধর্মসংক্রান্ত জীবনচর্যার প্রতি তাঁর মনে যত বিরূপ-

তাই থাক্, তবু এক অতিলৌকিক শক্তির প্রতি রহস্যময় আকর্ষণ ও সে সম্পর্কে রহস্য-গভীর উপলব্ধি তাঁর রচনায় নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, সন্দেহ নেই। ধর্মগুরুদের প্রতি ব্যঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপের মধ্যেও যেখানে এই রহস্যময় চেতনার আভাস আছে, সেরকম দু'একটি দৃষ্টান্ত দিই। 'অহিংসা' উপন্যাসে ধর্মব্যবসায়ে জড়িত নারীসম্ভোগ-লিপ্সু নাস্তিক সদানন্দের ক্ষণিক আত্মসমীক্ষায় এই চেতনার অনতিস্ফুট প্রকাশ চোখে পড়ে—

: 'অন্ধ আবেগের মত, অমর সংস্কারের মত, কেবল একটা কথা মনে জাগিতেছে, তবে কি সত্যই দেবতা কেউ আছেন অন্তরালে, মানুষ যাকে সৃষ্টি করে নাই, পাপ পুণ্য যাচাই-এর একটি করিয়া কষ্টিপাথর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দিয়া মানুষকে যিনি স্বাধীনতা দিয়াছেন কিন্তু বিচারের ক্ষমতাটি রাখিয়াছেন নিজের হাতে, অহরহ পাপ-পুণ্যের ওজন করিয়া মানুষকে যিনি শাস্তি আর পুরস্কার দিতেছেন ?' [অহিংসা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ]

'পুতুল নাচের ইতিকথায়' যে 'ধর্মান্ধতা' যাদব পণ্ডিতকে স্বেচ্ছামৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে, তাকে উপন্যাসের নায়ক শশী ব্যঙ্গদৃষ্টিতে দেখলেও সেই অদ্ভুত 'বিশ্বাসে'র মূল প্রেরণার রহস্য তার কাছে চিরদিনই অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

'পুতুল নাচের ইতিকথা'র আরো কোনো কোনো প্রসঙ্গ বিচার করলে দেখা যায় যে, বস্তুত ধর্ম নয়,—এক অলক্ষ্য অতিলৌকিক চেতনা বা শক্তির রহস্যানুভূতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সত্তাকে নানাভাবে স্পর্শ করে গেছে। হারু ঘোষের বাড়ীর অদূরে তালবনের ধারে মাটির টিলার উপর উঠে একদিন পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে শশীর মনে এক ধরণের অতীন্দ্রিয় রহস্যময় অনুভূতির ছোঁয়া লেগেছিল :

'সূর্য ডুবিবার আগে শশী ভীত হইয়া পড়িল।...শশীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, কয়েক মিনিটের ভবিষ্যৎ-ও তাহার অবশিষ্ট নাই, সে এমনি অসহায়, এমনি ভঙ্গুর। পৃথিবীর বহু উর্ধ্বে স্তরে স্তরে সাজানো ভয়ের তলে প্রোথিত পৃথিবীর উর্ধ্বে, একটা জঙ্গলাকীর্ণ মাটির টিলার শীর্ষে শশী হঠাৎ হারাইয়া গিয়াছে। সামনে রূপ-ধরা অনন্ত। সীমাহীন ধারণাতীত কী যে তাহার চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে শশী জানে না।' [মানিক গ্রন্থাবলী (৩য় খণ্ড), পৃঃ ৭৩]

শশী বিজ্ঞানের ছাত্র, শশী ডাক্তার। কিন্তু তবু শশী কেবল বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের সাহায্যে যেন জীবনকে সর্বতোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

তার চারপাশে যারা ছিল, সেই কুসুম, বিন্দু, মতির কল্যাণ করতে গিয়ে অনেক সময়েই সে যে ব্যর্থ হয়েছে এর মূলে শশী অনুভব করেছে নিয়তির মতো এক রহস্যময় অলক্ষ্য শক্তি। শশী ভাবে, 'যে বিষয়ে সে দায়িত্ব গ্রহণ করে তাই ভেস্তাইয়া যায়। একটা অদৃশ্য দুর্বার শক্তি যেন অহরহ তার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে।' [ঐ, পৃঃ ৯৯]

বলা বাহুল্য শশীর এই ধরণের উপলব্ধিরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই কুসুমের পিতা অনন্তের মুখের কথায় :

'সংসারে মানুষ চায় এক, হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তার বাবু। পুতুল বইতো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।'

[ঐ, পৃঃ]১৮৪

নানা চরিত্রের এই সব খণ্ড খণ্ড উপলব্ধি যে মূলত লেখকেরই সামগ্রিক চেতনার অংশ বিশেষ, তা উপন্যাসের তাৎপর্যপূর্ণ শিরোনাম 'পুতুল নাচের ইতিকথা' থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

উত্তরকালের গল্পে-উপন্যাসে, যেগুলি, বলতে পারি, তাঁর সৃষ্টিপর্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে রচিত, সেখানে এই রহস্যময় অতিলৌকিক চেতনার পরিচয় একেবারে নেই বললেই চলে। (এই পর্যায়ের কথাসাহিত্যে মানিক তাঁর বৈজ্ঞানিক চেতনালব্ধ সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট-সংগ্রামের বিশ্লেষণমূলক ইতিবৃত্ত রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন।) কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চিরদিনই এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। তাঁকে কখনই কোন বাঁধা-ধরা জীবনের ছকে সীমিত করে রাখা যায় না। তাই দেখতে পাই, জীবনের শেষ পর্বে ওই বৈজ্ঞানিক চেতনাশ্রিত বাস্তবমুখী সমাজবোধের পাশাপাশি আরেকটি স্রোত, এক রহস্যময় অতিলৌকিক চেতনার স্রোত তাঁর অন্তর্লোকের গভীরে আমৃত্যু বহমান ছিল, আর তার নিশ্চিত সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর ১৯৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দের লেখা ডায়েরি-র ('অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' গ্রন্থে প্রকাশিত) কয়েকটি পৃষ্ঠা।

ডায়েরিতে ব্যক্ত মানিকের এই অতিলৌকিক চেতনার দু'টি দিক। (ক) এক অজ্ঞাত রহস্যময় সত্তা সম্পর্কে গভীর কৌতূহল (খ) এক পরমা রহস্যময়ী দৈবীশক্তিতে (যাকে তিনি 'মা' বলে অভিহিত করেছেন) অচল বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ। পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে এই দুই ধরনের চেতনারই অল্প কিছু পৃষ্ঠা [illegible]

(ক) সৃষ্টি রহস্য, বিশ্বের মূলনীতি কোনদিনই জানা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে—যে এমন অনন্ত, সীমাহীন। কিন্তু সেটাই আশীর্বাদের মত। কারণ জেনে জেনে এগিয়ে যাওয়া কোনদিনই আমাদের শেষ হবে না।...আরও অনেক জগৎ আছে। চেতনায় তার সাড়া পেয়েছি। চেতনা দিয়ে চেতনার সীমাই শুধু জানা যায়—আরও কিছু আছে বিরাট ব্যাপার সেটা চেতনায় উপলব্ধি করা যায়—তার বেশী আর কিছু সম্ভব নয়। *** শক্তির কোটি কোটি...বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী প্রকৃত রূপ ছোট্ট পৃথিবীর মানুষ কোনদিন জানতে পারবে না কিন্তু জানার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে অবিরাম।

[অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩২-১৩৩]

(খ)

মাযের দয়া

দয়া চেযেছি, দয়া পেযেছি বহুবার।...মন্দির মনে এলে মাকে ডাকতাম, বলতাম—মন্দির নয় মা, ওই মন্দিরে মানুষ যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময়ী মায়ের পূজা করে সেই মাকেই প্রণাম করছি। মাযের দয়া চেয়ে কিভাবে অসহায নিরুপায় বিকারগ্রস্ত মৃতপ্রায় মানুষটা জীবন্ত হলাম—কত ছোট বড় অঘটন ঘটে গেল সহজভাবে সাধারণ নিয়মে—আমার কাছে যা আশ্চর্য, কল্পনাতীত যোগাযোগ—তারই যেটুকু খেয়াল হয়েছে, ধরতে পেরেছি, লিখে রাখছি। ...এ বিষয়ে ভাবতে হবে, তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে।

[ঐ, পৃঃ ১৮১-১৮২]

মানিকের এই অতিলৌকিক রহস্যচেতনাকে কেবল তাঁর জীবনব্যাপী দুরারোগ্য শারীরিক ব্যাধি-সম্ভূত এক 'মর্বিড্' ধরণের মানসিকতার প্রকাশ বলে বোধহয় লঘু করে দেখা সঙ্গত হ'বে না—কারণ আমরা দেখেছি যে, তাঁর মনের এই অতিলৌকিক রহস্যবোধ উক্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হ্বার আগে লেখা অন্তত একটি উপন্যাসে (পুতুল নাচের ইতিকথা) স্পষ্টতই আত্মপ্রকাশ করেছিল। আর তাই, খণ্ডিতভাবে নয়, কেবল জীবনের সমগ্রতার প্রেক্ষিতে রেখে মানিকের এই অতিলৌকিক রহস্যচেতনাকে যদি বিচার করা যায়, তবেই হয়তো তার প্রকৃত তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

৯.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পিসত্তার জীবনরহস্যের উপলব্ধি এসেছে নানা পথ বেয়ে—তা কখনও মৃত্যু, কখনও বা অতিলৌকিক অনুভূতি—

কিন্তু নিঃসন্দেহে (সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পথ হ'ল নরনারীর প্রেম-যৌনতা-নির্ভর জটিল অন্তর্লোকের পথ।) এই পথেই মানিক অনেক অজানা গূঢ় রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন, যার ফলে জীবন সম্পর্কে তাঁর সামগ্রিক বোধে প্রায় এক আমূল রূপান্তর ঘটতে চলেছিল। (আর তাই এই তাৎপর্যপূর্ণ তমোগহন পথে জীবনকে খোঁজার প্রয়াসে তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন এক পথিক সত্তা। তাঁর সৃষ্টির জগৎ তাই বিশেষভাবে নরনারীর যৌনরহস্য-চেতনার অজস্র কাহিনীতে পূর্ণ। আর এ'ধরণের কাহিনীর অফুরন্ত প্রাচুর্য (বিশেষত প্রথম পর্যায়ে) এবং এ বিষয়ে লেখকের অন্তহীন সজীব আগ্রহ দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বোধহয় যৌনরহস্য-ই জীবন-রহস্যের নামান্তর। মানিকের সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে প্রেম ও যৌনতার প্রায় একাকার রূপ চোখে পড়ে। সে সব ক্ষেত্রে নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণের মধ্যে লেখক কেবল যৌনতাকে মুখ্য ভূমিকা দিয়েছেন— যা বস্তুত দেহাশ্রিত জৈবচেতনা বিশেষ। কিন্তু প্রথম দিনের কিছু কিছু রচনায় প্রেমের রোম্যান্টিক মাধুর্য আত্মপ্রকাশ করেছে বলা চলে। একুশ বছর বয়সে লেখা 'দিবারাত্রির কাব্যে'র অংশ বিশেষে কিংবা অল্পবয়সে লেখা 'অতসীমামী' কিংবা 'নেকী' ইত্যাদি ছোটগল্পে প্রেম সম্পর্কে মানিকের রোম্যান্টিক কাব্যময় ধারণার পরিস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত শেষোক্ত দু'টি গল্পে মানিক তাঁর প্রথম যৌবনের প্রিয় লেখক শরৎচন্দ্রের রোম্যান্টিক প্রেম কাহিনীর দ্বারা সম্ভবত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলা চলে। এই সব কাহিনীর মধ্যে মানিকের জীবন-রহস্যবোধের তেমন কোন অভিনব প্রকাশ না ঘটলেও "দিবারাত্রির কাহিনী'র আনন্দ-উপাখ্যানের প্রেমচেতনা মৃত্যুচেতনার সঙ্গে মিলিত হয়ে কাহিনীটিতে যে একধরণের রহস্যময়তা এনে দিয়েছে, একথা আগেই বলেছি।

মনে রাখতে হবে, মানিক যখন সাহিত্যক্ষেত্রে পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করেননি, তাঁর সেই প্রথম যৌবনের দিনগুলিতে আমাদের সাহিত্যে 'কল্লোলে'র ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। আর সেই 'কল্লোলচেতনার' অন্যতম ভিত্তি ছিল ফ্রয়েড ও হ্যাভ্‌লক এলিস-পাঠের ফলে অর্জিত যৌনচেতনা, আর অনেকটা এর ফলেই তরুণ লেখকদের মধ্যে জেগে উঠল 'প্রেম সম্পর্কে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। মনের অবচেতন স্তরে যে 'দেহের রহস্যে বাঁধা' গূঢ় যৌন-কামনা, যা'র ওপর মানুষের সচেতন মনের নিয়ন্ত্রণ নেই, সেই সব রহস্যের প্রবৃত্তি

ও প্রবণতার মধ্যদিয়ে প্রেমকে তথা জীবনকে নূতন প্রেক্ষিতে রেখে 'নিরীক্ষণ করতে চাইলেন 'কল্লোল'-এর কালের তরুণ লেখকগোষ্ঠী।

এঁদেরই উত্তরসূরি মানিক কতকটা সেই পথ ধরেই অগ্রসর হলেন। কিন্তু অগ্রজদের তুলনায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক্। সে দৃষ্টি নিছক শিল্পীর নয়, তা অনেকটা সত্যসন্ধ বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণ শাণিত দৃষ্টি।

কলেজ-জীবনের গোড়াতেই বিজ্ঞান বিষয়ক নানাগ্রন্থের মধ্যে অন্যতম ছিল যৌন বিজ্ঞান তথা মনস্তত্ত্বমূলক রচনা।—'আমি ছিলাম বিজ্ঞানের ছাত্র এবং যেমন আগ্রহ নিয়ে বিজ্ঞান পড়তাম তেমনি আগ্রহ নিয়েই আরম্ভ করেছিলাম যৌনবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব আর বিশ্বসাহিত্য পড়া'।

[লেখকের কথা, পৃঃ ২৬]

বলাবাহুল্য, এই যৌনবিজ্ঞানমূলক গ্রন্থাদির মুখ্য রচয়িতা ফ্রয়েড। মানিক তাঁর ছাত্রাবস্থায় বিভিন্ন গ্রন্থপাঠের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলেছেন:

"হামসুনের 'হাঙ্গার' থেকে শুরু করে শ-র নাটক পর্যন্ত বিদেশী সাহিত্য এবং ফ্রয়েড প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছি।"

[লেখকের কথা, পৃঃ ১৯]

এইসব উক্তি থেকেই বোঝা যায় ছাত্রজীবন থেকেই ফ্রয়েড ও যৌনমনস্তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করেছেন মানিক এবং এর প্রভাব ক্রমশই পরিস্ফুট হতে থাকল তাঁর লেখক-জীবন শুরু করার অল্পদিনের মধ্যেই। 'কল্লোলপন্থী' লেখকদের মতো রোম্যান্টিক আবেগের আতিশয্য ছিল না তাঁর রচনায়—তাঁর যৌন-মনস্তত্ত্বমূলক রচনাও এই নিরুচ্ছ্বাস বিজ্ঞান-দৃষ্টির দ্বারা-ই মুখ্যত অনুপ্রাণিত হ'ল। এই ধরণের দৃষ্টির শাণিত শায়কে তিনি ছিন্ন করতে চাইলেন হৃদয়াবেগ সর্বস্ব প্রেমের আপাত-রোম্যান্টিক, আপাত-রহস্যময় আবরণ। ক্রমশ প্রবিষ্ট হ'লেন অবচেতনের স্তরে—কিন্তু সে আর এক রহস্যময় জগৎ। সেখানে মনের গভীরে আছে অচরিতার্থ কামনা-বাসনা ও নিরুদ্ধ ইচ্ছার অজস্র বিকৃত জটিল রূপ—যার উপর সচেতন মনের নিয়ন্ত্রণ নেই। এবং এই অবচেতনার দুর্মর প্রভাবেই মানুষের আচরণ সবসময় স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত নয়, প্রায়শ তা রহস্যময় অন্ধ অনির্দেশ্য শক্তির দ্বারা চালিত।

এইভাবেই, বিজ্ঞানমনস্ক তরুণ লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে বিশেষভাবে সঞ্চারিত হয়েছে যৌনতা-সঞ্জাত এক রহস্যময়তার চেতনা।

কিন্তু শুধু যৌনতা ও মনস্তত্ত্ববিষয়ক বিজ্ঞানগ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে মানিকের

মনে যৌনরহস্যের বোধ প্রগাঢ় হয়েছে, একথা বোধহয় ঠিক নয়। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি বিজ্ঞানের পাশাপাশি বিশ্বসাহিত্যের বিখ্যাত লেখকদের নানা গ্রন্থও পাঠ করতেন। এইসব লেখকদের মধ্যে অন্যতম ন্যুট হামসুন। মানিক তাঁর অল্পবয়সে পঠিত গ্রন্থের মধ্যে হামসুনের 'হাঙ্গার'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। হাঙ্গার-রচয়িতা হামসুনের জীবন-দৃষ্টির সঙ্গে মানিকের প্রথম পর্বের (প্রাক্-মার্ক্সিষ্ট) জীবনবোধের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজিতে অনূদিত হাঙ্গার-এর ভূমিকায় জর্জ এগারটন লিখেছেন: "Hamsun has proved himself a master at probing into the unexplored crannies in the human soul, the mysterious. territory of uncontrollable half-unconscious impulses"—লক্ষ্য করবার বিষয় এগারটনের মতে হামসুনের মধ্যে যে জীবনরহস্যের প্রকাশ, তার একটি মুখ্য অবলম্বন হ'ল মানুষের অবচেতনার দুর্দম প্রবৃত্তিসমূহ। বলাবাহুল্য, মানিকের রচনাতেও আমরা এই একই ধরণের উপকরণ-সঞ্জাত জীবনরহস্য-চেতনার প্রকাশ দেখতে পাই।

অবচেতনার যৌন প্রবৃত্তির প্রধান আশ্রয় দেহকামনা। মানিকের একেবারে গোড়াকার উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্যে'র রোম্যাণ্টিক প্রবণতার মধ্যেও এই দেহচেতনার আভাস ব্যঞ্জিত হয়েছে। কিশোরী আনন্দের প্রতি হেরম্বর রহস্যময় আকর্ষণের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল আনন্দ'র দেহজ সৌন্দর্য যা উপন্যাসের অন্তে নিজেকে অপ্রত্যাশিত নগ্নতায় অনাবৃত করে দিয়েছে। রোম্যাণ্টিক প্রেমের সঙ্গে দেহচেতনার এই গূঢ় অথচ অচ্ছেদ্য সম্পর্কের রহস্য-আভাস লেখক আবার দিয়েছেন 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় যেখানে পরাণের স্ত্রী কুসুম উপন্যাসের নায়ক শশীকে বলেছে:

'আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু।' আর শশী কুসুমের এই কথা শুনে ভাবছে—'শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?'

এইভাবেই মানিকের উপন্যাসে ক্রমেই দেহাশ্রিত যৌনচেতনা ও রোম্যাণ্টিক প্রেমের রহস্য মিশে একাকার হয়ে গিয়ে উপন্যাসে জীবনরহস্যের এক নূতন উদ্ভাসন ঘটিয়েছে। পরবর্তী উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'-র মতো লোকায়ত জীবনের কাহিনীতেও এই মিশ্ররূপের রহস্যটি আশ্চর্য নৈপুণ্যে ফুটে উঠেছে কুবের-কপিলার আখ্যানে। উপন্যাস থেকে এরকম দৃষ্টান্ত আরো অনেক

দেওয়া চলে। তবু এরই মধ্যে 'অহিংসা' উপন্যাসে যৌবনময়ী নারী মাধবীর জন্য প্রবীণ আশ্রমগুরু সদানন্দের তীব্র আসক্তি-র নিহিত রহস্য এবং 'চতুষ্কোণ'-এ (উপন্যাসটি 'মার্ক্সিষ্ট-পর্বে' লিখিত ও ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত— প্রসঙ্গত এই তথ্য তাৎপর্যপূর্ণ।) রাজকুমারের নারীর নগ্ন শরীর দর্শনের অদ্ভুত তীব্র আগ্রহের রহস্যচেতনা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বস্তুত এই দুটি কাহিনীর কোনটিই স্থূল রিরংসাবৃত্তির গল্প নয়, এর মধ্যে গল্পের নায়কদের তথা লেখকের জীবনরহস্যবোধের এক মৌল প্রকাশ ঘটেছে মনে হয়। 'কোন্ জীবনের উপযোগী এ দেহ, ভিতরের প্রকৃতির কোন্ পরিচয় আঁকা আছে এই দেহের বাইরে'—এই গূঢ় জিজ্ঞাসার উত্তর জানার জন্য রাজকুমার ব্যাকুল হয়ে এক বিচিত্র তির্যক পন্থা আশ্রয় করেছিল এইমাত্র। আসলে তার মধ্যে জীবন সম্পর্কে এক গূঢ় রহস্যচেতনাই সক্রিয়। আধুনিক নাগরিক জীবনে নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে যে অশান্তি ও অস্থিরতার জন্ম, রাজকুমার তারই প্রতিভূ। জীবন তার কাছে তাই নিরুত্তর রহস্যময়ী এক প্রহেলিকা।

'উপন্যাসের মতো ছোটগল্পে-ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যৌন—তথা অবচেতনা-স্তরের বিকৃত প্রেমচেতনার মধ্যদিয়ে জীবনের তামস রহস্যের অন্বেষণ করেছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'অতসীমামী'র অন্তর্গত সর্পিল, শিপ্রার অপমৃত্যু থেকে শুরু করে 'মিহি ও মোটা কাহিনী'র ছায়া, শৈলজশিলা, 'সরীসৃপ' গ্রন্থের মহাকালের জটার জট, বিষাক্তপ্রেম, সরীসৃপ গল্প এবং 'ভেজাল' এর প্রায় অধিকাংশ গল্পই এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। পূর্বোক্ত গল্পগুলিতে জীবনের যে রূপ ফুটেছে, তাতে দেখি প্রকাশ্যের চেয়ে প্রচ্ছন্নের ব্যঞ্জনা অনেক গভীর ; দেখি যে, মানুষের অনেক বহিরঙ্গ ক্রিয়া-কর্মের প্রেরণা আসে অবচেতনার এক 'দুর্বোধ কুটিলতার কুণ্ডলী' থেকে, 'আদিম ও মৌল মাটির অন্ধকার গর্ত থেকে'। প্রবণতার এই সাদৃশ্যের জন্যই অনেক মননশীল পাঠকই প্রথম পর্বের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ডি. এইচ. লরেন্সের জীবন-দৃষ্টির আংশিক মিল খুঁজে পেয়েছেন। সেই জীবনদৃষ্টির অধিকারী হবার ফলে দুজনেরই চোখে অনেকস্থলে যৌনরহস্য যেন জীবন রহস্যেরই নামান্তর রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

কিন্তু কথাকোবিদ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনরহস্যবোধ কেবল যৌনচেতনাকে আশ্রয় করেই প্রকাশ পেয়েছে তা' নয়, মানুষের মনোজীবনের

আরো অনেক অজানা অন্ধকার স্তরের গভীরে প্রবেশ করেছেন লেখক দুঃসাহসী অভিযাত্রীর মতো—আর সেই গভীর গোপন থেকে আরো নানান্ রহস্যময় উপকরণ তুলে এনেছেন। এ'ধরণের মনোরহস্যের ছবি মানিকের বিভিন্ন ছোটগল্পে ছড়িয়ে আছে—পোড়াকপালী (অতসীমামী), প্রকৃতি (প্রাগৈতিহাসিক) টিকটিকি, হাত, বিপত্নীক (মিহি ও মোটা কাহিনী), বিবেক (সমুদ্রের স্বাদ) এ ধরণের কয়েকটি কাহিনীর শিরোনাম। এরকম কোন কোন গল্পকে দাম্পত্য জীবনের কাহিনী বলে মনে হলেও, আসলে গল্পগুলির মৌলরহস্য নিহিত রয়েছে যৌনতায় নয়, অন্যত্র—অন্তর্লোকের অন্য কোন গভীর প্রকোষ্ঠে। 'বিপত্নীক' এরকম গল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই গল্পের নায়ক স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে, কিন্তু রাত্রে সুনিদ্রার পর প্রসন্ন মনে স্ত্রীকে যখন খুশী করতে এগিয়ে গেল, তখন দেখল স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতিনী হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, স্বামী স্ত্রীর অপমৃত্যুর জন্য আদৌ দুঃখবোধ করে না, তার বিচলিত হবার কারণ ভিন্ন এবং তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। স্বামী ভাবছে, 'গলায় সবিতা দড়ি দিয়েছে বলে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু দড়িটা হুকে সে আটকাল কি করে?'

বিভিন্ন উপন্যাসে এধরণের মনোরহস্যের অনেক ছবি লেখক নিপুণভাবে এঁকেছেন। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় শশীর বোন বিন্দুর জীবন এর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। কিন্তু বস্তুত এটি ঠিক প্রেম বা যৌনচেতনার কাহিনী নয়। বিন্দুর স্বামী নন্দলাল বিন্দুকে স্ত্রীর সম্মান দেয়নি, তাকে মদ্যপ গণিকারূপে, প্রমোদের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছে। এই অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিন্দুর চরিত্রে এক ভয়াবহ বিকৃতি এনে দিয়েছে। সে এতদূর বিকৃত যে, শান্ত সুস্থ পারিবারিক জীবনযাত্রা তার কাছে নিতান্ত স্বাদহীন এক বিবর্ণ বস্তু।

এই সব ঘটনার মধ্যে বিন্দুর মনোলোকের যে রহস্যের আভাস ফুটেছে, তা উপন্যাসের নায়ক শশী উন্মোচন করতে পারেনি। বিন্দু তার কাছে 'আকাশের পরীর চেয়েও রহস্যময়ী।' যে বিন্দু তার স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছে শুধু চরম অসম্মান আর লাঞ্ছনা—যা'র জীবন ভরে আছে নিদারুণ ব্যর্থতা আর বঞ্চনায়, সেই বিন্দু তার মদের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য শশীর আলমারি থেকে চুরি করে মদের বোতল। পরে শশী যখন ব্যাপারটি বুঝতে পারল, তখন কিন্তু তার মন আরেক রহস্যচেতনায় আচ্ছন্ন

হয়ে গেল—'সে (শশী) ভাবিতেছিল, তার আলমারিতে বোতলের পাশে লেবেল-আঁটা বিষের শিশি ছিল, বিন্দু কেন সেদিন বিষ খাইল না?'—অমেয় জীবনতৃষ্ণার এই অন্তহীন রহস্যচেতনার শিল্পরূপ সৃষ্টিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক অসামান্য স্রষ্টা।'

আসলে মানিকের দৃষ্টিতে প্রেম যৌনতা ও অন্তর্লোকের নানাবিধ দুজ্ঞেয় প্রবণতা থেকে যে জীবন-রহস্যচেতনা ফুটেছে তার মূলে অনেকস্থলেই সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে কাহিনীর নায়কের নিঃসঙ্গতা বিচ্ছিন্নতা ও তীব্র ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার চেতনা,—সব মিলিয়ে অস্তিত্বের এক সঙ্কটময় অনুভব। হেরম্ব (দিবারাত্রির কাব্য) শশী (পুতুল নাচের ইতিকথা), রাজকুমার (চতুষ্কোণ) বিমল (জীবনের জটিলতা) প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে একালের সেই অনিবার্য নিঃসঙ্গতার চেতনা ও একধরণের বিচ্ছিন্নতাধর্মী নেতিমূলক দৃষ্টি জীবনের অপরূপ অনাবিষ্কৃত রহস্যেরই সঙ্কেত জানায়। পূর্বোক্ত মানুষগুলির অন্তর্মুখী দ্বিধান্বিত সত্তার গূঢ় আকর্ষণ জীবনের খর বাস্তবতার চেয়ে তার গভীরের প্রচ্ছন্ন অনতিস্ফুট রূপের প্রতি।

৭.

বিজ্ঞান-দৃষ্টি-সম্ভব বাস্তবচেতনা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পিসত্তাকে নিঃসংশয়ে প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু তবু একথা অস্বীকার করা চলে না যে, তিনি একই সঙ্গে 'জন্ম-রোম্যান্টিক'-ও। এই রোম্যান্টিকতা তাঁর পূর্বসূরি কল্লোলপন্থীদের রচনায় অজস্র ধারায় বিপুল আবেগে ঝরে পড়েছে, কিন্তু বলা বাহুল্য মানিক সেই ধরণের উচ্ছ্বাসপ্রবণ রোম্যান্টিক সাহিত্য-সৃষ্টিতে আদৌ আস্থাশীল ন'ন। তাই একেবারে প্রথম দিকের রচনার কিছুটা রোম্যান্টিক আতিশয্যকে তিনি দ্রুত অতিক্রম করে গেছেন। 'বিজ্ঞাননিষ্ঠ বাস্তবতার সঙ্গে রোম্যান্টিকতার মিশ্রণ ঘটিয়ে জীবনকে তিনি এক বলিষ্ঠ অভিনব দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন। (সেই দৃষ্টি জীবনের পূর্ণতা-সন্ধানী রোম্যান্টিক স্বপ্ন-আদর্শের অনুগামী এক মানুষের। সেই মানুষটি কঠিন বাস্তবকে মেনে নিয়েও মাঝে মাঝে সেই বাস্তবের ভাঙাচোরা রূপকে পূর্ণতা দিতে চায় কিছু আদর্শ ও স্বপ্নের রহস্যময় স্পর্শে। সেই আদর্শ ও স্বপ্নচেতনার রহস্য-রূপ প্রথম দেখা দিয়েছে একেবারে তরুণ বয়সের রচনা 'দিবারাত্রির কাব্যে'—আনন্দের 'শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ প্রেম ও সৌন্দর্যে'র জন্য হেরম্বের গভীর তৃষ্ণার মধ্য

দিয়ে।' 'পদ্মানদীর মাঝি'তে-ও এ'ধরণের রহস্যময়তার আরেক ছবি ফুটেছে—হোসেন মিঞা ও তার ময়নাদ্বীপকে ঘিরে দরিদ্র শ্রমজীবী নায়ক কুবেরের মনে। ময়নাদ্বীপ তার কঠিন বাস্তবতা সত্ত্বেও কুবেরের মনে কতকটা 'ইউটোপিয়া'র মতো, এক ধরণের অনতিস্পষ্ট সাম্যচেতনার আদর্শে উজ্জীবিত জগৎ। আর হোসেন মিঞা তার সমস্ত বাস্তবোচিত ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্নীতি-অপরাধ সত্ত্বেও কুবেরের চোখে রূপকথার রহস্যময় নায়কের মতো। এই উপন্যাসে হোসেন মিঞা ও সমুদ্র উভয়ে উভয়ের প্রতিস্পর্ধী। কিন্তু দুজনেই যেন কুবেরের জীবনে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় নিয়তি। ওই দুই সত্তাই তার কর্মজীবনের সমস্ত আশা-স্বপ্নকে যেন চূড়ান্তভাবে আচ্ছন্ন আবিষ্ট করে রেখেছে।'

৮.

'জীবনের নানান বাস্তব তাৎপর্যকে যে এক প্রগাঢ় রহস্যচেতনার আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর প্রথম পর্যায়ের গল্পে-উপন্যাসে, সেই জীবনরহস্য চেতনার মায়াবী আলো তাঁর চোখ থেকে ক্রমেই মুছে এল; সেখানে ফুটে উঠল এক উগ্র কঠিন তীক্ষ্ণদৃষ্টি—মার্কসিষ্ট মন্ত্রে দীক্ষিত শ্রেণী-চেতনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের আগ্নেয় দৃষ্টি। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী কথা-সাহিত্যে এই দৃষ্টি ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দর্পণ (১৯৪৫) উপন্যাস ও আজকাল পরশুর গল্প (১৯৪৬) গ্রন্থে এই দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রথম নিশ্চিত স্বীকৃতি।'

'প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস-গল্পে মানিকের দৃষ্টিকে কোথাও কোথাও কিছুটা নেতিমূলক মনে হতে পারে। লেখক যেন সমকালীন সংশয় দ্বিধা ও বিচ্ছিন্নতা বোধের দ্বারা প্রভাবিত [স্মরণীয়—হেরম্ব, শশী, বিমল (জীবনের জটিলতা), তরঙ্গ (অমৃতস্য পুত্রঃ) চরিত্র]।'

কিন্তু তবু তার মধ্যেই ছিল লেখকের এক ঐকান্তিক অন্বেষণ-প্রবণতা, জীবন-রহস্য-সন্ধানের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। ছোটবেলা থেকে 'কেন' নামক মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত এই শিল্পীর মর্মমূলে ছিল 'ছোট্ট বড় সব বিষয়ের মর্মভেদ করার অদম্য আগ্রহ।' কিন্তু লেখক-জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে মানিক-বন্দ্যোপাধ্যায় যেন সেই সব রহস্য জিজ্ঞাসা সমস্যা ও সঙ্কটের ইতিমূলক সুনির্দিষ্ট উত্তর পেয়ে গেছেন। এক কথায় সেই উত্তর হ'ল মার্ক্সীয় পন্থা। আর

এসবক্ষেত্রে এর অনিবার্য প্রত্যাশিত ফল হ'ল, শিল্পীর মনে জীবন-সম্পর্কিত রহস্য-উপলব্ধির অবসান। জীবনকে যখন কোন শিল্পী কোন সুনির্দিষ্ট বিশেষত, মনন-গ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক মতবাদের মধ্য দিয়ে দেখেন, তখন জীবনের কোন রহস্যময় তাৎপর্য ধরা দেয় না তাঁর দৃষ্টিতে। মানিকের ক্ষেত্রেও কতকটা তাই ঘটল যেন। বরং এর আগে জীবনকে যে সব রহস্যে আবৃত বলে মনে করতেন, সেইসব রহস্য-উন্মোচনের সরলীকৃত উপায় এখন যেন তাঁর করায়ত্ত। তাই তার চোখে আর জীবন-রহস্যের সেই অপরূপ মেদুরতা নেই।

আর এই কারণেই. অনেকের মতে এই পর্বে শিল্পী হিসাবে বিচ্যুতি ঘটেছে তাঁর। কিন্তু শিল্প-বিচার আমাদের ঠিক বিবেচ্য বিষয় নয়। আমরা তাঁর জীবন-দৃষ্টির এক বিশেষ দিক্ নিয়ে পর্যালোচনা করছি। সেদিক থেকে বলা চলে যে, তাঁর এই শেষপর্বের কথাসাহিত্যকে অবলম্বন করে তাঁর শিল্পিসত্তায় দেখা দিল (বিশেষত উপন্যাসে) এক অদ্ভুত ভাব-সঙ্কট। এই পর্যায়ের অনেক উপন্যাসে জীবনের কঠিন বাস্তব রূপ—এর সামাজিক আর্থ-নীতিক সমস্যার রুক্ষ রূঢ় রূপ যখন আত্মপ্রকাশ করল, তখনই এই ভাবসঙ্কট দেখা দিয়েছে। এর কারণ নিহিত আছে মানিকের আবহমান সত্তার গভীরে, যেখানে জীবন সম্পর্কে তাঁর রহস্যচেতনা অতলস্পর্শী। প্রবল বিজ্ঞান-দৃষ্টি সত্ত্বেও মানিক মূলত গূঢ় রহস্যময় মনোজীবনের রূপকার। শিল্পী হিসাবে তাঁর দৃষ্টি এই রহস্যময় ব্যক্তিসত্তার দিকে ; তার নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন সত্তা তাঁকে প্রবলভাবে টানে। অথচ দ্বিতীয় পর্যাযে তিনি শ্রেণীসচেতন বাস্তববাদী লেখক। এই পর্যাযে এসে ব্যক্তির মানসব্যাধিকে, তার নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতাকে তিনি সমগ্র সমাজশরীরের এক ব্যাপক ব্যাধির অঙ্গীভূত বলে বিশ্বাস করছেন। আর আর্থনীতিক শ্রেণীসংগ্রাম হ'ল সেই ব্যাধি দূর করার প্রধান হাতিয়ার। আগেই বলেছি, এই শেষ পর্বের উপন্যাসে মানিক একদিকে পূর্বোক্ত কঠিন বাস্তব সংগ্রাম ও সমস্যাকে সোচ্চার করে তুলেছেন, আবার তারই অন্তরালে, অপেক্ষাকৃত মৃদু কণ্ঠে যৌন জীবনের তথা মনোজীবনের জটিল রহস্যের-ও আভাস দিতে চেয়েছেন। (দর্পণ স্বাধীনতার স্বাদ, চিন্তামণি ইত্যাদি উপন্যাস স্মরণীয়)। এই রহস্যবোধ সম্পর্কে তাঁর অন্তর্নিহিত আগ্রহ এখনও স্বাভাবিক কারণেই নিঃশেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু যাকে বলেছি ভাবসঙ্কট, তার প্রকাশ বস্তুত এখানেই। সর্বত্র দুই

বিপরীত প্রবণতার যথাযথ মিশ্রণ বা সামঞ্জস্য ঠিকমত ঘটেনি। বিষয়টিকে আরেকটু স্পষ্ট করার জন্য আরেক দিক থেকে সঙ্কটটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মানিকের এই পর্বের অনেক উপন্যাসকে বোধ হয় এক অর্থে 'রোম্যান্টিক রিয়্যালিজম্'-এর লক্ষণাক্রান্ত বলা চলে। অর্থাৎ এই সব উপন্যাসে পাই—ব্যক্তিবিশেষের বহিরঙ্গ তথা মনোজীবনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত একালের আর্থনীতিক, রাজনৈতিক তথা কঠিন বাস্তব জীবন-সমস্যার ছবি। এইসব গ্রন্থে লেখকের মনের স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্য প্রবণতার ফলে একালের ব্যক্তির অন্তর্জীবনের জটিল রূপ অনেক স্থলে আভাসিত, যে জীবন হয়তো কালধর্মে কিছুটা অস্বাভাবিক বা বিকৃত। এর মধ্য দিয়ে জীবন-রহস্যেরও কিছু সঙ্কেত ফুটেছে। কিন্তু তা' শেষ পর্যন্ত গভীর ও গাঢ় হয়ে ওঠে নি। তার অন্যতম কারণ হ'ল, লেখকের ওই দুই পৃথক্ প্রবণতার (রাজনৈতিক তথা আর্থনীতিক সংগ্রাম-চেতনা ও মনোজীবন-রহস্য-প্রবণতার) সঠিক সামঞ্জস্যের অভাব। সব মিলিয়ে এক অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ জীবনরূপ সেখানে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি—সব কিছুই যেন খণ্ডিত অবিন্যস্ত ও খাপছাড়া—উপকরণের সমষ্টি মাত্র। দৃষ্টান্ত হিসাবে এই গ্রন্থগুলির নাম করা চলে: চিহ্ন, পাশাপাশি পেশা, শুভাশুভ, আরোগ্য, চালচলন, পরাধীন প্রেম ইত্যাদি।

তবে ওই ভাবসঙ্কটের ফলে শিল্প হিসাবে এই শেষ পর্যায়ের রচনার মূল্য যাই হ'ক না কেন, এর মধ্য দিয়ে একটা সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে যে, প্রখর বাস্তবমুখী নানা চিন্তা-প্রত্যয় ও মতবাদের নৈষ্ঠিক অনুসরণের মধ্যেও স্রষ্টা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের গূঢ় রহস্য-চেতনাকে বহন করে চলেছিলেন আমৃত্যু।

রবীন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্য-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ কেবল বাংলা কাব্যজগতের অপ্রতিরথ অধীশ্বর ন'ন, বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি এক যুগপ্রবর্তক স্রষ্টা—আশা করি একথা আজ অবিসংবাদিত সত্য। বাংলা ছোট গল্প তাঁর হাতেই প্রথম যথার্থ শিল্পিত অবয়ব লাভ করেছে, তিনিই তাকে সূচনাপর্বের সদ্য অঙ্কুরিত রূপ থেকে পরিণত পর্বের পুষ্পিত ফলবান সমৃদ্ধি দান করেছেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি এই অর্থে নিশ্চয় আদি স্রষ্টা ন'ন। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকার নিয়েই তিনি উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশ শতকের গোড়া থেকেই চোখে পড়ে আপন ব্যক্তিত্বের স্বকীয়তায় উজ্জ্বল তাঁর এক স্বতন্ত্র মূর্তি। আর এই শতাব্দীর প্রায় চার দশক ধরে বাংলা উপন্যাসকে যিনি আধুনিক সময় ও সমাজের উপযোগী এক নূতন শিল্পমাধ্যম রূপে প্রতিষ্ঠা দিলেন, বিশিষ্ট তাৎপর্যযুক্ত 'কণ্টেণ্ট'কে যিনি 'ফর্মে'র বিচিত্র শিল্পাধারে বিন্যস্ত করার বিভিন্ন পরীক্ষামূলক নিদর্শন রেখে গেলেন, সেই রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয় ঔপন্যাসিক হিসাবেও এক যুগস্রষ্টা শিল্পী বলে চিহ্নিত করা যায়।

বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়—রবীন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্য। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাস-গল্পের মাধ্যমে জীবন-দৃষ্টি ও শিল্পচেতনার যে বাতাবরণ রচনা করলেন, তারই দর্পণে তাঁর উত্তরসূরিদের সৃষ্টি-প্রবণতার তাৎপর্যটি আমরা বুঝে নিতে চাই। বুঝতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরিদের কথাসাহিত্য জগৎ ও জীবনের অনিবার্য নিয়মে দেশ কাল ও স্রষ্টার বিবর্তন বা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে কত দূরে সরে গেল, কোন্ পথ বেয়ে কত দিকে তা ছড়িয়ে পড়ল। প্রসঙ্গত সবিনয়ে দু একটি কথা জানিয়ে রাখি। বর্তমান ক্ষুদ্র নিবন্ধটি একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা মাত্র। পূর্ণায়ত সমীক্ষা নয়। আরেকটি কথা। নিবন্ধটির শিরোনামে 'কথাসাহিত্য' উল্লিখিত থাকলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৃষ্টান্ত হিসাবে কেবল উপন্যাস প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। নিবন্ধটির আয়তন-সংক্ষেপ এর জন্য প্রধানত দায়ী। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, নিবন্ধের সামগ্রিক মূল বক্তব্য কথাসাহিত্য

অর্থাৎ উপন্যাস ও ছোট গল্প উভয়কেই আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। সবশেষে আরেকটি কথা। বর্তমান আলোচনায় অনেক কথাসাহিত্যিকের নাম বাদ পড়েছে। এর কারণ নিশ্চয় এই নয় যে, তাঁরা লেখক হিসাবে উল্লেখযোগ্য ন'ন। এর একটি কারণ, নিবন্ধের সীমিত আয়তন, আর অন্যটি হ'ল, বর্তমান নিবন্ধ-লেখকের বক্তব্যের বিশেষ দৃষ্টিকোণ। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই লেখকের নামগুলি এসেছে। কেবল লব্ধপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান গ্রন্থকারদের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য নয়।

সম্ভবত বলা বাহুল্য যে, রবীন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্যের সূচনাকাল নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর থেকে গণনীয় নয়। বস্তুত রবীন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্যের শুধু সূচনা-রূপ নয়, এর পরিস্ফুট চিত্রপট আত্মপ্রকাশ করেছিল রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই। এই উত্তরণ-প্রয়াসের দীক্ষা বোধ করি রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়ে গেছেন তাঁর উত্তরসাধকদের। ছোট গল্পে, উপন্যাসে তিনি বারবার নিজের সীমাকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন—সেই সীমা কোথাও বিষয়বস্তু-বা জীবনদৃষ্টিগত, কোথাও বা প্রকরণগত, আবার কোথাও বা উভয়তই। কিন্তু, বলা বাহুল্য উত্তরসূরিদের অনেকের কাছেই এই প্রয়াস আদৌ যথেষ্ট বলে মনে হয়নি। আর তাই রবীন্দ্রনাথের এই নিত্য নবায়মান ও একান্ত রূপান্তরধর্মী সৃজনশীল শিল্পিসত্তার পাশে-পাশেই গড়ে উঠেছে আরেকটি সমান্তরাল ধারা—তিরিশের দশকের কাছাকাছি সময় থেকেই সেই 'সাহিত্য-আন্দোলন' রবীন্দ্রনাথের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে চেয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাসে সেটি এক কথায় কল্লোল-চেতনা বা 'কল্লোলীয় আন্দোলন' রূপে পরিচিত। মুখ্যত 'কল্লোল' পত্রিকাকে আশ্রয় করেই এই আন্দোলন প্রথম স্পষ্ট রূপ নেয় বলেই একে ওই ধরণের অভিধায় চিহ্নিত করা চলে। ওই চেতনা বা আন্দোলন, যাই বলি না কেন, তা ছিল মুখ্যত বাঙালী তরুণ লেখকগোষ্ঠীর প্রবল যৌবন-চেতনায় উদ্দীপ্ত, উচ্চকিত। কিন্তু বস্তুত রবীন্দ্র-উত্তর কথাসাহিত্যের জগৎ ঠিক এখান থেকেই প্রথম গড়ে ওঠেনি। তা' তৈরী হচ্ছিল আরো আগে থেকে, অবশ্য কখনই তা' 'কল্লোলের' মতো সোচ্চার ভঙ্গিতে নয়। তাছাড়া এধরণের উত্তরসূরিরা কখনোই রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে প্রয়াসী হ'ননি, অস্বীকার ত' নয়ই। বরং সেই বিপুল গভীর অনিঃশেষ উৎসলোক থেকে অঞ্জলি ভরে নিয়ে তাকেই আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী

বর্ধিত বিপুলায়ত করে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করে দিয়েছেন এঁরা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শরৎচন্দ্র ও ভারতী-গোষ্ঠীর কয়েকজন লেখক।

সময়ের দিক্ থেকে বিচার করলে শরৎচন্দ্রকে ঠিক রবীন্দ্র-উত্তর পর্বের লেখক হয়ত বলা চলে না। সমসাময়িকই বলতে হয়। কারণ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' ভারতী পত্রিকায় বেরোয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে,—যখন সবেমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' বেরিয়েছে। এরপর থেকে দীর্ঘদিন ধরে উভয়ে বাংলা উপন্যাসের জগতে পাশাপাশি অবস্থান করেছেন নিজ নিজ মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে। কিন্তু তবু শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরি বলতে কোন দ্বিধা নেই। এর কারণ, শরৎচন্দ্রের উপর রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম প্রভাব। কেবল সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের প্রভাব নয়, চোখের বালি, গোরা, গল্পগুচ্ছের মতো বিভিন্ন রচনার সুনির্দিষ্ট প্রভাবের কথা শরৎচন্দ্র নিজেই ব্যক্ত করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথকে অকুণ্ঠ-চিত্তে গুরু বলে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিও জানিয়েছেন তিনি। বলা বাহুল্য, এর অর্থ এই নয় যে, রবীন্দ্র-পরবর্তী ঔপন্যাসিক হিসাবে শরৎচন্দ্রের কোন স্বকীয়তা ছিল না। এমন নয় যে রবীন্দ্রনাথ থেকে তাঁর জীবনদৃষ্টি বা মানস প্রবণতা স্বতন্ত্র ছিল না। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তা অবশ্যই ছিল। শরৎচন্দ্র তাঁর স্বীয় জীবনের বিপুল ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং মানুষের প্রতি ঐকান্তিক মমত্ববোধ দিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের যে ছবি এঁকেছেন, তা রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত জীবনচিত্রের তুলনায় নিঃসন্দেহে আরও বেশী বাস্তবধর্মী, আমাদের পরিচিত জীবন-পরিবেশের আর-ও অনেক বেশি 'ডিটেল্স'-এ পরিপূর্ণ। কিন্তু তবু বলবো, শরৎচন্দ্র সারাজীবন তাঁর সামগ্রিক জীবন-ও শিল্প-সাধনায় রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথেরই অনুসরণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন, অন্তত গুরুকে তেমনভাবে কোথাও অতিক্রম করতে চাননি। তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি রবীন্দ্র-বিরোধিতার প্রবণতা থেকে কখনই জন্ম নেয়নি।

ভারতী-গোষ্ঠীর লেখকদের সম্পর্কেও সেই কথা। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রমুখ সকলেই রবীন্দ্র-ভক্তি ও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রেরণাকে সাহিত্য-সাধনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে, তার উপর নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও জীবনদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য অনুসারে কথাসাহিত্যের শিল্পকৃতি রচনা করে গেছেন। সাহিত্যে

সমাজ নিষিদ্ধ দেহাশ্রিত কামনা-বাসনাকে যথেষ্ট স্বীকৃতি দানের মধ্য দিয়ে কিছুটা দুঃসাহসের পরিচয় দিলেও, এঁরা শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রযুগের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ভাঙার প্রয়াসী হ'ননি, সেই মূল্যবোধ সম্পর্কে কোন সংশয়ী বা নেতিবাদী দৃষ্টির পরিচয়-ও এঁদের রচনায় মেলে না।

সেই দৃষ্টি ফুটে উঠল তীব্র তীক্ষ্ণ রেখায় 'কল্লোল'-পন্থী লেখকদের রচনায়। বিশের দশকের শেষ দিকে। এবারে সেই প্রসঙ্গে আসছি।

'চোখের বালি'-র পর থেকে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের আধুনিক মূর্তি। ঘটনা পরম্পরার বিবরণের চেয়ে তাদের আঁতের কথাকে বিশ্লেষণের সাহায্যে উপস্থাপনায় লেখকের আগ্রহ অধিক। এরপর থেকে আধুনিক ব্যক্তিমানুষের জীবনদৃষ্টি বাণীরূপ পেতে থাকল তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। সমাজের চেয়ে ব্যক্তিই অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করল রবীন্দ্রনাথের। আর এখানেই ঔপন্যাসিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার অন্যতম মৌল পরিচয়। কিন্তু দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন কিছু সমালোচক (বিপিনচন্দ্র পাল, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ) তাঁর এই আধুনিক বাস্তবমুখী দৃষ্টিতে আতঙ্কিত হয়ে 'চোখের বালি' 'ঘরে বাইরে' কিংবা 'স্ত্রীর পত্র'-কে 'ইন্দ্রিয় লালসার নগ্ন ও কুৎসিত মূর্তি' কিংবা 'সমাজদ্রোহী' বলে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করলেন। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, সেই রবীন্দ্রনাথই তাঁর জীবৎকালে তাঁর তরুণ উত্তরসূরিদের কাছে আদৌ তেমন 'আধুনিক' বলে প্রতিভাত হলেন না। তিনি তখন নিতান্তই 'classical' লেখক। তাঁদের দৃষ্টিতে 'রবীন্দ্রনাথের সুচিত্রিত চরিত্রগুলির সকলেই যেন শুচিতায় ভরা'। তরুণ গোষ্ঠীর অন্যতম পুরোধা বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের কাব্যসম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন, বস্তুত তা তাঁর উপন্যাস সম্পর্কেও এই গোষ্ঠীর সাধারণ অভিমত বলে গণ্য করা চলে—"তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালা যন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হলো তাঁর জীবনদর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।" [রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক (সাহিত্য চর্চা পৃঃ ১১৮)]

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পরোক্ষভাবে আরেকটি অভিযোগ শোনা গেল যে, তাঁর কথাসাহিত্যে দরিদ্র জীবনের বাস্তব চিত্র নেই। বস্তুত এর মূলে

নাকি অভিজ্ঞতার অভাব। তার ফলে সহানুভূতি সত্ত্বেও নাকি [(রবীন্দ্রনাথের মতো ?) 'অভিজাত লেখকরা দরিদ্র জীবনের করুণ মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকতে পারেন না।' [বাঙ্গালার কথার আভিজাত্য : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বঙ্গবাণী আষাঢ়, ১৩৩২]

দেহাশ্রিত যৌন মনস্তত্ত্ব ও নিম্নবিত্ত দরিদ্র-জীবনের অভিজ্ঞতা—মুখ্যত এই দুষের তথাকথিত অভাববোধ তরুণ লেখক গোষ্ঠীকে রবীন্দ্রনাথ-প্রদর্শিত পথ থেকে সরিয়ে আনল। অর্থাৎ 'কল্লোল'-এর প্রাণবীজ নিহিত ছিল বহুলাংশে এই ধরণের রবীন্দ্র-প্রতিক্রিয়া বা রবীন্দ্র-বিদ্রোহের নেতিমূলক ভিত্তিভূমিতে। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেশ-কালের বিভিন্ন প্রবণতা, বিচিত্র উপকরণ। সে সবও এক অর্থে অন্তত প্রাথমিকভাবে নেতিধর্মী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ায় সারা দেশের রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে নানামুখী বিপর্যয় ও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল, তার অভিঘাতে সেদিনের স্পর্শকাতর যুবচিত্ত প্রচলিত মূল্যবোধ ও আদর্শ সম্পর্কে ক্রমেই সংশয়ী ও দ্বিধান্বিত হয়ে উঠল। সে এক দুঃসহ অনিশ্চয়তার ক্রান্তিকাল। প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের মূর্তি-গুলি একে একে ভেঙে যাচ্ছে মনের মধ্যে, কিন্তু চোখের সামনে এমন কেউ নেই বা কিছু নেই, যাকে সেই শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত করা চলে। রবীন্দ্র-নাথকে তাঁরা সরাতে চান, কিন্তু সেখানে বসাবেন কাকে ? তখন সেই দুঃসহ শূন্যতার মুহূর্তে যুবচিত্ত হাত বাড়াল দূরের দিকে—দেশ ছাড়িয়ে বিদে-শের দিকে। প্রবল পশ্চিমী হাওয়ায় তখন ভেসে আসছে নানা চাঞ্চল্যকর তত্ত্ব ও সৃজনশীল সাহিত্য। তারই অনুকরণে ও অনুসরণে মেতে উঠলেন তরুণদল। একদিকে ফ্রয়েড ও হ্যাভ্‌লক এলিসের অবচেতন লোকের যৌন মনস্তত্ত্ব, মার্কস ও রুশ বিপ্লব-বাহিত সাম্যবাদী তথা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা, অন্যদিকে বন্ধন-অসহিষ্ণু, ব্যক্তিচেতনা-সর্বস্ব ও বোহেমীয় জীবনবোধ-আশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রবল অভিঘাতে উদ্বেজিত যৌবনদীপ্ত তরুণ কল্লোলপন্থী লেখকগোষ্ঠী বিশের দশকের শেষ পর্যায়ে বাংলা কথাসাহিত্যে এক আলোড়ন তুললেন। মণীন্দ্রলাল বসু, গোকুল নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল এই গোষ্ঠীর কয়েকটি বিশিষ্ট নাম।

এঁদের সাহিত্য মুখ্যত নগরকেন্দ্রিক। কথাসাহিত্যে বাস্তবতা নিয়ে আসার প্রবল রবীন্দ্র-বিদ্রোহের নেশায় এঁরা কথাসাহিত্যকে বাস্তবতায় সজীব করে তুলতে বিশেষ আগ্রহী হলেন। কিন্তু আগ্রহের প্রাবল্যে দেখা দিল

আতিশয্য। যৌন মনস্তত্ত্বের ছবি আঁকতে গিয়ে দুঃসাহসী হবার আগ্রহ যত প্রকাশ পেল, শিল্প-সংযম রক্ষা করে যথার্থ বাস্তবনিষ্ঠ হবার প্রেরণা তত জোরালো বলে মনে হল না। দরিদ্র, দুর্গত মানুষের যে ছবি ফুটল, তা কেবল শহরের বস্তি অঞ্চলের—গ্রাম জীবনের নয়। আর সে ছবিতেও একপেশে উগ্রতা ও অতিরেকের ছাপ। সব মিলিয়ে কল্লোলপন্থীদের সাহিত্যে জীবনের ব্যাপক ও নিবিড় অভিজ্ঞতার অভাবটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর সেই অভিজ্ঞতার অভাব পূরণ করল একদিকে পশ্চিমী সাহিত্য থেকে ধার করা বিষয় ও চরিত্র, অন্যদিকে যুবচিত্তের রোম্যাণ্টিক কাব্যময়তা। এই রোম্যাণ্টিক স্বপ্নাতুর দৃষ্টির ফলে সেদিনের তরুণ লেখকদের রচনায় জীবনের অন্ধকার ছবি-গুলি শেষ পর্যন্ত কঠিন বাস্তব রেখায় স্থায়িত্ব পায়নি, তা রোম্যাণ্টিক আশাবাদের কোমল কাব্যময় স্পর্শে কতকটা লঘু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই কালেরই কিছু লেখক, যাঁরা বয়সে সবাই ঠিক তরুণ ন'ন, স্বভাবে ন'ন নিছক রোম্যাণ্টিক, বিশেষ ভাবে রবীন্দ্র-বিদ্রোহের আবেগে বা ঝোঁকে যাঁরা সাহিত্য লিখছেন না, লিখছেন অনেকটাই জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় বা প্রখর কোন উপলব্ধি থেকে, তাঁদের সাহিত্যে কিন্তু জীবনের ছবি এমন রোম্যাণ্টিক স্বপ্ন জড়িত নয়, তা অনেকটাই **stark realism**। জীবনের নগ্ন ক্রূর ছবি সেখানে ফুটে ওঠে, ফুটে ওঠে জীবন সম্পর্কে এক সংশয়ী, সিনিক্যাল তির্যক দৃষ্টি। নরনারীর অবচেতনার তামস রহস্যকে নির্লিপ্ত মনন জিজ্ঞাসা নিয়ে এঁরা উন্মোচনের প্রয়াসী হ'ন। প্রাক্-কল্লোল পর্বের কথাশিল্পী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও তাঁর পরবর্তী লেখক জগদীশ গুপ্ত এবং এঁদেরই উত্তরসূরি হিসেবে শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বস্তুত সময়ের হিসাবে যাই হ'ক, মানসিক প্রবণতার বিচারে এইসব লেখক এবং এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কল্লোল-উত্তর-পর্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য। তিরিশের দশক থেকে এই পর্বের রূপটি স্পষ্টতা ও পরিণতি লাভ করেছে। রবীন্দ্র-বিদ্রোহের প্রাথমিক উত্তেজনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের অব্যবহিত প্রতি-ক্রিয়ায় ভাবপ্রবণ তরুণ কথাশিল্পীদের রচনায় যে রোম্যাণ্টিক ফেনিলতা ও অতিরেক আত্মপ্রকাশ করেছিল, ক্রমে তা রূপান্তরিত হতে থাকল পরিণত জীবন দৃষ্টিতে। আবেগে বিহ্বল না হয়ে কতকটা নিরাসক্ত মননিষ্ঠ মন নিয়ে জীবনকে দেখার, জীবনের প্রতি যে বিশেষ দৃষ্টির পরিচয় রবীন্দ্র-

উপন্যাসে আছে, যার অভাব শরৎচন্দ্রের অনেক রচনায় চোখে পড়ে, কল্লোলের তরুণ লেখকদের গল্পে-উপন্যাসেও যে দৃষ্টি প্রায়শই অনুপস্থিত, সেই দৃষ্টি উত্তর-কল্লোল কথাসাহিত্যে তিরিশের দশকের বেশ কিছু লেখকের রচনায় প্রতিফলিত হয়ে আরও পরবর্তীকালে অর্থাৎ চল্লিশের দশকেও সঞ্চারিত হয়ে গেছে। অবশ্য এর রূপ বলা বাহুল্য, সর্বত্র এক নয়। কিন্তু মূল দৃষ্টি অনেকটা একই। তিরিশের দশকের এ ধরণের দৃষ্টিসম্পন্ন কয়েকজন লেখকের কথা একটু আগেই বলেছি। এছাড়াও আছেন তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্নদাশঙ্কর, বনফুল, সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ। এঁদের জীবনবিষয়ক বক্তব্য নিশ্চয় এক নয়. শিল্পরীতিও পৃথক্। কারো রচনায় রুক্ষ রাঢ়ের নরনারীর আদিম জৈব রহস্য ও দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ জীবন সংগ্রামের ইতিহাস-সচেতন এপিক ব্যঞ্জনা, আবার কোথাও বা গ্রামজীবনের সহজ ছন্দে নিসর্গের অন্তর্লীন প্রাণসত্তার সঙ্গে মানব-হৃদয়ের গূঢ় সংযোগের আনন্দ-বেদনা বেজে উঠেছে। কেউ মননবৃত্ত মানুষের বিশ্ববীক্ষা ও সত্য জিজ্ঞাসার বিপুলায়ত চিত্রপট তুলে ধরেছেন, আবার কেউ বা আধুনিক বুদ্ধিজীবী মানুষের রিক্ত ক্লান্ত হৃদয়ের নিঃসঙ্গতা ও হাহাকারকে শিল্প-রূপ দিয়েছেন। কল্লোল-পর্বের লেখকদের নাগরিক পরিবেশে রচিত কৃত্রিম, সংশ্রয়ী ও দ্বিধাগ্রস্ত জীবনের কাহিনীর পাশে তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপুষ্ট মাটি-ঘেঁষা সাহিত্যের সুস্থ সহজ ঋজু জীবন-প্রত্যয় ও গভীর আস্তিক্য-চেতনা বাংলা কথাসাহিত্যে এক পরম চরিতার্থতা এনে দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের আবেগবাহুল্য-বর্জিত মননিষ্ঠ উপন্যাসে পুরুষ-চরিত্রের যে প্রাধান্য চোখে পড়ে, যে প্রাধান্য ক্রমে স্তিমিত হয়ে এসেছে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ও কল্লোলপন্থীদের নেতিমূলক সংশয়ী দৃষ্টি-সম্ভূত রচনায় সেই প্রাধান্য আবার ঋজু শিখায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে তিরিশের দশকে ও তৎপরবর্তী বাংলা উপন্যাসে—তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক, অন্নদাশঙ্কর, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রমুখের রচনায়।

চল্লিশের দশকের একেবারে গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটল। তখন সারা পৃথিবী জুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাবানল জ্বলছে। সেই ভয়ঙ্কর

আগুনের ঝাপটা এসে লাগছে আমাদের জীবনেও। এরই মধ্যে এলো তেরোশ' পঞ্চাশের সর্বনাশা মন্বন্তর। তার উপর সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও দেশ-বিভাগ-জনিত স্বাধীনতা। সব মিলিয়ে সে এক দুঃসহ দুঃস্বপ্নের অধ্যায়। পুরনো মূল্যবোধের সমস্ত সঞ্চয় এতদিন পর্যন্ত হয়তো তবুও কিছু অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু তা এবারে প্রায় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে এলো। চল্লিশ ও তার পরবর্তী কালের কথাসাহিত্যে সেই বিপর্যস্ত মূল্যবোধের ফলে বিচ্ছিন্ন এক হতাশ্বাস ক্ষয়িষ্ণু জীবনের ভাঙাচোরা ছবি ফুটে উঠেছে, একালের নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত জীবনে সমাজের প্রায় কোন অস্তিত্বই নেই। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথে সমাজের ভূমিকা মুখ্য নয়, তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তির সমগ্রতা সন্ধানী জীবনবোধের বিবর্তনের ছবি বিশেষভাবে আধুনিক পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করে। তাঁর কাহিনী ব্যক্তির প্রবল আত্ম জিজ্ঞাসা ও সত্তার গূঢ় যন্ত্রণাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে সত্য, কিন্তু তা মূলত বিশ্বাস বা জীবনপ্রত্যয়ের উপর স্থাপিত। রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট ব্যক্তি নিজেকে কখনোই একেবারে বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত মনে করে না। অস্তিত্বের নেতিবাচক দৃষ্টির ফলে সেই ব্যক্তি কখনই নিজেকে একেবারে alienated ভাবে না। কিন্তু চল্লিশের শেষ কিংবা তারও পরবর্তীকালে পর্যুদস্ত বিশ্বাসের ধূসর জীবনপটে ব্যক্তি নিজেকে ক্রমেই এক rootless বা উন্মূল অনিকেত সত্তা বলে অনুভব করতে লাগল, যার পায়ের তলায় স্নেহ, প্রেম, মমতা, বিশ্বাস ইত্যাদি জীবনের মৌল প্রত্যয়ের মাটি ক্রমশই দ্রুত সরে যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত জীবনের এই উদ্‌ভ্রান্তি অবক্ষয় ও আত্মবঞ্চনার আশ্চর্য মুহূর্তগুলি শিল্পিত সার্থকতা লাভ করেছে একালের বিশিষ্ট ছোটগল্পকারদের রচনায়। এঁদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। এঁদের এই সময়কার কয়েকটি উপন্যাসেও এই বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত সময় ও সমাজের নিপুণ বিশ্লেষণ ধরা পড়েছে, যেমন কিনু গোয়ালার গলি, বারোঘর এক উঠোন ও চেনামহল।

যুদ্ধ-মন্বন্তর ও দেশ বিভাগের ফলে বিপর্যস্ত মূল্যচেতনার আত্যন্তিক শূন্যতা-বোধ থেকে ভিতরে ভিতরে মুক্তি চাইছিল বাঙালী মধ্যবিত্ত মানস। এক কথায় সেই মন পালাতে চাইছিল কিছুটা বর্ণিল জীবনের রসমধুর আশ্রয়ে। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালের উপন্যাসে বিষয়বস্তু পরিবর্তনের নামে এই সুযোগে দেখা দিল এক ধরণের 'এস্কেপিজম্'। 'ইতিহাস'-আশ্রয়ী উপন্যাসের ঢল

নামল যেন পঞ্চাশ-উত্তর বাংলা সাহিত্যে। এদের শিল্পমূল্য যাই হ'ক, বাংলা উপন্যাস কেবল বর্তমানেই সীমিত না থেকে সময়সীমাকে দূর অতীতের অভি-মুখে ছড়িয়ে দিয়ে, বাংলা কথা সাহিত্যে এক নূতন 'ডাইমেনশান' যোগ করল। এই 'ডাইমেনশান' সার্থকভাবে আর এক দিক থেকে সংযোজিত হল— সেটি বাংলা উপন্যাসের ভৌগোলিক পরিধির বিস্তার। শৈলজানন্দ, তারা-শঙ্কর, মানিক, বাংলাসাহিত্যে যে আঞ্চলিক কাহিনী ধারার প্রবর্তনা করে গেছেন, সেই ধারাই আরও দূরপ্রসারী অজ্ঞাতপূর্ব আঞ্চলিক জীবনকে আশ্রয় করে নানা রসবৈচিত্র্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। মনোজ বসুর জল জঙ্গল, সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই চরিত মানস, সমরেশ বসুর উত্তরঙ্গ, গঙ্গা, অদ্বৈত-মল্ল বর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম এই পর্যায়ের কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা।

এরপর থেকে বাংলা কথাসাহিত্যের যে বহুধা-বিভক্ত বিচিত্র পথবাহী গতি-প্রকৃতি বা প্রবণতা, তার কোন সুনির্দিষ্ট বা সুবিন্যস্ত পরিচয় উপস্থাপিত করা এই সীমিত পরিসরে সম্ভব নয়।

তবে মোটামুটিভাবে বলা চলে, সাম্প্রতিক কালের কথাসাহিত্যে দুটি প্রায় স্ববিরোধী মনোভঙ্গী বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তার একটি হ'ল উগ্র যৌনতা ও অন্যান্য উত্তেজক উপকরণের লোভনীয় স্বাদে ভরা এক ধরণের সুলভ 'কমার্সিয়াল' রচনার প্রাচুর্য; অন্যদিকে আমাদের এই ভাঙাচোরা এলো-মেলো জীবনে আমরা যে পরস্পর থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে, প্রায় নিরর্থকভাবে দৈহিক অর্থে বেঁচে আছি, অস্তিত্বের এই আত্মক্ষয়ী সঙ্কট ও এর নিহিত জটিল তাৎপর্য অন্বেষণে আরেক ধরণের জিজ্ঞাসু কথাশিল্পী সদা-তৎপর। বাংলা কথাসাহিত্যে এই ধারা আজও অনিঃশেষ গতিতে এগিয়ে চলেছে।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলে আলোচনা শেষ করি। এই সমীক্ষা থেকে এটুকু বোধহয় স্পষ্ট হয়েছে যে, পঞ্চাশ কিংবা ষাটের দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের 'কণ্টেণ্ট' রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রায় পুরোপুরি আলাদা হয়ে গেছে। সময়, সমাজ ও শিল্পিব্যক্তিত্বের রূপান্তরের অনিবার্যতা এর পিছনে কাজ করেছে। জীবন ও শিল্পের স্বাভাবিক নিয়মেই এটা ঘটেছে। কিন্তু তবু বলবো, আজকের অতি-আধুনিক কথাসাহিত্যের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের রচনার 'কণ্টেণ্ট'কে কিছুটা অস্পষ্ট ধূসর মনে হলেও মনে রাখতে হবে, তিনিই বাংলা কথাসাহিত্যে প্রথম আধুনিক কালের কণ্ঠস্বরকে ধ্বনিত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, আরেক অর্থে অতি-আধুনিক উপন্যাসের জগৎ থেকে রবীন্দ্রনাথ আজও বোধহয় একেবারে

মুছে যাননি। একালের উপন্যাসের ফর্ম-সচেতন নিরীক্ষামূলক প্রবণতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে যেন আজও কিছুটা প্রত্যক্ষ করি। অতি-আধুনিক পর্যায়ে জীবনের নানা কূট তির্যক ও জটিল চেতনাকে রূপ দিতে গিয়ে লেখকেরা আঙ্গিকগত নানা নূতন উদ্ভাবনের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও তো ব্যক্তির অস্তিত্বের নানামুখী জিজ্ঞাসাকে বিভিন্ন নিরীক্ষামূলক প্রকরণের মাধ্যমে রূপায়িত করেছিলেন। এ' কালের কথাসাহিত্যের এই ব্যাপক প্রকরণ-সচেতনতা ও প্রকরণগত নিরীক্ষার প্রাচুর্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সেই উত্তরাধিকারকে যেন আমরা বিস্মৃত না হই।
